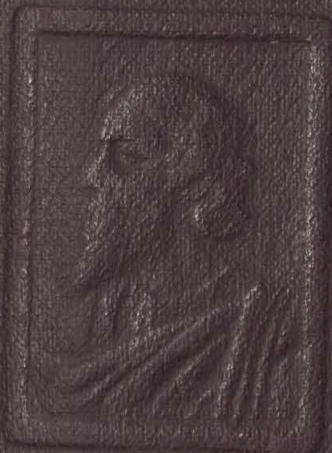


রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

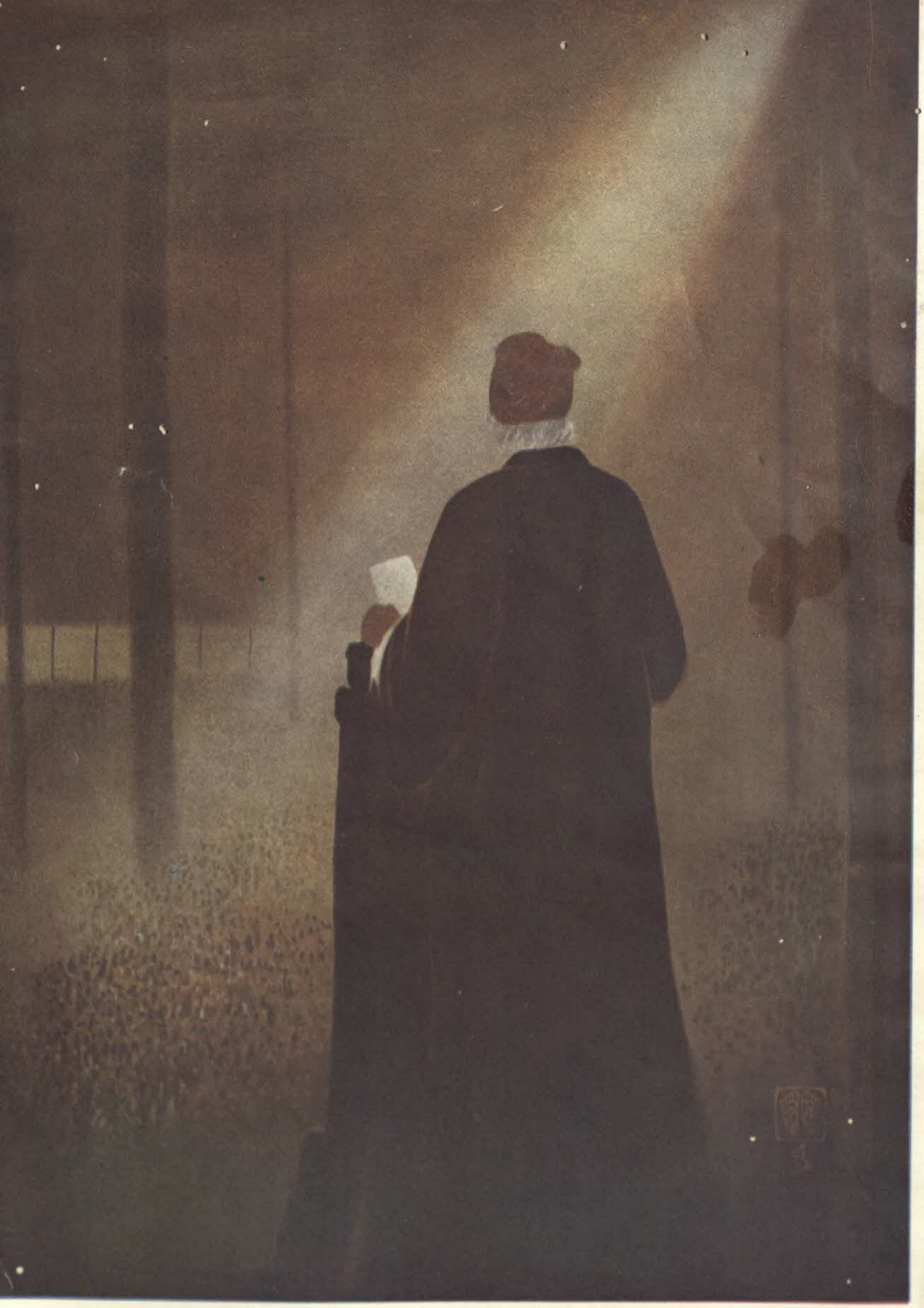
প্রথম প্রকাশ কার্তিক, ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান



জাতীয় মহাসমিতির উদ্‌বোধনে রবীন্দ্রনাথ ॥ কলিকাতা ১৯১৭

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত চিত্র

পলাতকা

পলাতকা

পলাতকা

ঐ যেখানে শিরীষ গাছে
ঝুরু-ঝুরু কচি পাতার নাচে
ঘাসের 'পরে ছায়াখানি কাঁপায় থরথর
ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর—
ঐখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে
হেনা-বেড়ার কোণে
শীতের রোদে সারা সকালবেলা।
তারি সঙ্গে করত খেলা
পাহাড় থেকে-আনা
ঘন রাঙা রেঁায়ায় ঢাকা একটি কুকুরছানা।
যেন তারা দুই বিদেশের দুটি ছেলে
মিলেছে এক পাঠশালাতে, একসাথে তাই বেড়ায় হেসে খেলে।
হাটের দিনে পথের কত লোকে
বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেত, দেখত অবাক-চোখে।

ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন হাওয়া,
শিউরে ওঠে আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙিন-চিঠি-পাওয়া
শালের বনে ফুলের মাতন হল শুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগল কাঁপন দুরুদুরু।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা তা কি জানি।

তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে ;
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে
চমকে দাঁড়ায় বেঁকে।

একদা এক বিকালবেলায়
আমলকীবন অধীর যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে।
সম্মুখে তার জীবনমরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।

ভেবেছিলেম আঁধার হলে পরে
ফিরবে ঘরে
চেনা হাতের আদর পাবার তরে।
কুকুরছানা বারে বারে এসে
কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে
কেঁদে-কেঁদে চোখের চাওয়ায় শুধায় জনে জনে,
"কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দেখি অঙ্গনে।"
আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তার সাথি।
আঁধার হল, জ্বলল ঘরে বাতি ;
উঠল তারা ; মাঠে-মাঠে নামল নীরব রাতি।
আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে,
"নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে।"

কেন যে তা সে-ই কি জানে। গেছে সে যার ডাকে
কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে।

আকাশ হতে, আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এল।
বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন-দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তারেই অন্বেষণ।
জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
আলোক তারে রাখল না আর বেঁধে॥

চিরদিনের দাগা

ওপার হতে এপার পানে খেয়া-নৌকো বেয়ে
ভাগ্য নেয়ে
দলে দলে আনছে ছেলেমেয়ে।
সবাই সমান তারা
এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপাফুলের পারা।
তাহার পরে অন্ধকারে
কোন্ ঘরে সে পৌঁছিয়ে দেয় কারে!
তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনী-জাল বোনা—
দুঃখে সুখে দিনমুহূর্ত গোনা।

একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে,
জননী তার লজ্জা পেল ; ভাবল কোথা থেকে
অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইছে যখন চাষি
নামল যেন শিলাবৃষ্টিরাশি।

বিনা-দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হল শুরু,
পদে পদে অপরাধের বোঝা হল গুরু।
কারণ বিনা যে-অনাদর আপনি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় "পোড়ারমুখী", শাসন করে বাপ,—
এ কোন্ অভিশাপ
হতভাগী আনলি বয়ে—শুধু কেবল বেঁচে-থাকার পাপ।
যতই তারা দিত ওরে গালি
নির্মলারে দেখত মলিন মাখিয়ে তারে আপন কথার কালি।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিনু ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামেশি।
"দাদা" বলে
গলা আমার জড়িয়ে ধরে বসত আমার কোলে।
নাম শুধালে শৈল আমায় বলত হাসি হাসি—
"আমার নাম যে দুষ্টু, সর্বনাশী!"
যখন তারে শুধাতেম তার মুখটি তুলে ধরে
"আমি কে তোর বল দেখি ভাই মোরে?"
বলত "দাদা, তুই যে আমার বর!"—
এমনি করে হাসাহাসি হত পরস্পর।

বিয়ের বয়স হল তবু কোনোমতে হয় না বিয়ে তার—
তাহে বাড়ায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্মা থেকে পাত্র গেল জুটি।
অল্পদিনের ছুটি;
শুভকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেয়েটিরে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বলতে গেলেম হেসে—
"বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে ভাই বরণ করলি শেষে?"
অমনি যে তার দু-চোখ গেল ভেসে
ঝরঝরিয়ে চোখের জলে। আমি বলি, "ছি ছি,
কেন, শৈল, কাঁদিস মিছিমিছি,
করিস অমঙ্গল।"
বলতে গিয়ে চক্ষে আমার রাখতে নারি জল।

বাজল বিয়ের বাঁশি,
অনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল দুষ্টু সর্বনাশী।
যাবার বেলা বলে গেল, "দাদা, তোমার রইল নিমন্ত্রণ,
তিন-সত্যি—যেয়ো যেয়ো।" "যাব, যাব, যাব বই কি বোন।"
আর কিছু না বলে
আশীর্বাদের মোতির মালা পরিয়ে দিলেম গলে।

চতুর্থ দিন প্রাতে
খবর এল, ইরাবতীর সাগর-মোহানাতে
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে।
আবার ভাগ্য নেয়ে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্ পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে
কেন এল কেনই গেল কেই বা তাহা জানে।
নিমন্ত্রণটি রেখে গেল শুধু আমার প্রাণে।

যাব যাব যাব, দিদি, অধিক দেরি নাই,
তিন-সত্যি আছে তোমার, সে-কথা কি ভুলতে পারি ভাই।
আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে
খবর পেলেম পরে।
গালিয়ে বুকের ব্যথা
লিখে রাখি এইখানে সেই কথা।

দিনের পরে দিন চলে যায়, ওদের বাড়ি যাই নে আমি আর।
নিয়ে আপন একলা প্রাণের ভার
আপন মনে
থাকি আপন কোণে।
হেনকালে একদা মোর ঘরে
সন্ধ্যাবেলায় বাপ এল তার কিসের তরে।
বললে, "খুড়ো একটা কথা আছে,
বলি তোমার কাছে।
শৈল যখন ছোটো ছিল, একদা মোর বাক্স খুলে দেখি
হিসাব-লেখা খাতার 'পরে এ কী
হিজিবিজি কালির আঁচড়। মাথায় যেন পড়ল ক্রোধের বাজ।
বোঝা গেল শৈলরি এ কাজ।
মারা-ধরা গালিমন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল,—
হঠাৎ তখন মনে এল শাস্তির কৌশল।
মানা করে দিলেম তারে
তোমার বাড়ি যাওয়া একেবারে।
সবার চেয়ে কঠিন দণ্ড! চুপ করে সে রইল বাক্যহীন
বিদ্রোহিণী বিষম ক্রোধে। অবশেষে বারো দিনের দিন
গরবিনী গর্ব ভেঙে বললে এসে, 'আমি
আর কখনো করব না দুষ্টামি।'
আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই কখানা পাতা
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো।

হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত ;—
সে শাস্তি নেই, সে তুষ্টু নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগ।
শিশু-হাতের আঁচড় কটি আমার বুকে লাগা।"

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিয়রের ওই জানলা দুটো,—গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ ;
কত রকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ,
একটুমাত্র অসাবধানেই, বিষম কর্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় বললে লক্ষ্মী সতী,
ভালোমানুষ অতি!

এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।

সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা।
এই জীবনটা ভালো, কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হ'ক-একটা-কিছু
সে-কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক-চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে সেই চাকাটা—ঐ যে থামল যেন ;
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন।

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম-দোলায় দোল ;
হেঁকেছিল, "খোল্ রে দুয়ার খোল্।"
সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে।
হয়তো মনের মাঝে
সংগোপনে দিত নাড়া ; হয়তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত ; হয়তো বাজত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা ; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যাবেলায়
পাড়ায় কোথা শতরঞ্চ খেলায়।

থাক্ সে-কথা।
আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা।

বাইশ বছর ধরে
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা!
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর।
জনম মরণ এক হয়েছে ওই যে অকূল বিরাট মোহানায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক।

মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, "হাওয়া বদল করো।"
এই সুযোগে বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি।

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে;
মিলন ছিল ছাড়া ছাড়া,
চাপা হাসি টুকরো কথার নানান জোড়াতাড়া।
আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশভরা সকল আলো ধরে
বরবধূরে নিলে বরণ করে।

রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে।
রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপনারি ভার বইবে কেমন করে।
সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে,—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে-যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগছে বারেবার
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার;
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাশুর সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে;
সেই কথাটা মনে ক'রে পুলক দিলক গায়ে।

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছ-ঘণ্টা কাল থামতে হবে যাত্রিশালায়,
মনে হল এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, "কেন, এ তো বেশ।"
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা,—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌছনো আর চলা।

যাত্রিশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,—
"দেখো, দেখো, একাগাড়ি কেমন চলে।
আর দেখেছ বাছুরটি ঐ, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ।
ঐ যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,—
শিশুগাছের তলাটিতে পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ঐ যে রেলের কাছে,—
ইস্টেশনের বাবু থাকে?—আহা ওরা কেমন সুখে আছে।"

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
বলে দিলেম, "বিনু এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।"
প্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু, "কথা একটা আছে।"
ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানি মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।
বিনু বললে, "রুক্মিনী ওর নাম।
ঐ যে হোথায় কুয়োর ধারে সারবাঁধা ঘরগুলি
ঐখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি;
তেরো-শ কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল,—স্বামী-স্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে কী-এক নদীর ধারে—"
বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,
"রুক্মিনীর এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে।

আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সার
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।"
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু, বিহু বললে খেপে—
"কক্‌খনো না, বলব না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে।
আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।"
নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে।
রেলের কুলীর লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামি।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পঁইচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই;
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি;
সে ভাবনাটা ভারি
রুক্‌মিনীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার 'পরে ভার
কুলি নারীর ভাবনা ঘোচাবার।
আজকে গাড়ি চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।

অবাক কাণ্ড এ কী।
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি।
জাতে হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা,
যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে!
এমন হলে দেউলে হতে কদিন বাকি থাকে।
"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে। আমি দেখছি মোট
এক-শ টাকার আছে একটা নোট,

সেটা আবার ভাঙানো নেই !"
বিনু বললে, "এই
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেব তবে"
এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,—
আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে,—
"কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি !
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাব নষ্টামি !"
কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধরে
দু-টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে।

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু-মাস যেই ফুরাল।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্য-সিঁদুর সম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"

ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দু-মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি,
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্মিনীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।

বিনু যে সেই দু-মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে,
জানল না তো ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারি হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে
"রুক্মিনী সে কোথায় আছে?"
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে,—
রুক্মিনী কে তাই বা ক-জন জানে।
অনেক ভেবে "ঝামরু কুলির বউ" বললেম যেই,
বললে সবে, "এখন তারা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি, "কোথায় পাব তাকে।"
ইস্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন, "সে খবর কে রাখে।"
টিকিটবাবু বললে হেসে, "তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিংবা খসরুবাগে,
কিংবা আরাকানে।"
শুধাই যত, "ঠিকানা তার কেউ কি জানে।"—
তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার কাছে কোন্ কাজ।
কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন;
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
"এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে"
বিনুর মুখে শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
রয়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী।

মায়ের সম্মান

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা-সাতটা গাড়ি ;
ছিল কুকুর ; ছিল বেড়াল ; নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ-সাতজোড়া ;
দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাসি।
—আর ছিল এক মাসি।

স্বামিটি তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি
স্ত্রীর হাতে তার ফেলে
বালক দুটি ছেলে।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে।
একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কী করে আপনারে
মুছবে একেবারে।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে
কেউ বা বলে ওঠে, "আপদ জুটল কোথা থেকে",—
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্ট ছেলে ;
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা ;
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।

শিশুচিত্ত-উৎসধারা বন্ধ করে দিতে
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে।
কাতর চোখে করুণ স্বরে মা বলে, "চুপ চুপ—"
একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ।
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা,
তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা;
খুশি হলে রাখবে চাপি
কোনোমতেই করবে নাকো লাফালাফি।
অপূর্ব আর পূর্ণ ছিল এদের একবয়সী;
তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হত পদে পদেই দোষী।
তারা এদের মারত ধড়াধ্বড়;
এরা যদি উলটে দিত চড়,
থাকত নাকো গণ্ডগোলের সীমা,—
উভয় পক্ষেরি মা
কানাই বলাই দোঁহার 'পরে পড়ত ঝড়ের মতো,—
বিষম কাণ্ড হত
ডাইনে বাঁয়ে দু-ধার থেকে মারের 'পরে মেরে।
বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি
থাকত উপবাসী,—
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি।

অবশেষে দুটি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা।
তখন তাদের চলাফেরা ওঠাবসা
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
পাখিহারা পক্ষিনীড়ের প্রায়।
এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি;

ঘুচে গেল ন্যায়বিচারের আশা,
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা।
সকল দুঃখ দুটি ভায়ে করল পরিপাক
নিঃশব্দ নির্বাক।
চক্ষে আঁধার দেখত ক্ষুধার ঝোঁকে—
পাছে খাবার না থাকে, আর পাছে মায়ের চোখে
জল দেখা দেয়, তাই
বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত, "ক্ষুধা নাই।"
অসুখ করলে দিত চাপা ; দেবতা মানুষ কারে
একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে।
প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ পেল এরা
ক্লাশে সবার সেরা,
অপূর্ব আর পূর্ণ এল শূন্যহাতে বাড়ি।
প্রমাদ গনি, দীর্ঘ নিশাস ছাড়ি
মা ডেকে কয় কানাই বলাইয়েরে,—
"ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে
তোদের প্রাইজ দুটি।
তার পরে যা ছুটি
খেলা করতে চৌধুরিদের ঘরে।
সন্ধ্যা হলে পরে
আসিস ফিরে, প্রাইজ পেলি কেউ যেন না শোনে।"
এই বলে মা নিয়ে ঘরের কোণে
দুটি আসন পেতে
আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।

এমনি করে অপমানের তলে
দুঃখদহন বহন করে দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে।
এই জীবনের ভার
যত হালকা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার।

সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান,—
আগুন তারি শিখার সমান
জ্বলছে এদের প্রাণপ্রদীপের মুখে।
সেই আলোটি দোঁহায় দুঃখে সুখে
যাচ্ছে নিয়ে একটি লক্ষ্যপানে—
জননীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে।

কানাই বলাই

কালেজেতে পড়ছে দুটি ভাই।
এমন সময় গোপনে এক রাতে
অপূর্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙল আপন হাতে,
করল চুরি পান্নামোতির হার ;—
থিয়েটারের শখ চেপেছে তার।
পুলিস-ডাকাডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে ;
যখন ধরা পড়ে-পড়ে
অপূর্ব সেই মোতির মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কানাইদাদার শোবার ঘরে বালিশ দিয়ে ঢেকে
লুকিয়ে দিল রেখে।
যখন বাহির হল শেষে
সবাই বললে এসে—
"তাই না শাস্ত্রে করে মানা
দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা।
ছেলেমানুষ, দোষ কী ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।"

কানাই বলাই জ্বলে ওঠে প্রলয়বহ্নিপ্রায়,
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।

মা বললেন, "আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁরি অপমান।"
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি;
রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী,
ঘোড়ার সহিস বেহারা চাপরাসি।

অপমানের তীব্র আলোক জেলে
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চলে চলে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড়ো আদালতে।
মনের মতো বউ এসেছে, একটি-দুটি আসছে নাতনী নাতি,—
জুটল মেলা সুখের দিনের সাথি।
মা বললেন, "মিটবে এবার চিরদিনের আশ—
মরার আগে করব কাশীবাস।"
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পুজোর ছুটির দিনে
মনের মতো বাড়ি দেখে
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছরখানেক না পেরোতেই শ্রাবণমাসের শেষে
হঠাৎ কখন মা ফিরলেন দেশে।
বাড়িসুদ্ধ অবাক সবাই,—মা বললেন, "তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বুদ্ধি হল অপূর্বকে পুরতে দিবি জেলে?"
কানাই বললে, "তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্বলেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের 'পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।"

মা বললেন, "ভুলবি কেন। মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তাহলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর কাহারো 'পরে
বাইরে কিংবা ঘরে।
মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে
তখন আমার মনে হল যদি আমি স্বপ্নমাত্র হই
জেগে দেখি আমি যদি কোথাও কিছু নই
তাহলে হয় ভালো।
মনে হল শত্রু আমার আকাশভরা আলো,
দেবতা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা—
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা।
তাইতো বলি বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায় না যেন কোনোজনা
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।"

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল অল্প লোকেই জানে,
বলে রাখি সে-কথা এইখানে।

বারো বছর পরে
অপূর্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিনটে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ করে সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
তবিল-ভাঙার জাল হিসাবে দায়ে ঠেকেছে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল বুঝি; তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বললে, "মনে কি নেই?" অপূর্ব কয় নতমুখে
"অনেকদিন সে গেছে চুকেবুকে।"

"ঢুকে গেছে?" কানাই উঠল বিষম রাগে জ্বলে,
"এতদিনের পরে যেন আশা হচ্ছে ঢুকে যাবে বলে।"
নিচের তলায় বলাই আপিস করে—
অপূর্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুকল তারি ঘরে।
বললে, "আমায় রক্ষা করো।"
বলাই কেঁপে উঠল থরথর।
অধিক কথা কয় না সে যে; ঘণ্টা নেড়ে ডাকল দরোয়ানে।
অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে।

অপূর্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে;
এদের ঘরে নিজে
আসতে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।
অনেক রকম করে ইতস্তত
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।
পূর্ণ বললে, "রক্ষা করো মাসি।"

এরি পরে কাশী থেকে মা আসলেন ফিরে।
কানাই তাঁরে বললে ধীরে ধীরে—
"জান তো মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য,
এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য।
বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,
উচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে।"
কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে
অপ্রসন্ন মুখে।
বললে, "হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে
দেখব তখন বিবেচনা করে।"

মা বললেন, "তোরা বলিস কী এ।
একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে

আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম !
এই কি তোদের ধর্ম !"
এত বলি বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি ;
তারা বলে, "যাচ্ছ কোথায় ।" মা বললেন, "অপূর্বদের বাড়ি ।
দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে
রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে ।"
"রসো, রসো, থামো, থামো, করছ এ কী ।
আচ্ছা, ভেবে দেখি ।
তোমার ইচ্ছা যবে
আচ্ছা না হয় যা বলছ তাই হবে ।"
আর কি থামেন তিনি ।
গেলেন একাকিনী
অপূর্বদের ঘরে তাদের মাসি ।
ছিল না আর দোবে চোবে, ছিল না চাপরাসি ।
প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী ।

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে,
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে ?—বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়ো ;—
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড় ।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো ।"

বাপ বললে, "কান্না তোমার রাখো !
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে ।
সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব ।
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব ।"

মা বললে, "কেন ঐ যে চাটুজ্যেদের পুলিন,
নাই বা হল কুলীন,—
দেখতে যেমন তেমনি স্বভাবখানি,
পাস করে ফের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুকরো ছেলে।
এক-পাড়াতে থাকে ওরা— ওরি সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হল ; ওকে যদি বলি আমি আজই
এক্‌খনি হয় রাজি।"

বাপ বললে, "থামো,
আরে আরে রামোঃ।
ওরা আছে সমাজের সব তলায়।
বামুন কি হয় পইতে দিলেই গলায় ?
দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল ! রাধে !
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে।"

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা ;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হানছে যেন বেদনা-বিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে,—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিখানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই।

তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য,
মেয়েমানুষ বুঝবে না তার মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়বেলায় মেয়েকে বাপ বলে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি
"হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি।"

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্বাদের প্রথম অংশ দু-মাস যেতেই ফলল কেমন করে—
পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে,
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।

দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো,
অবশেষে হল
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
কখন শিশুকালে
হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি;
জানত না তো আপনাকে সে,
শুধায় নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে খেপা বাতাস এসে,

সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে'।
সে যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপড়িভারে আপনি সমাকুল।
আপনাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাকি,
তাইতো থাকি থাকি
চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশপারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝরনা বেয়ে ;
রাতের অন্ধকারে
কোন্ অসীমের রোদনভরা বেদন লাগে তারে।
বাহির হতে তার
ঘুচে গেছে সকল অলংকার ;
অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
তাই দেখে সে আপনি ভেবে মরে।
কখন কাজের ফাঁকে
জানলা ধরে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
যেখানে ওই শজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি।

যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথি
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে।
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।
পায়ের শব্দ তারি
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুনগুনানি।

মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া;
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরৎনিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো—
কেঁদে বলে, "হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাক।"

একদা বাপ দুপুরবেলায় ভোজন সাঙ্গ করে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধরে,
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বললেন, বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
"যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জরে
আমি কিন্তু পারি যেমন করে
মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে।"

বাপ বললেন, কঠিন হেসে, "তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে ক'রো আমার মরার পরে,
সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।"
এই বলে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বললেন, "উঃ কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহমায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে।"
বাপ বললেন, "আমি পাষাণ বটে।
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননির পুতুল হলে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গলে।"

মা বললেন, "হায় রে কপাল। বোঝাবই বা কারে।
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ঐ মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান।"

বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, "মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন—নেই সে ওদের জ্ঞান।"
এই বলে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।

দুখের তাপে জ্বলে জ্বলে অবশেষে নিবল মায়ের তাপ;
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাটনাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্‌ বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার 'পরে বাপের সেবাভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হত না তাঁর রুচি।
সকালবেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিংবা লুচি;
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা
ভাজাভুজি হত পাঁচটা-ছটা;

পাঁঠা হর্ত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দুবেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ এই।
বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে রাখে।
গয়লানী আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তার কত
নালিশ শুনতে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদেপদেই ঘটে যে তার ত্রুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হয়ে নীরব নত,
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন করে মাতা বারংবার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেমনি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান
সেই কথাটা মনে ক'রে গর্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ।
"আমার মায়ের যত্ন যে-জন পেয়েছে একবার
আর কিছু কি পছন্দ হয় তার।"

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারি।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয়।
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো।
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনোদিন।
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তা'র বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে।

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত-পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরানখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে
চুপ ক'রে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগী-সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলিরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—

"জান তুমি তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।
সে ইচ্ছাটি তাঁরি
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি।"

"না না, ছি ছি, ছি ছি।"
এই ব'লে সে মঞ্জুলিকা দু-হাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে।
ভাবলে, "পোড়া মনের কথা এড়ায় নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো। এবার মরণ হ'ক।"

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল দ্বিগুণ ক'রে
অষ্টপ্রহর ধরে।
আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে-বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে।
দু-তিন ঘণ্টা পর
একবার যে-ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শ্রান্ত হয়ে আপনি ঘুমে মেঝের 'পরে লোটায়।
যে দেখল সে-ই অবাক হয়ে রইল চেয়ে,
বললে, "ধন্যি মেয়ে।"

বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, "গর্ব করি নেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।

ব্রহ্মচর্য ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর। নইলে দেখতে অন্যরকম হ'ত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।"

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয় নিকো বিশ্বাস,
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিশ্বাস।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব
আসছে ঘরে নানা রকম বিলিতি আসবাব।
দেখলে বাপের নতুন করে সাজসজ্জা শুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকাচুল সব কখন হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা।

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়ল মনে
বুকভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হ'ক না মৃত্যু, তবু
এ-বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু।
কল্যাণী সেই মূর্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরি পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জাভয়
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,—
"তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে।
আমরা তোমার ছেলেমেয়ে নাতনী-নাতি যত
সবার মাথা করবে নত ?
মায়ের কথা ভুলবে তবে ?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে।"

বাবা বললে শুষ্ক হাসে,
"কঠিন আমি কেই বা জানে না সে ?
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে দুঃখ দিতে
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে।"

বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের কদিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে ব'লে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

মালা

আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে,
সিংহাসনে রানীর হাতে
ছিল সোনার থালা,
তারি 'পরে একটি শুধু ছিল মণির মালা।

কাশী কাঞ্চী কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
বহুমুখী জনধারার স্রোতে
দলে দলে যাত্রী আসে
ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।
যারে শুধাই "কোথায় যাবে ?" সে-ই তখনি বলে
"রানীর সভাতলে।"
যারে শুধাই "কেন যাবে ?" কয় সে তেজে চক্ষে দীপ্ত জ্বালা
"নেব বিজয়মালা।"

কেউ বা ঘোড়ায় কেউ বা রথে
ছুটে চলে, বিরাম চায় না পথে।
মনে যেন আগুন উঠল খেপে,
চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।
মনে মনে কইনু হর্ষে, "ওগো জ্যোতির্ময়ী,
তোমার সভায় হব আমি জয়ী।
শূন্য ক'রে থালা
নেব বিজয়মালা।"

একটি ছিল তরুণ যাত্রী, করুণ তাহার মুখ,
প্রভাত-তারার মতো যে তার নয়নদুটি কী লাগি উৎসুক।
সবাই যখন ছুটে চলে
সে যে তরুর তলে

আপন মনে বসে থাকে।
আকাশ যেন শুধায় তাকে—
যার কথা সে ভাবে কী তার নাম।
আমি তারে যখন শুধালাম—
"মালার আশায় যাও বুঝি ঐ হাতে নিয়ে শূন্য তোমার ডালা ?"
সে বলে, "ভাই, চাই নে বিজয়মালা!"

তারে দেখে সবাই হাসে ;
মনে ভাবে, "এও কেন মোদের সাথে আসে
আশা করার ভরসাও যার নাইকো মনে,
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে।"
সবার তরে জায়গা সে দেয় মেলে,
আগেভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে।
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে ;
পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে
হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা ;
তবু বলে, চায় না বিজয়মালা।

*সিংহাসনে একলা ব'সে রানী
মূর্তিমতী বাণী।
ঝংকারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে
আমার বীণা বাজে।
কখনো বা দীপক রাগে
চমক লাগে,
তারা বৃষ্টি করে ;
কখনো বা মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে।
আর সকলে গান শুনিয়ে নতশিরে
সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে ধীরে ধীরে
গেছে ঘরে ফিরে।

তারা জানে, যেই ফুরাবে আমার পালা,
আমি পাব রানীর বিজয়মালা।

আমাদের সেই তরুণ সাথি বসে থাকে ধুলায় আসনতলে ;
কথাটি না ব'লে।
দৈবে যদি একটি-আধটি চাঁপার কলি
পড়ে স্খলি
রানীর আঁচল হতে মাটির 'পরে,
সবার অগোচরে
সেইটি যত্নে নিয়ে তুলে
পরে কর্ণমূলে।
সভাভঙ্গ হবার বেলায় দিনের শেষে
যদি তারে বলি হেসে—
"প্রদীপ জ্বালার সময় হল সাঁঝে
এখনো কি রইবে সভামাঝে।"
সে হেসে কয়, "সব সময়েই আমার পালা,
আমি যে ভাই চাই নে বিজয়মালা।"

আষাঢ় শ্রাবণ অবশেষে
গেল ভেসে
ছিন্নমেঘের পালে,—
গুরু গুরু মৃদঙ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে।
শরৎ এল, শরৎ গেল চলে ;
নীল আকাশের কোলে
রৌদ্রজলের কান্নাহাসি হল সারা ;
আমার সুরের থরে থরে ছড়িয়ে গেল শিউলিফুলের ঝারা।
ফাগুন-চৈত্র আম-মউলের সৌরভে আতুর,
দখিন হাওয়ায় আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের সুর।
কণ্ঠে আমার একে একে সকল ঋতুর গান
হল অবসান।

তখন রানী আসন হতে উঠে'
আমার করপুটে
তুলে দিলেন, শূন্য ক'রে থালা,
আপন বিজয়মালা।

পথে যখন বাহির হলেম মালা মাথায় প'রে
মনে হল বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে
ঘূর্ণি ধুলার মতো।
মানুষ শত শত
ঘিরল আমায় দলে দলে—
কেউ বা কৌতূহলে,
কেউ বা স্তুতিচ্ছলে,
কেউ বা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়।
হায় রে হায়
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়।
এই ধরণীর লাজুক যত সুখ,
ছোটোখাটো আনন্দেরি সরল হাসিটুক,
নদীচরের ভীরু হংসদলের মতো
কোথায় হল গত।
আমি মনে মনে ভাবি, "এ কি দহনজালা
আমার বিজয়মালা।"

ওগো রানী, তোমার হাতে আর কিছু কি নেই।
শুধু কেবল বিজয়মালা এই ?
জীবন আমার জুড়ায় না যে ;
বক্ষে বাজে
তোমার মালার ভার ;—
এই যে পুরস্কার
এ তো কেবল বাইরে আমার গলায় মাথায় পরি ;

কী দিয়ে যে হৃদয় ভরি
সেই তো খুঁজে মরি।
তৃষ্ণা আমার বাড়ে শুধু মালার তাপে;
কিসের শাপে
ওগো রানী শূন্য ক'রে তোমার সোনার থালা
পেলেম বিজয়মালা?

আমার কেমন মনে হল আরো যেন অনেক আছে বাকি—
সে নইলে সব ফাঁকি।
এ শুধু আধখানা,
কোন্ মানিকের অভাব আছে এ মালা তাই কানা।
হয় নি পাওয়া সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে
এমন করে বাজে।
চল্ রে ফিরে বিড়ম্বিত আবার ফিরে চল্,
দেখবি খুঁজে বিজন সভাতল,—
যদি রে তোর ভাগ্যদোষে
ধুলায় কিছু পড়ে থাকে খসে।
যদি সোনার থালা
লুকিয়ে রাখে আর-কোনো এক মালা।

সন্ধ্যাকাশে শান্ত তখন হাওয়া;
দেখি সভার দুয়ার বন্ধ, ক্ষান্ত তখন সকল চাওয়া-পাওয়া।
নাই কোলাহল, নাইকো ঠেলাঠেলি
তরুশ্রেণী স্তব্ধ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি।
বিজন পথে আঁধার গগনতলে
আমার মালার রতনগুলি আর কি তেমন জ্বলে।
আকাশের ঐ তারার কাছে
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে আছে।
দিনের আলোয় ভুলিয়েছিল মুগ্ধ আঁখি
আঁধারে তার ধরা পড়ল ফাঁকি।

এরি লাগি এত বিবাদ, সারাদিনের এত দুখের পালা ?
লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা।

ঘনিয়ে এল রাতি।
হঠাৎ দেখি তারার আলোয় সেই যে আমার পথের তরুণ সাথি
আপন মনে
গান গেয়ে যায় রানীর কুঞ্জবনে।
আমি তারে শুধাই ধীরে, "কোথায় তুমি এই নিভৃতের মাঝে
রয়েছ কোন্ কাজে।"
সে হেসে কয়, "ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
তখন রানীর আসন পড়ে বকুলবীথিকাতে,
আমি একা বীণা বাজাই রাতে।"
শুধাই তারে, "কী পেলে তাঁর কাছে।"
সে কয় শুনে, "এই যে আমার বুকের মাঝে আলো করে আছে।
কেউ দেখে নি রানীর কোলে পদ্মপাতার ডালা,
তারি মধ্যে গোপন ছিল, জয়মালা নয়, এ যে বরণমালা।"

ভোলা

হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে ;—
থামল তাহার হাস্য-উছল বাণী ;
থামল তাহার নৃত্য-নূপুর ঝরঝরানি ;
সূর্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি,
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্তব্ধ হল এক নিমেষে
বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।

মনে হল আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।
ভোরবেলা তার বিষম গণ্ডগোলে
ঘুম-ভাঙনের সাগরমাঝে আর কি তুফান তোলে।
ছুটোছুটির উপদ্রবে
ব্যস্ত হত সবে,
হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত "আরে আরে করিস কী তুই" ব'লে ;
ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠত যেন টলে।
আজ যত তার দস্যিপনা, যা-কিছু হাঁকডাক
চাক-ভরা মৌমাছির মতো উড়ে গেছে শূন্য করে চাক।
আমার এ সংসারে
অত্যাচারের সুধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ;
তাই এ ঘরের প্রাণ
লোটায় ম্রিয়মাণ
জল-পালানো দিঘির পদ্ম যেন।
খাট-পালঙ্ক শূন্যে চেয়ে শুধায় শুধু, "কেন, নাই সে কেন।"
সবাই তারে দুষ্টু বলত, ধরত আমার দোষ,
মনে করত শাসন বিনা বড়ো হলে ঘটাবে আপসোস।
সমুদ্র-ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে
ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জে ছুটে
ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কূলে কূলে দুলে দুলে পড়ে লুটে লুটে
ধরার বক্ষতলে,
দুরন্ত তার দুষ্টুমিটি তেমনি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার করে
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভরে।
বয়সের এই পর্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে
আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে ;
বিজুর হাতে পেলে নাড়া
সেই যে দিত সাড়া।
সমান-বয়স ছিল আমার কোন্‌খানে তার সনে,
সেইখানে তার সাথি ছিলেম সকল প্রাণে মনে।

আমার বক্ষ সেইখানে এক-তালে,
উঠত বেজে তারি খেলার অশান্ত গোলমালে।
বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা
কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে।
পাকা আমের কালে
তারে নিয়ে বসে গাছের ডালে
দুপুরবেলায় খেয়েছি আম করে কাড়াকাড়ি—
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, "বিষম বাড়াবাড়ি।"
বারে বারে
আমার লেখার ব্যাঘাত হত, বিজুর মা তাই রেগে বলত তারে
"দেখিস নে তোর বাবা আছেন কাজে?"
বিজু তখন লাজে
বাইরে চলে যেত। আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায়;
মনে হত, "টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায়।"

ভোর না হতে রাতি
সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথি,
মনে হল এতদিনে বুড়োবয়সখানা
পুরল ষোলো আনা।
কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে
লক্ষ্য করে বৈতরণীর ঘাট,
গম্ভীরতার স্তম্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ।
সময় নষ্ট হবে না আর দিনে রাতে
দৌড়োবে মন লেখার খাতার শুকনো পাতে পাতে,—
বৈঠকেতে চলবে আলোচনা
কেবলি সৎপরামর্শ কেবলি সদ্‌বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে
দারুণ শূন্য রয়েছে মোর চৌকি-টেবিল চেপে।
তাই সেখানে টিকতে নাহি পারি;
বৈরাগ্যে মন ভারি,
উঠোনেতে করছিনু পায়চারি।
এমন সময় উঠল মাটি কেঁপে
হঠাৎ কে এক ঝড়ের মতো বুকের 'পরে পড়ল আমায় ঝেঁপে।
চমক লাগল শিরে শিরে,
হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে।
আমি শুধাই, "কে রে, কী রে।"
"আমি ভোলা", সে শুধু এই কয়,
এই যেন তার সকল পরিচয়,
আর কিছু নেই বাকি।
আমি তখন অচেনারে দু-হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি,
সে বললে "ঐ বাইরে তেঁতুলগাছে
ঘুড়ি আমার আটকে আছে
ছাড়িয়ে দাও না এসে।"
এই বলে সে
হাত ধরে মোর চলল নিয়ে টেনে।

ওরে ওরে এইমতো যার হাজার হুকুম মেনে
কেটেছিল নটা বছর, তারি হুকুম আজো মর্ত্যতলে
ঘুরে বেড়ায় তেমনি নানান ছলে।
ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ
ফুরোয় নি মোর কাজ।
আমার রাজা, আমার সখা, আমার বাছা আজো
কত সাজেই সাজো।
নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,
চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে।
আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল নড়ে,

আবার হঠাৎ উলটে পড়ে
দোয়াত হল খালি,
খাতার পাতায় ছড়িয়ে গেল কালি।
আবার কুড়োই ঝিনুক শামুক নুড়ি
গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছুঁড়ি।
আবার আমার নষ্ট সময় ভ্রষ্ট কাজে
উলটপালট গণ্ডগোলের মাঝে
ফেলাছড়া-ভাঙাচোরার 'পর
আমার প্রাণের চিরবালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা।

ছিন্ন পত্র

কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাষাণ-প্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে ;
তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা, পায় না কোনো রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেছে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে ;
বৃহৎ সর্বনাশে
হারিয়েছিলেম বিশ্বজগৎখানি।
নীল আকাশের সোনার বাণী

সকাল-সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছোত না মোর বাতায়ন-দ্বারে।
ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে,
আমার আঙিনাতে
আনত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।
অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কী যে সে ক্রন্দন
জানব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সংগোপনে বহন করে কর্মরথে
সমারোহে চলতেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে।
তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়তে হত নকল সিংহনাদ;
বীডন কুঞ্জে মীটিং হলে আমি হতেম বক্তা;
রিপোর্ট লিখতে হত তক্তা তক্তা;
যুদ্ধ হত সেনেট-সিণ্ডিকেটে,
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিনরাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বন্ধুরা সব বলত, "করছ কী এ।
মারা যাবে শেষে!"
আমি বলতেম হেসে,
"কী করি ভাই, খাটতে কি হয় সাধে।
একটু যদি ঢিল দিয়েছি অমনি গলদ বাধে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কী করি তার উপায় বলতে পার?"
বিশ্বকর্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার 'পরেই ন্যস্ত,
অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সেদিন তখন দু-তিন রাত্রি ধরে
গত সনের রিপোর্টখানা লিখেছি খুব জোরে।

বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি
হপ্তা তিনেক মরতে হবে ভোট কুড়োতে তারি।
শীতের দিনে যেমন পত্রভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা-সার,
আমার হল তেমনি দশা ;
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা ;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
খবর আসে "খাবার তৈরি", নিই নে কথা কানে,
আবার যদি খবর আনে,
বলি ক্রোধের ভরে
"মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া তো থাক পরে।"

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হল পাড়া,
আর সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখি ছাড়া ;
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
হাতে গেল দিয়ে।
জরুরি কোন্ কাজের চিঠি ভেবে
খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চলছে উঠে নেবে,
নাইকো দাঁড়ি-কমা,
শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা।
আর হল না পড়া,
মনে হল কোন্ বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া,
চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
এমনি করে কোন্ অতলের মাঝে
হপ্তা তিনেক গেল ডুবে।
সূর্য ওঠে পশ্চিমে কি পুবে,
সেই কথাটাই ভুলে গেছি, চলছি এমন চোটে।
এমন সময় ভোটে

আমার হল হার,
শত্রুদলে আসন আমার করলে অধিকার ;
তাহার পরে খালি
কাগজপত্রে চলল গালাগালি।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়ল হাতে,
সেটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছি বসে আরামকেদারাতে ;
এমন সময় হঠাৎ দখিন-পবনভরে
ছেঁড়া চিঠির টুকরো এসে পড়ল আমার কোলের 'পরে।
অন্যমনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়ল চোখে, "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে।"
মনু? আমার মনোরমা? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই।
অমনি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভ'রে,
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে।
সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিনী,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনিঝিনি।
সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেছে পথহারা ;
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই তো আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
অমনি ওদের বাড়ির পানে ছোটা।
ওরি সঙ্গে শুরু হত দিনের প্রথম খেলা ;
মনে পড়ে, পিঠের 'পরে চুলটি মেলা
সেই আনন্দমূর্তিখানি স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি,
কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি।

অসীম ধৈর্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার,
সকল কথায় মানত মনু হার।
উঠে গাছের আগডালেতে দোলা খেতেম জোরে,
ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি ক'রে,
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে,
ভুলতে পারি কি সে।
মনে পড়ে নীরব ব্যথা তার,
বাবার কাছে যখন খেতেম মার;
ফেলেছে সে কত চোখের জল,
মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজত কত ছল।
আরো কিছু বড়ো হলে
আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া বলে।
নামতাটা তার কেবল যেত বেধে,
তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠত লাজে কেঁদে।
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরেজি বই দেখে
ভাবত মনে, গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা।
যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাত সোজা।
হেনকালে হঠাৎ সেবার,
দশমীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার
রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর-দরোয়ানে
বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।
তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মনুর বাবার বাধল মকদ্দমা,
কেউ কাহারে করলে না আর ক্ষমা।
দুয়ার মোদের বন্ধ হল,
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল,
হঠাৎ এল কোন্ দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জন,
মোর প্রতিমার হল বিসর্জন।

দেখাশোনা ঘুচল যখন এলেম যখন দূরে,
তখন প্রথম শুনতে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
মুখখানি তার উঠল ফুটে আঁধার পটে সন্ধ্যাতারার মতো;
একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতখানিই নয়!
প্রেমের শিখা জ্বলল তখন, নিবল যখন চোখের পরিচয়।

কত বছর গেল চলে
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হলে।
গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ি কিনেছে কোন্ পাটের কুঠিয়াল,
হল অনেক কাল।
বিয়ে করে মনুর স্বামী
কোন্ দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।
সেই মনু আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে।
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি। ক্ষতি সে কি। সে কি অত্যাচার।
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে
হৃদয়ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে।
ছিন্ন চিঠির বাকি
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে খুঁজে পাব না কি।
"মনুরে কি গেছ ভুলে।"
এ প্রশ্ন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো।
কত চিঠির জবাব লিখব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বলবে বহ্নিশিখা
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা।

কালো মেয়ে

মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে ক্রমে
বয়স উঠছে জমে।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ ;
সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবসরাত্রি কালো মেয়েটিরে।
সামনে-বাড়ির নিচের তলায় আমি থাকি "মেস্"-এ।
বহুকষ্টে শেষে
কলেজেতে পার হয়েছি একটা পরীক্ষায়।
আর কি চলা যায়
এমন করে এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে।
দুইবেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েছি আধপেটা
ভিক্ষা করা সেটা
সইত না একবারে,
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাত পক্ষে, আধা মাইনেয়, ভর্তি হবার জন্যে।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবি,
মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে।

আজকে দেখি নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।
মনে হচ্ছে ময়নাপাখির খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায় ;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা।
কোথায় মুক্ত অরণ্যানী, কোথায় মত্ত বাদল-মেঘের ভেরী।
এ কী বাঁধন রাখল আমায় ঘেরি।

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোশে শুয়ে পড়ি ধপাস করে।
হাতপাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে,—
মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী।
মনে হয় যে রোদের পরে বৃষ্টিভরা থমকে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরান জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।
আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের 'পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা ;—
ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরনাখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাত-জাগা এক পাখি,
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
একলা থাকি "মেস্"-এ।
সকালসাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা ছিল মনে।

ঐ যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরানী
যেমনতরো ওর ভাঙা ঐ জানলাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশেহারা;
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলসভরে;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী;
তেমনি আমার বাঁশের বাঁশি আপনভোলা,
চারদিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জানলা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে-কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া।

আসল

বয়স ছিল আট,
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্যেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি প'ড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মতো।
পাড়ার আবর্জনা যত
ঐখানেতেই উঠছে জমে,
একধারেতে ক্রমে
পাহাড়-সমান উঁচু হল প্রতিবেশীর রান্নাঘরের ছাই ;
গোটাকয়েক আকন্দগাছ, আর কোনো গাছ নাই ;
দশ-বারোটা শালিখপাখি
তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে করত ডাকাডাকি ;
দুপুরবেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে
কী যে প্রশ্ন হাঁকত শূন্যে কিসের কৌতূহলে।

পাড়ার মধ্যে ঐ জমিটাই কোনো কাজের নয় ;
সবার যাতে নাই প্রয়োজন লক্ষ্মীছাড়ার তাই ছিল সঞ্চয় ;
তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুকরো হাঁড়ির কানা,
অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা,
ফুটো এনামেলের গেলাস, থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন,
মরচে-পড়া টিনের লণ্ঠন,
সিগারেটের শূন্য বাক্স, খোলা চিঠির খাম,
অদরকারের মুক্তি হেথায়, অনাদরের অমর স্বর্গধাম।

তখন আমার বয়স ছিল আট,
করতে হত ভূবৃত্তান্ত পাঠ।
পড়ার ঘরের দেয়ালে চারপাশে
ম্যাপগুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করত নীরব পরিহাসে ;

পাহাড়গুলো মরে-যাওয়া শুঁয়োপোকার মতো,
নদীগুলো যত
অচল রেখার মিথ্যা কথায় অবাক হয়ে রইত থতমত,
সাগরগুলো ফাঁকা,
দেশগুলো সব জীবনশূন্য কালো-আথর-আঁকা।
হাঁপিয়ে উঠত পরান আমার ধরণীর এই শিকল-রেখার রূপে,—
আমি চুপে চুপে
মেঝের 'পরে বসে যেতেম ঐ জানলার পাশে।
ঐ যেখানে শুকনো জমি শুকনো শীর্ণ ঘাসে
পড়ে আছে এলোথেলো, তাকিয়ে ওরি পানে
কার সাথে মোর মনের কথা চলত কানে কানে।
ঐ যেখানে ছাইয়ের গাদা আছে
বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলেটির কাছে।
মাথার 'পরে উদার নীলাঞ্চল
সোনার আভায় করত ঝলমল।
সাত সমুদ্র তেরো নদীর সুদূর পারের বাণী
আমার কাছে দিতেন আনি।
ম্যাপের সঙ্গে হত না তার মিল,
বইয়ের সঙ্গে ঐক্য তাহার ছিল না এক তিল।
তার চেহারা নয় তো অমন মস্ত ফাঁকা
আঁচড়-কাটা আথর-আঁকা,—
নয় সে তো কোন্ মাইল-মাপা বিশ্ব,
অসীম যে তার দৃশ্য; আবার অসীম সে অদৃশ্য।

এখন আমার বয়স হল ষাট,—
গুরুতর কাজের ঝঞ্ঝাট।
পাগল করে দিল পলিটিক্‌সে,
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা স্বপ্ন আজকে নাগাদ হয় নি জানা ঠিক সে;
ইতিহাসের নজির টেনে, সোজা
একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্মফলের বোঝা,

সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব
মাসিক পত্রে প্রবন্ধ উন্মত্ত।
যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।
কথায় কেবল কথারি ফল ফলে,
পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে পুঁথি কেবলমাত্র পুঁথিই বেড়ে চলে।

আজ আমার এই ষাট বছরের বয়সকালে
পুঁথির সৃষ্টি জগৎটার এই বন্দীশালে
হাঁপিয়ে উঠলে প্রাণ
পালিয়ে যাবার একটি আছে স্থান।
সেই মহেশের পাশে
পাড়ায় যারে পাগল বলে হাসে।
পাছে পাছে
ছেলেগুলো সঙ্গে যে তার লেগেই আছে।
তাদের কলরবে
নানান উপদ্রবে
একমুহূর্ত পায় না শান্তি,
তবু তাহার নাই কিছুতেই ক্লান্তি।
বেগার-খাটা কাজ
তারি ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কেউ মানে না লাজ।
সকালবেলায় ধরে ভজন গলা ছেড়ে,
যতই সে গায়, বেসুর ততই চলে বেড়ে।
তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে এসে
মহেশ বলে হেসে,
"আমার এ গান শোনাই যাঁরে,
বেসুর শুনে হাসেন তিনি, বুক ভরে সেই হাসির পুরস্কারে।
তিনি জানেন, সুর রয়েছে প্রাণের গভীর তলায়,
বেসুর কেবল পাগলের এই গলায়।"

সকল প্রয়োজনের বাহির সে যে সৃষ্টিছাড়া,
তার ঘরে তাই সকলে পায় সাড়া।
একটা রোগা কুকুর ছিল, নাম ছিল তার ভুতো,
একদা কার ঘরের দাওয়ায় ঢুকেছিল অনাহূত,—
মারের চোটে জরজর
পথের ধারে পড়ে ছিল মর-মর,
খোঁড়া কুকুরটারে
বাঁচিয়ে তুলে রাখলে মহেশ আপন ঘরের দ্বারে।
আরেকটি তার পোষ্য ছিল, ডাকনাম তার সুর্মি,
কেউ জানে না জাত যে কী তার, মুসলমান কি কাহার কিংবা কুর্মি।
সে-বছরে প্রয়াগেতে কুম্ভমেলায় নেয়ে
ফিরে আসতে পথে দেখে চার বছরের মেয়ে
কেঁদে বেড়ায় বেলাদুপুর ছুটোয়।
মা নাকি তার ওলাউঠোয়
মরেছে সেই সকালবেলায়;
মেয়েটি তাই বিষম ভিড়ের ঠেলায়
পাক খেয়ে সে বেড়াচ্ছিল ভয়েই ভেবাচেকা,—
মহেশকে যেই দেখা
কী ভেবে যে হাত বাড়াল জানি না কোন্ ভুলে;
অমনি পাগল নিল তারে কাঁধের 'পরে তুলে,
ভোলানাথের জটায় যেন ধুতরোফুলের কুঁড়ি;
সে অবধি তার ঘরের কোণটি জুড়ি
সুর্মি আছে ঐ পাগলের পাগলামির এক স্বচ্ছ শীতল ধারা
হিমালয়ে নির্ঝরিণীর পারা।
এখন তাহার বয়স হবে দশ,
খেতে শুতে অষ্টপ্রহর মহেশ তারি বশ।
আছে পাগল ঐ মেয়েটির খেলার পুতুল হয়ে
যত্নসেবার অত্যাচারটা সয়ে।
সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার থেকে ফিরে
যেমনি মহেশ ঘরের মধ্যে ঢোকে ধীরে ধীরে,

পথ-হারানো মেয়ের বুকে আজো যেন জাগায় ব্যাকুলতা—
বুকের 'পরে ঝাপিয়ে প'ড়ে গলা ধ'রে আবোলতাবোল কথা।
এই আদরের প্রথম-বানের টান
হলে অবসান
ওদের বাসায় আমি যেতেম রাতে।
সামান্য কোন্ কথা হত এই পাগলের সাথে।
নাইকো পুঁথি নাইকো ছবি, নাই কোনো আসবাব,
চিরকালের মানুষ যিনি ঐ ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।
তারার মতো আপন আলো নিয়ে বুকের তলে—
যে-মানুষটি যুগ হতে যুগান্তরে চলে,
প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মতো সীমাহীনের হাতে
সরল সুরে বাজে দিনে রাতে,
যাঁর চরণের স্পর্শে
ধুলায় ধুলায় বসুন্ধরা উঠল কেঁপে হর্ষে,—
আমি যেন দেখতে পেতেম তাঁরে
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে।
রাজনীতি আর সমাজনীতি পুঁথির যত বুলি
যেতেম সবই ভুলি।
ভুলে যেতেম রাজার কা'রা মস্ত বড়ো প্রতিনিধি
বালুর 'পরে রেখার মতো গড়ছে রাজ্য, লিখছে বিধানবিধি।

ঠাকুরদাদার ছুটি

তোমার ছুটি নীল অকাশে,
তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থইহারা ঐ
দিঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুলতলায়,
গোলাবাড়ির কোণে,

তোমার ছুটি ঝোপেঝাপে
পারুলডাঙার বনে।
তোমার ছুটির আশা কাঁপে
কাঁচা ধানের খেতে,
তোমার ছুটির খুশি নাচে
নদীর তরঙ্গেতে।

আমি তোমার চশমাপরা
বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয়-কাজের মাকড়সাটার
বিষম জালে বাঁধা।
আমার ছুটি সেজে বেড়ায়
তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির
মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারি ঐ
চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই
আমার ছুটি আছে।

তোমার ছুটির খেয়া বেয়ে
শরৎ এল মাঝি।
শিউলি-কানন সাজায় তোমার
শুভ্র ছুটির সাজি।
শিশির-হাওয়া শিরশিরিয়ে
কখন রাতারাতি
হিমালয়ের থেকে আসে
তোমার ছুটির সাথি।
আশ্বিনের এই আলো এল
ফুল-ফোটানো ভোরে

তোমার ছুটির রঙে রঙিন
চাদরখানি প'রে।

আমার ঘরে ছুটির বন্যা
তোমার লাফে-ঝাঁপে ;
কাজকর্ম হিসাবকিতাব
থরথরিয়ে কাঁপে।
গলা আমার জড়িয়ে ধর,
ঝাঁপিয়ে পড় কোলে,
সেই তো আমার অসীম ছুটি
প্রাণের তুফান তোলে।
তোমার ছুটি কে যে জোগায়
জানি নে তার রীত,
আমার ছুটি জোগাও তুমি,
ঐখানে মোর জিত।

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানী।

আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।

সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, "কী হয়েছে, বামী।"
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশপানে চেয়ে
আমার বামীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

শেষ গান

যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরনা-স্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের যোগে আয়ু,
নয় সে কেবল দিনরজনীর সাতনলি হার, নয় সে নিশাস-বায়ু।
নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজনবন্ধুজনে
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনসুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।
একের বাঁচন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
বহুদূরে ; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে,—
গর্ভ-বাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে

বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শুষ্ক জীবন মম
শীর্ণ রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণীসম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত সলিল স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
ব'লে নে ভাই, এই যে দেখা এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়;
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাণের আশায়।

শেষ প্রতিষ্ঠা

এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে", "গেছে চলে।"
তবু রাখি ব'লে
ব'লো না, "সে নাই।"
সে-কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়ে বাজে।

মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

শিশু ভোলানাথ



রবীন্দ্রনাথ
স্ট্রাস্‌বুর্গ ১৯১১

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব ;
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণ-চক্র'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে ;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।

অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরি তো কোনো মূল্য নাই,
রচিস যা তোর ইচ্ছা তাই
যাহা খুশি তাই দিয়ে,
তার পর ভুলে যাস যাহা ইচ্ছা তাই নিয়ে।
আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে, দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি'পর।
লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে ;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

শিশুর জীবন

ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা,
তাই তো এমন বুড়ো হয়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল
জমাই এটা ওটা,
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।
কালকে-দিনের ভাবনা এসে
আজ-দিনেরে মারলে ঠেসে
কাল তুলি ফের পরদিনের বোঝা।
সাধের জিনিস ঘরে এনেই
দেখি, এনে ফল কিছু নেই
খোঁজের পরে আবার চলে খোঁজা।

ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত
দেখতে না পাই পথ,
তাকিয়ে থাকি পরশু দিনের পানে,
ভবিষ্যৎ তো চিরকালই
থাকবে ভবিষ্যৎ,
ছুটি তবে মিলবে বা কোন্‌খানে ?

বুদ্ধি-দীপের আলো জ্বালি'
হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি,—
          হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটি।
মন্ত্রণা দেয় কতজনা,
সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা,
          পদে-পদে হাজার খুঁটিনাটি।

শিশু হবার ভরসা আবার
     জাগুক আমার প্রাণে,
          লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
     খসাব একটানে,
          দেখব তারেই বর্তমানের কালে।
ছাদের কোণে পুকুরপারে
জানব নিত্য-অজানারে
          মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা;
জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরি হবে আমার খেলা,
          সুখ রবে মোর বিনামূল্যেই কেনা।

বড়ো হবার দায় নিয়ে, এই
     বড়োর হাটে এসে
          নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।
যাবার বেলায় বিশ্ব আমার
     বিকিয়ে দিয়ে শেষে
          শুধুই নেব ফাঁকা কথার ডালা!
কোন্‌টা সস্তা, কোন্‌টা দামি
ওজন করতে গিয়ে, আমি
          বেলা আমার বইয়ে দেব দ্রুত,

সন্ধ্যা যখন আঁধার হবে
হঠাৎ মনে লাগবে তবে
কোনোটাই না হল মনঃপূত।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হ'ক না তাহা সারা।
জলে স্থলে সঙ্গ আবার
পাক না বাঁধন-হীন,
ধুলায় ফিরে আসুক না পথহারা।
সম্ভাবনার ডাঙা হতে
অসম্ভবের উতল স্রোতে
দিই না পাড়ি স্বপন-তরী নিয়ে।
আবার মনে বুঝি না এই,
বস্তু বলে কিছুই তো নেই
বিশ্ব গড়া যা খুশি তাই দিয়ে।

প্রথম যেদিন এসেছিলেম
নবীন পৃথ্বীতলে
রবির আলোয় জীবন মেলে দিয়ে,
সে যেন কোন্ জগৎ-জোড়া
ছেলেখেলার ছলে,
কোথাথেকে কেই বা জানে কী এ!
শিশির যেমন রাতে রাতে,
কে যে তারে লুকিয়ে গাঁথে,
ঝিল্লি বাজায় গোপন ঝিনিঝিনি।
ভোরবেলা যেই চেয়ে দেখি,
আলোর সঙ্গে আলোর এ কী
ইশারাতে চলছে চেনাচিনি।

সেদিন মনে জেনেছিলেম
নীল আকাশের পথে
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগাল বুঝি!
যা-কিছু সব চলেছে ঐ
ছেলেখেলার রথে
যে-যার আপন দোসর খুঁজি খুঁজি।
গাছে খেলা ফুল-ভরানো
ফুলে খেলা ফল-ধরানো,
ফলের খেলা অঙ্কুরে অঙ্কুরে।
স্থলের খেলা জলের কোলে,
জলের খেলা হাওয়ার দোলে,
হাওয়ার খেলা আপন বাঁশির সুরে।

ছেলের সঙ্গে আছ তুমি
নিত্য ছেলেমানুষ,
নিয়ে তোমার মালমসলার ঝুলি।
আকাশেতে ওড়াও তোমার
কতরকম ফানুস
মেঘে বোলাও রংবেরঙের তুলি।
সেদিন আমি আপন মনে
ফিরেছিলেম তোমার সনে,
খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে।
ভাসিয়েছিলেম রাশি রাশি
কথায় গাঁথা কান্নাহাসি
তোমারি সব ভাসান-খেলার সাথে।

ঋতুর তরী বোঝাই কর
রঙিন ফুলে ফুলে,
কালের স্রোতে যায় তারা সব ভেসে

আবার তারা ঘাটে লাগে
হাওয়ায় দুলে দুলে
এই ধরণীর কূলে কূলে এসে।
মিলিয়েছিলেম বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়,
সাজিয়েছিলেম ঋতুর তরণীতে,
আশা আমার আছে মনে
বকুল কেয়া শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে।

সেদিন যখন গান গেয়েছি
আপন মনে নিজে,
বিনা কাজে দিন গিয়েছে চলে,
তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেছি যে,
চিনেছিলে আমায় সাথি বলে।
তোমার ধুলো তোমার আলো
আমার মনে লাগত ভালো,
শুনেছিলেম উদাস-করা বাঁশি।
বুঝেছিলে সে-ফাল্গুনে
আমার সে-গান শুনে শুনে
তোমারো গান আমি ভালোবাসি।

দিন গেল ঐ মাঠে বাটে,
আঁধার নেমে প'ল;
এপার থেকে বিদায় মেলে যদি
তবে তোমার সন্ধ্যেবেলার
খেয়াতে পাল তোলো,
পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।

আবার, ওগো শিশুর সাথি,
শিশুর ভুবন দাও তো পাতি
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়, তোমার জগৎটিকে
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।

৪ কার্তিক ১৩২৮

তালগাছ

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায় ;
কোথা পাবে পাখা সে ?

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে' তার,—
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝরঝর থথর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি
যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

২ কার্তিক ১৩২৮

বুড়ী

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ী
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাত-শ হাজার কুড়ি।
সাদা সুতোয় জাল বোনে সে
হয় না বুনন সারা
পণ ছিল তার ধরবে জালে
লক্ষ কোটি তারা।

হেনকালে কখন আঁখি
পড়ল ঘুমে ঢুলে,
স্বপনে তার বয়সখানা
বেবাক গেল ভুলে।
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে,
মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি
ছড়িয়ে দিল হেসে।

সন্ধ্যেবেলায় আকাশ চেয়ে
কী পড়ে তার মনে।
চাঁদকে করে ডাকাডাকি,
চাঁদ হাসে আর শোনে।
যে-পথ দিয়ে এসেছিল
স্বপন-সাগর তীরে
দু-হাত তুলে সে-পথ দিয়ে
চায় সে যেতে ফিরে।

হেনকালে মায়ের মুখে
যেমনি আঁখি তোলে
চাঁদে ফেরার পথখানি যে
তক্‌খনি সে ভোলে।
কেউ জানে না কোথায় বাসা
এল কী পথ বেয়ে,
কেউ জানে না এই মেয়ে সেই
আদ্যিকালের মেয়ে।

বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগৎ জুড়ি—
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ডাকে, "বুড়ী বুড়ী"।
সব-চেয়ে যে পুরানো সে,
কোন্ মন্ত্রের বলে
সব-চেয়ে আজ নতুন হয়ে
নামল ধরাতলে।

১৫ ভাদ্র ১৩২৮

রবিবার

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়াগাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মা গো,
এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশপারে তার বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে ?
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল
থাকবারই জন্যেই,
বাড়ি-ফেরার দিকে ওদের
একটুও মন নেই।
রবিবারকে কে যে এমন
বিষম তাড়া করে,
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন
আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ-পারে বাড়িতে তার
কাজ আছে সব-চেয়ে
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে।

সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি,

ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেমনি উঠি জেগে,
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব ঘরের মেয়ে॥

৫ আশ্বিন ১৩২৮

সময়হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম; কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, "দশটা বাজাই বন্ধ।"
তাধিন তাধিন তাধিন।

শুই নে বলে রাগিস যদি, আমি বলব তোরে,
"রাত না হলে রাত হবে কী করে।
নটা বাজাই থামল যখন, কেমন করে শুই।
দেরি বলে নেই তো, মা, কিচ্ছুই।"
তাধিন তাধিন তাধিন।

যত জানিস রূপকথা, মা, সব যদি যাস বলে
রাত হবে না, রাত যাবে না চলে;
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না তো খেলা,
ফুরোয় না তো গল্প বলার বেলা।
তাধিন তাধিন তাধিন।

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে ?
কবে বুঝি আনত মা সেই
ফুলের সাজি বয়ে,
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হয়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে ;

জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

৯ আশ্বিন ১৩২৮

পুতুল ভাঙা

"সাত-আটটে সাতাশ," আমি
বলেছিলেম বলে
গুরুমশায় আমার 'পরে
উঠল রাগে জ্বলে।
মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায়
এবার রথের দিনে
সেই যে রঙিন পুতুলখানি
আপনি দিলে কিনে
খাতার নিচে ছিল ঢাকা;
দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগেমেগে
ভেঙে দিলেন ফেলে।
বল্লেন, "তোর দিনরাত্তির
কেবল যত খেলা।
একটুও তোর মন বসে না
পড়াশুনোর বেলা!"

মা গো, আমি জানাই কাকে ?
ওঁর কি গুরু আছে ?
আমি যদি নালিশ করি
একখনি তাঁর কাছে ?
কোনোরকম খেলার পুতুল
নেই কি, মা, ওঁর ঘরে
সত্যি কি ওঁর একটুও মন
নেই পুতুলের 'পরে ?
সকালসাঁজে তাদের নিয়ে
করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেন নি কি
কোনোরকম হেলা ?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে,
বল দেখি, মা, ওঁর মনে তা
কেমনতরো লাগে ?

৯ আশ্বিন ১৩২৮

মুর্খু

নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই।
আমি তো, মা, চাই নে হতে
পণ্ডিতমশাই।
নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,

মুর্খ্‌ হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কীই বা হবে,
মুর্খ্‌ যারা তাদেরি তো
সমস্তখন ছুটি।

তারাই তো সব রাখাল ছেলে
গোরু চরায় মাঠে ।
নদীর ধারে বনে বনে
তাদের বেলা কাটে ।
ডিঙির 'পরে পাল তুলে দেয়,
ঢেউয়ের মুখে নাও খুলে দেয়,
ঝাউ কাটতে যায় চলে সব
নদীপারের চরে।
তারাই মাঠে মাচা পেতে
পাখি তাড়ায় ফসল-খেতে,
বাঁকে করে দই নিয়ে যায়
পাড়ার ঘরে ঘরে।

কাস্তে হাতে চুবড়ি মাথায়,
সন্ধ্যে হলে পরে
ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ ছেলে,
মন যে কেমন করে।
যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান,
শুনে আমি পণ করি যে
মুর্খ্‌ হব বলে।

দুপুরবেলায় চিল ডেকে যায় ;
হঠাৎ হাওয়া আসি
বাঁশবাগানে বাজায় যেন
সাপ খেলাবার বাঁশি ।
পুবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলার আঁচল দোলে,
ডালে ডালে উছলে ওঠে
শিরীষফুলের ঢেউ ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
পাঠশালা সব ছাড়তে বলে,
আমি জানি এরা তো, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ ।

যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান ।
ঘরে ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান ।
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা,
ধুমধামে যায় সারাবেলা,
আমি তো, মা, চাই নে আদর
তোমার আদর ছাড়া ।
তুমি যদি, মুর্খ বলে
আমাকে মা না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদলা মেঘের পাড়া ।

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে
ভিজিয়ে দেব চুল ।
ঘাটে যখন যাবে, আমি
করব হুলুস্থুল ।

রাত থাকতে অনেক ভোরে
আসব নেমে আঁধার করে,
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুকব ঘরে
দুয়ার ঠেলে ফেলে,
তুমি বলবে মেলে আঁখি,
"দুষ্টু দেয়া খেপল না কি ?"
আমি বলব, "খেপেছে আজ
তোমার মূর্খ ছেলে।"

১০ আশ্বিন ১৩২৮

সাত সমুদ্র পারে

দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার।
সাত সমুদ্র তেরো নদী
আজকে হব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইকো হরিশ খোঁড়া।
তাই ভাবি যে কাকে আমি
করব আমার ঘোড়া।

কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
বাবার খাতা থেকে,
নৌকো দে না বানিয়ে, অমনি
দিস, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বুঝি
দিল্লি থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাত সমুদ্র তীরে।

এমনি কি তোর কাজ আছে, মা,
কাজ তো রোজই থাকে।
বাবার চিঠি এক্‌খুনি কি
দিতেই হবে ডাকে?
নাই বা চিঠি ডাকে দিলে
আমার কথা রাখো,
আজকে না হয় বাবার চিঠি
মাসি লিখুন নাকো!

আমার এ যে দরকারি কাজ
বুঝতে পার না কি?
দেরি হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি।
মেঘ কেটে যেই রোদ উঠবে
বৃষ্টি বন্ধ হলে
সাত সমুদ্র তেরো নদী
কোথায় যাবে চলে!

১০ আশ্বিন [১৩২৮]

জ্যোতিষী

ঐ যে রাতের তারা
জানিস কি, মা, কারা?
সারাটিখন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমনধারা!
আমার যেমন নেইকো ডানা,
আকাশপানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,

তেমনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর 'পরে।

সকালে যে নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস কলসী কাঁখে
শজনেতলার ঘাটে
সেথায় ওদের আকাশ থেকে
আপন ছায়া দেখে দেখে
সারা পহর কাটে।
ভাবে ওরা চেয়ে চেয়ে,
হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকালসাঁজে
কলসীখানি ধরে বুকে
সাঁতরে নিতেম মনের সুখে
ভরা নদীর মাঝে।

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায়, যেথা গভীর বনে
রাক্ষসদের ঘরে
রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে
জাগাই শয্যা'পরে।
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে
হত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায় খেলায়
তার পরে সেই রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে।

যেদিন আমি নিযুত রাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে
স্বপন থেকে জেগে'
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
ঝাপসা আছে মেঘে !
বসে বসে ক্ষণে ক্ষণে
সেদিন আমার হয় যে মনে
ওদের স্বপ্ন বলে।
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
ওরা আসে সেই পহরেই,
ভোর বেলা যায় চলে।
আঁধার রাতি অন্ধ ও যে,
দেখতে না পায়, আলো খোঁজে,
সবই হারিয়ে ফেলে।
তাই আকাশে মাদুর পেতে
সমস্তখন স্বপনেতে
দেখা-দেখা খেলে।

১০ আশ্বিন ১৩২৮

খেলা-ভোলা

তুই কি ভাবিস, দিনরাত্তির
খেলতে আমার মন ?
ককখনো তা সত্যি না, মা,—
আমার কথা শোন্।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টিবাদল গেছে ছুটে,

রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে—
বাঁশের ডালে ডালে ;
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পুজোর সানাই বাজছে দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে ;—
খেলনাগুলো সামনে মেলি'
কী যে খেলি, কী যে খেলি,
সেই কথাটাই সমস্তখন
ভাবনু আপন মনে।
লাগল না ঠিক কোনো খেলাই,
কেটে গেল সারাবেলাই,
রেলিং ধরে রইনু বসে
বারান্দাটার কোণে।

খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমনতরো বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি।
চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই,
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ,
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাকত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া

তক্‌খুনি যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে কষে।
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে।

একেক দিন যে দেখেছি, তুই
বাবার চিঠি হাতে
চুপ করে কী ভাবিস বসে
ঠেস দিয়ে জানলাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
তুই যেন কোন্‌দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের
অনেক দূরের মা।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই
হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠ-পারে কোন্ বটের তলার
বাঁশির সুরের মা।
খেলার কথা যায় যে ভেসে,
মনে ভাবি কোন্ কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ি ছিল
কোন্ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অজানা সেই দ্বীপের ঘরে
তোমায় আমায় ভোরবেলাতে
নৌকোতে পাল তুলে।

১১ আশ্বিন ১৩২৮

পথহারা

আজকে আমি কতদূর যে
          গিয়েছিলেম চলে।
যত তুমি ভাবতে পার
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
          তোমায় ব'লে ব'লে।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
          আরো অনেক দূর।
মাঝখানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ, কত যে খেত,
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়
          ছাড়িয়ে তালিমপুর।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
          সাত-কুশি সব গ্রাম,
ধানের গোলা গুনব কত
জোদ্দারদের গোলার মতো,
সেখানে যে মোড়ল কারা
          জানি নে তার নাম।

একে একে মাঠ পেরোলুম
          কত মাঠের পরে।
তার পরে, উঃ, বলি মা শোন্,
সামনে এল প্রকাণ্ড বন,
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
          গা ছম-ছম করে।

জামতলাতে বুড়ী ছিল,
বললে "খবরদার" !
আমি বললেম বারণ শুনে
"ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে,"
যতক্ষণ সে গুনতে থাকে
হয়ে গেলাম পার।

কিছুরি শেষ নেই কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি'।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোশপরা আঁধার
সাজল জুজুবুড়ী।

খেজুরগাছের মাথায় বসে
দেখছে কারা ঝুঁকি।
কারা যে সব ঝোপের পাশে
একটুখানি মুচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি।

আমায় যেন চোখ টিপছে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কাদের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে,
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুড়সুড়ি।

ফিসফিসিয়ে কইছে কথা
দেখতে না পাই কে সে।

অন্ধকারে হুদ্দাড়িয়ে
কে যে কারে যায় তাড়িয়ে,
কী জানি কী গা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে।

ফুরোয় না পথ ভাবছি আমি
ফিরব কেমন করে।
সামনে দেখি কিসের ছায়া,—
ডেকে বলি, "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে না মোরে।"

কয় না কিছুই, চুপটি করে
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঙ্গিমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন এসে ডেকে
কে জানে, মা, হালুম ক'রে
পড়ল যে কার ঘাড়ে।

বল্ দেখি তুই, কেমন করে
ফিরে পেলেম মাকে?
কেউ জানে না কেমন করে;
কানে কানে বলব তোরে?—
যেমনি স্বপন ভেঙে গেল
সিঙ্গিমামার ডাকে।

১৫ আশ্বিন ১৩২৮

সংশয়ী

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে
শুধাস কি, মা, তাই ?
যেখান থেকে এসেছিলেম
সেথায় যেতে চাই ।
কিন্তু সে যে কোন্ জায়গা
ভাবি অনেকবার ।
মনে আমার পড়ে না তো
একটুখানি তার ।
ভাবনা আমার দেখে, বাবা
বললে সেদিন হেসে
"সে-জায়গাটি মেঘের পারে
সন্ধ্যাতারার দেশে ।"
তুমি বল, "সে-দেশখানি
মাটির নিচে আছে,
যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে
ফুল ফোটে সব গাছে ।"
মাসি বলে, "সে-দেশ আমার
আছে সাগরতলে,—
যেখানেতে আঁধার ঘরে
লুকিয়ে মানিক জ্বলে ।"
দাদা আমার চুল টেনে দেয়,
বলে, "বোকা ওরে,
হাওয়ায় সে-দেশ মিলিয়ে আছে
দেখবি কেমন করে ?"
আমি শুনে ভাবি, আছে
সকল জায়গাতেই ।
সিধু মাস্টার বলে শুধু
"কোনোখানেই নেই ।"

রাজা ও রানী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পিরভু কেমন নাচে।
ডালে ছিলেম চড়ে,
সেটা ভেঙেই গেল পড়ে।
সেদিন হল মানা
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
রথ দেখতে যাওয়া,
আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।
কে দিল সেই সাজা,
জান কে ছিল সেই রাজা ?

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।
সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখল কেবল চেয়ে।
বললে না তো কিছু,
কেবল মুখটি করে নিচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দিয়ে।
হল না তার খাওয়া,
কিংবা রথ দেখতে যাওয়া।
নিল আমায় কোলে
সাজার সময় সারা হলে।

গলা ভাঙা-ভাঙা,
তার চোখ-দুখানি রাঙা।
কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি।

দূর

পুজোর ছুটি আসে যখন
বকসারেতে যাবার পথে—
দূরের দেশে যাচ্ছি ভেবে
ঘুম হয় না কোনোমতে।
সেখানে যেই নতুন বাসায়
হপ্তা দুয়েক খেলায় কাটে
দূর কি আবার পালিয়ে আসে
আমাদেরি বাড়ির ঘাটে!
দূরের সঙ্গে কাছের কেবল
কেনই যে এই লুকোচুরি,
দূর কেন যে করে এমন
দিনরাত্তির ঘোরাঘুরি।
আমরা যেমন ছুটি হলে
ঘরবাড়ি সব ফেলে রেখে
রেলে চড়ে পশ্চিমে যাই
বেরিয়ে পড়ি দেশের থেকে,
তেমনিতরো সকালবেলা
ছুটিয়ে আলো আকাশেতে
রাতের থেকে দিন যে বেরোয়
দূরকে বুঝি খুঁজে পেতে?
সে-ও তো যায় পশ্চিমেতেই,
ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে হলে,

তখন দেখে রাতের মাঝেই
দূর সে আবার গেছে চলে।
সবাই যেন পলাতকা
মন টেকে না কাছের বাসায়।
দলে দলে পলে পলে
কেবল চলে দূরের আশায়।
পাতায় পাতায় পায়ের ধ্বনি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডাকাডাকি,
হাওয়ায় হাওয়ায় যাওয়ার বাঁশি
কেবল বাজে থাকি থাকি।
আমায় এরা যেতে বলে,
যদি বা যাই, জানি তবে
দূরকে খুঁজে খুঁজে শেষে
মায়ের কাছেই ফিরতে হবে।

বাউল

দূরে অশথতলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ ?
সামনে আঙিনাতে
তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচ !
পথে করতে খেলা
আমার কখন হল বেলা
আমায় শাস্তি দিল তাই।
ইচ্ছে হোথায় নাবি
কিন্তু ঘরে বন্ধ চাবি
আমার বেরোতে পথ নাই।

বাড়ি ফেরার তরে
তোমায় কেউ না তাড়া করে
তোমার নাই কোনো পাঠশালা।
সমস্ত দিন কাটে
তোমার পথে ঘাটে মাঠে
তোমার ঘরেতে নেই তালা।
তাই তো তোমার নাচে
আমার প্রাণ যেন ভাই বাঁচে,
আমার মন যেন পায় ছুটি,
ওগো তোমার নাচে
যেন ঢেউয়ের দোলা আছে,
ঝড়ে গাছের লুটোপুটি।
অনেক দূরের দেশ
আমার চোখে লাগায় রেশ,
যখন তোমায় দেখি পথে।
দেখতে যে পায় মন
যেন নাম-না-জানা বন
কোন্ পথহারা পর্বতে।
হঠাৎ মনে লাগে,
যেন অনেক দিনের আগে,
আমি অমনি ছিলেম ছাড়া।
সেদিন গেল ছেড়ে,
আমার পথ নিল কে কেড়ে,
আমার হারাল একতারা।
কে নিল গো টেনে,
আমায় পাঠশালাতে এনে,
আমার এল গুরুমশায়।
মন সদা যায় চলে
যত ঘরছাড়াদের দলে
তারে ঘরে কেন বসায়?

কও তো আমায়, ভাই,
তোমার গুরুমশায় নাই ?
আমি যখন দেখি ভেবে
বুঝতে পারি খাঁটি,
তোমার বুকের একতারাটি,
তোমায় ঐ তো পড়া দেবে।
তোমার কানে কানে
ওরি গুনগুনানি গানে
তোমায় কোন্ কথা যে কয়!
সব কি তুমি বোঝ ?
তারি মানে যেন খোঁজ
কেবল ফিরে' ভুবনময়।
ওরি কাছে বুঝি
আছে তোমার নাচের পুঁজি,
তোমার খেপা পায়ের ছুটি ?
ওরি সুরের বোলে
তোমার গলার মালা দোলে,
তোমার দোলে মাথার ঝুঁটি।
মন যে আমার পালায়
তোমার একতারা-পাঠশালায়,
আমায় ভুলিয়ে দিতে পার ?
নেবে আমায় সাথে ?
এ-সব পণ্ডিতেরি হাতে
আমায় কেন সবাই মার ?
ভুলিয়ে দিয়ে পড়া
আমায় শেখাও সুরে-গড়া
তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।
আর কিছু না চাই,
যেন আকাশখানা পাই,
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।

দূরে কেন আছ ?
দ্বারের আগল ধরে নাচ,
বাউল আমারি এইখানে।
সমস্ত দিন ধরে
যেন মাতন ওঠে ভরে
তোমার ভাঙন-লাগা গানে।

দুষ্টু

তোমার কাছে আমিই দুষ্টু
ভালো যে আর সবাই।
মিত্তিরদের কালু নিলু
ভারি ঠাণ্ডা ক-ভাই!
যতীশ ভালো, সতীশ ভালো,
ন্যাড়া নবীন ভালো,
তুমি বল ওরাই কেমন
ঘর করে রয় আলো।
মাখন বাবুর দুটি ছেলে
দুষ্টু তো নয় কেউ—
গেটে তাদের কুকুর বাঁধা
কর্তেছে ঘেউ ঘেউ।
পাঁচকড়ি ঘোষ লক্ষ্মী ছেলে,
দত্তপাড়ার সবাই,
তোমার কাছে আমিই দুষ্টু
ভালো যে আর সবাই।
তোমার কথা আমি যেন
শুনি নে কক্‌খনোই,
জামাকাপড় যেন আমার
সাফ থাকে না কোনোই!

খেলা করতে বেলা করি,
বৃষ্টিতে যাই ভিজে,
দুষ্টুপনা আরো আছে
অমনি কত কী যে!
বাবা আমার চেয়ে ভালো?
সত্যি বলো তুমি,
তোমার কাছে করেন নি কি
একটুও দুষ্টুমি?
যা বল সব শোনেন তিনি,
কিচ্ছু ভোলেন নাকো?
খেলা ছেড়ে আসেন চলে
যেমনি তুমি ডাক?

ইচ্ছামতী

যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে একখনি হই
ইচ্ছামতী নদী।
রইবে আমার দখিন ধারে
সূর্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধ্যেবেলায়
নামবে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরি সাথে,
আধেক কথা দিনের বেলায়,
আধেক কথা রাতে।

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই
আপন গাঁয়ের ঘাটে

ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই
দূরের মাঠে মাঠে
গাঁয়ের মানুষ চিনি, যারা
নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা
সাঁতরে ওপার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের
নতুনতরো বেশ,
নাম জানি নে, গ্রাম জানি নে
অদ্ভুতের একশেষ।

জলের উপর ঝলোমলো
টুকরো আলোর রাশি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন,
হাততালি আর হাসি।
নিচের তলায় তলিয়ে যেথায়
গেছে ঘাটের ধাপ
সেইখানেতে কারা সবাই
রয়েছে চুপচাপ।
কোণে কোণে আপন মনে
করছে তারা কী কে।
আমারি ভয় করবে কেমন
তাকাতে সেই দিকে।

গাঁয়ের লোকে চিনবে আমায়
কেবল একটুখানি।
বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে
আমিই সে কি জানি?
একধারেতে মাঠে ঘাটে
সবুজ বরন শুধু,

আর একধারে বালুর চরে
রৌদ্র করে ধু ধু।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা,
রাত্তিরে থম থম!
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে
করবে গা ছম ছম।

২৩ আশ্বিন ১৩২৮

অন্য মা

আমার মা না হয়ে তুমি
আর কারো মা হলে
ভাবছ তোমায় চিনতেম না,
যেতেম না ঐ কোলে?
মজা আরো হত ভারি,
দুই জায়গায় থাকত বাড়ি,
আমি থাকতেম এই গাঁয়েতে,
তুমি পারের গাঁয়ে।
এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হত খেলা
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে
পেরিয়ে যেতেম নায়ে।
হঠাৎ এসে পিছন দিকে
আমি বলতেম, "বল্‌ দেখি কে?"
তুমি ভাবতে, চেনার মতো
চিনি নে তো তবু।
তখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমি বলতেম গলা ধরে—
"আমায় তোমার চিনতে হবেই,
আমি তোমার অবু!"

ঐ পারেতে যখন তুমি
আনতে যেতে জল,—
এই পারেতে তখন ঘাটে
বল্ দেখি কে বল্ ?
কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌঁছোত সে
বুঝতে কি, সে কার ?
সাঁতার আমি শিখিনি যে
নইলে আমি যেতেম নিজে,
আমার পারের থেকে আমি
যেতেম তোমার পার।
মায়ের পারে অবুর পারে
থাকত তফাত, কেউ তো কারে
ধরতে গিয়ে পেত নাকো,
রইত না একসাথে।
দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
দেখা-দেখি দূরে দূরে,—
সন্ধ্যেবেলায় মিলে যেত
অবুতে আর মাতে।

কিন্তু হঠাৎ কোনোদিনে
যদি বিপিন মাঝি
পার করতে তোমার পারে
নাই হত মা রাজি।
ঘরে তোমার প্রদীপ জেলে
ছাতের 'পরে মাদুর মেলে
বসতে তুমি, পায়ের কাছে
বসত ক্ষান্ত বুড়ী,

শিশু ভোলানাথ

উঠত তারা সাত ভায়েতে,
ডাকত শেয়াল ধানের খেতে,
উড়ো ছায়ার মতো বাদুড়
কোথায় যেত উড়ি।
তখন কি মা, দেরি দেখে
ভয় হত না থেকে থেকে,
পার হয়ে, মা, আসতে হতই
অবু যেথায় আছে।
তখন কি আর ছাড়া পেতে ?
দিতেম কি আর ফিরে যেতে ?
ধরা পড়ত মায়ের ওপার
অবুর পারের কাছে।

দুয়োরানী

ইচ্ছে করে মা, যদি তুই
হতিস দুয়োরানী!
ছেড়ে দিতে এমনি কি ভয়
তোমার এ ঘরখানি।
ঐখানে ঐ পুকুরপারে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
ও যেন ঘোর বনের মধ্যে
কেউ কোথাও নেই।
ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে
আসবে না কেউ তোমার কাছে,

দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।

আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অমনি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।
শিংগুলি সব আঁকাবাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে।
ওরা সবাই আমায় বোঝে,
করবে না ভয় একটুও যে,
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বসবে কাছে ঘেঁষে।
ফলসা-বনে গাছে গাছে
ফল ধরে মেঘ করে আছে,
ঐখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।
শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।

দিন ফুরোবে, সাঁজের আঁধার
নামবে তালের গাছে।

তখন এসে ঘরের কোণে
বসব কোলের কাছে।
থাকবে না তোর কাজ কিছু তো,
রইবে না তোর কোনো ছুতো,
রূপ-কথা তোর বলতে হবে
রোজই নতুন করে।
সীতার বনবাসের ছড়া
সবগুলি তোর আছে পড়া ;
সুর করে তাই আগাগোড়া
গাইতে হবে তোরে।
তার পরে যেই অশথবনে
ডাকবে পেঁচা, আমার মনে
একটুখানি ভয় করবে
রাত্রি নিষুত হলে।
তোমার বুকে মুখটি গুঁজে
ঘুমেতে চোখ আসবে বুজে
তখন আবার বাবার কাছে
যাস নে যেন চলে!

১৪ আশ্বিন ১৩২৮

রাজমিস্ত্রী

বয়স আমার হবে তিরিশ,
দেখতে আমায় ছোটো,
আমি নই, মা, তোমার শিরিশ,
আমি হচ্ছি নোটো।
আমি যে রোজ সকাল হলে
যাই শহরের দিকে চলে
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চড়ে।

সকাল থেকে সারা দুপর
ইট সাজিয়ে ইটের উপর
খেয়ালমতো দেয়াল তুলি গড়ে।
ভাবছ তুমি নিয়ে ঢেলা
ঘর-গড়া সে আমার খেলা,
ককৃখনো না সত্যিকার সে কোঠা।
ছোটো বাড়ি নয় তো মোটে,
তিনতলা পর্যন্ত ওঠে,
থামগুলো তার এমনি মোটা মোটা।
কিন্তু যদি শুধাও আমায়
ঐখানেতেই কেন থামায়?
দোষ কী ছিল ষাট-সত্তর তলা?
ইট সুরকি জুড়ে জুড়ে
একেবারে আকাশ ফুঁড়ে
হয় না কেন কেবল গেঁথে চলা?
গাঁথতে গাঁথতে কোথায় শেষে
ছাত কেন না তারায় মেশে?
আমিও তাই ভাবি নিজে নিজে।
কোথাও গিয়ে কেন থামি
যখন শুধাও, তখন আমি
জানি নে তো তার উত্তর কী যে।

যখন খুশি ছাতের মাথায়
উঠছি ভারা বেয়ে।
সত্যি কথা বলি, তাতে
মজা খেলার চেয়ে।
সমস্ত দিন ছাত-পিটুনী
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নিচে চলছে গাড়িঘোড়া।

বাসনওআলা থালা বাজায় ;
সুর করে ঐ হাঁক দিয়ে যায়
আতাওআলা নিয়ে ফলের ঝোড়া।
সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হো হো করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।
রোদ্দুর যেই আসে পড়ে
পুবের মুখে কোথায় ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে
আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে।
জান তো, মা, আমার পাড়া
যেখানে ওই খুঁটি গাড়া
পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।
তোরা যদি শুধাস মোরে
খড়ের চালায় রই কী করে ?
কোঠা যখন গড়তে পারি নিজে ;
আমার ঘর যে কেন তবে
সব-চেয়ে না বড়ো হবে ?
জানি নে তো তার উত্তর কী যে !

৬ কার্তিক ১৩২৮

ঘুমের তত্ত্ব

জাগার থেকে ঘুমোই, আবার
ঘুমের থেকে জাগি,—
অনেক সময় ভাবি মনে
কেন, কিসের লাগি ?

আমাকে, মা, যখন তুমি
ঘুম পাড়িয়ে রাখ
তখন তুমি হারিয়ে গিয়ে
তবু হারাও নাকো।
রাতে সূর্য, দিনে তারা
পাই নে, হাজার খুঁজি।
তখন তা'রা ঘুমের সূর্য,
ঘুমের তারা বুঝি?
শীতের দিনে কনকচাঁপা
যায় না দেখা গাছে,
ঘুমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে
নেই তবুও আছে।
রাজকন্যে থাকে, আমার
সিঁড়ির নিচের ঘরে।
দাদা বলে, "দেখিয়ে দে তো,"
বিশ্বাস না করে।
কিন্তু, মা, তুই জানিস নে কি
আমার সে রাজকন্যে
ঘুমের তলায় তলিয়ে থাকে,
দেখি নে সেইজন্যে।

নেই তবুও আছে এমন
নেই কি কত জিনিস?
আমি তাদের অনেক জানি,
তুই কি তাদের চিনিস?
যেদিন তাদের রাত পোয়াবে
উঠবে চক্ষু মেলি
সেদিন তোমার ঘরে হবে
বিষম ঠেলাঠেলি।

নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া,
ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমী
ভিড় ক'রে সব আসবে যখন
কী যে করবে তুমি !
তখন তুমি ঘুমিয়ে প'ড়ো,
আমিই জেগে থেকে
নানারকম খেলায় তাদের
দেব ভুলিয়ে রেখে ।
তার পরে যেই জাগবে তুমি
লাগবে তাদের ঘুম,
তখন কোথাও কিচ্ছুই নেই
সমস্ত নিজ্‌ঝুম।

২৭ আশ্বিন ১৩২৮

দুই আমি

বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে বেড়ায়
উড়ো মেঘের দল হয়ে,
সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায়
শ্রাবণ-ধারার জল হয়ে ।
আমি ভাবি চুপটি করে
মোর দশা হয় ঐ যদি !
কেই বা জানে আমি আবার
আর-একজনও হই যদি !
একজনারেই তোমরা চেন
আর-এক আমি কারোই না ।
কেমনতরো ভাবখানা তার
মনে আনতে পারই না ।

হয়তো বা ঐ মেঘের মতোই
নতুন নতুন রূপ ধরে
কখন সে যে ডাক দিয়ে যায়,
কখন থাকে চুপ করে।
কখন বা সে পুবের কোণে
আলো-নদীর বাঁধ বাঁধে,
কখন বা সে আধেক রাতে
চাঁদকে ধরার ফাঁদ ফাঁদে।
শেষে তোমার ঘরের কথা
মনেতে তার যেই আসে,
আমার মতন হয়ে আবার
তোমার কাছে সেই আসে।
আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা,
একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া,
আরেকটা এই ভুঁই-খেলা।

২৮ আশ্বিন ১৩২৮

মর্ত্যবাসী

কাকা বলেন, সময় হলে
সবাই চলে
যায় কোথা সেই স্বর্গ-পারে।
বল্‌ তো কাকী
সত্যি তা কি
একেবারে?
তিনি বলেন, যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,

দ্বারের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।
বাবা গেছেন এমনি করে
কখন ভোরে
তখন আমি বিছানাতে।
তেমনি মাখন
গেল কখন
অনেক রাতে।
কিন্তু আমি বলছি তোমায়
সকল সময়
তোমার কাছেই করব খেলা,
রইব জোরে
গলা ধরে
রাতের বেলা।
সময় হলে মানব না তো,
জানব না তো,
ঘণ্টা মাঝির বাজল কবে।
তাই কি রাজা
দেবেন সাজা
আমায় তবে ?
তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
সেথায় আলো
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়,
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুলডাঙায় !
হ'ক না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্ছে
কেই বা তাকে বলো, কাকী ?

যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেমনি থাকি !
ঐ আমাদের গোলাবাড়ি,
গোরুর গাড়ি
পড়ে আছে চাকা-ভাঙা,
গাবের ডালে
পাতার লালে
আকাশ রাঙা।
সেথা বেড়ায় যক্ষী বুড়ী
গুড়ি গুড়ি
আসশেওড়ার ঝোপে ঝাপে
ফুলের গাছে
দোয়েল নাচে,
ছায়া কাঁপে।
লুকিয়ে আমি সেথা পলাই,
কানাই বলাই
দু-ভাই আসে পাড়ার থেকে।
ভাঙা গাড়ি
দোলাই নাড়ি
ঝেঁকে ঝেঁকে।
সন্ধ্যেবেলায় গল্প বলে
রাখ কোলে,
মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
চালতা-শাখে
পেঁচা ডাকে,
বাড়ে রাতি।
স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বলছি, কাকী,
দেখব আমায় কে কী করে।

চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

২৯ আশ্বিন ১৩২৮

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হতিস,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।
মা ব'লে তার সাড়া দেব
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠত তাই।
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায়
আমার কানে কানে
টলমলিয়ে কী বলত যে
ঝলমলানির গানে।
আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তারা
নাচন দিত জুড়ি।
উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে

আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে’
　　কোথায় যেত ভেসে।
সেই হত তোর বাদল-বেলার
　　রূপকথাটির মতো ;
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
　　পেরিয়ে রাজ্য কত ;
সেই আমারে বলে যেত
　　কোথায় আলেখ-লতা,
সাগরপারের দৈত্যপুরের
　　রাজকন্যার কথা ;
দেখতে পেতেম দুয়োরানীর
　　চক্ষু ভর-ভর,
শিউরে উঠে পাতা আমার
　　কাঁপত থরথর।
হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার
　　হাওয়ার পাছে পাছে
নামত আমার পাতায় পাতায়
　　টাপুর-টুপুর নাচে ;
সেই হত তোর কাঁদন-স্বরে
　　রামায়ণের পড়া,
সেই হত তোর গুনগুনিয়ে
　　শ্রাবণ-দিনের ছড়া।
মা, তুই হতিস নীলবরনী,
　　আমি সবুজ কাঁচা ;
তোর হত, মা, আলোর হাসি,
　　আমার পাতার নাচা।
তোর হত, মা, উপর থেকে
　　নয়ন মেলে চাওয়া,
আমার হত আঁকুবাঁকু
　　হাত তুলে গান গাওয়া।

তোর হত, মা চিরকালের
তারার মণিমালা,
আমার হত দিনে দিনে
ফুল-ফোটাবার পালা।

বৃষ্টি রৌদ্র

ঝুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে
দল বেঁধে মেঘ চলেছে যে
আজকে সারাবেলা।
কালো ঝাঁপির মধ্যে ভরে
সূর্যিকে নেয় চুরি করে,
ভয়-দেখাবার খেলা।
বাতাস তাদের ধরতে মিছে
হাঁপিয়ে ছোটে পিছে পিছে,
যায় না তাদের ধরা।
আজ যেন ওই জড়োসড়ো
আকাশ জুড়ে মস্ত বড়ো
মন-কেমন-করা।
বটের ডালে ডানা-ভিজে
কাক বসে ওই ভাবছে কী যে,
চড়ুইগুলো চুপ।
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে
শজনেপাতায় ঝরে ঝরে
জল পড়ে টুপটুপ।
লেজের মধ্যে মাথা থুয়ে
খ্যাঁদন কুকুর আছে শুয়ে
কেমন একরকম।

দালানটাতে ঘুরে ঘুরে
পায়রাগুলো কাঁদন-স্বরে
ডাকছে বকবকম।
কার্তিকে ঐ ধানের খেতে
ভিজে হাওয়া উঠল মেতে
সবুজ ঢেউয়ের 'পরে।
পরশ লেগে দিশে দিশে
হিহি করে ধানের শিষে
শীতের কাঁপন ধরে।
ঘোষাল-পাড়ার লক্ষ্মী বুড়ী
ছেঁড়া কাঁথায় মুড়িসুড়ি
গেছে পুকুরপাড়ে,
দেখতে ভালো পায় না চোখে
বিড়বিড়িয়ে বকে বকে
শাক তোলে, ঘাড় নাড়ে।
ঐ ঝমাঝম বৃষ্টি নামে
মাঠের পারে দূরের গ্রামে
ঝাপসা বাঁশের বন।
গোরুটা কার থেকে থেকে
খোঁটায়-বাঁধা উঠছে ডেকে
ভিজছে সারাক্ষণ।
গদাই কুমোর অনেক ভোরে
সাজিয়ে নিয়ে উঁচু ক'রে
হাঁড়ির উপর হাঁড়ি
চলছে রবিবারের হাটে
গামছা মাথায় জলের ছাঁটে
হাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি।
বন্ধ আমার রইল খেলা,
ছুটির দিনে সারাবেলা
কাটবে কেমন করে?

মনে হচ্ছে এমনিতরো
ঝরবে বৃষ্টি ঝরঝর
দিনরাত্তির ধরে !
এমন সময় পুবের কোণে
কখন যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে ঐ মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে,
লাগায় ঝিলিমিলি।
বাঁশবাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে একনিমেষে
বাদলবেলার কথা।
হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
বেড়ার ঝুমকোলতা।
উপর নিচে আকাশ ভরে
এমন বদল কেমন করে
হয়, সে-কথাই ভাবি।
উলটপালট খেলাটি এই,
সাজের তো তার সীমানা নেই,
কার কাছে তার চাবি ?
এমন যে ঘোর মন-খারাপি
বুকের মধ্যে ছিল চাপি
সমস্ত খন আজি

হঠাৎ দেখি সবই মিছে
নাই কিছু তার আগে পিছে
এ যেন কার বাজি।

নাটক ও প্রহসন

গুরু

সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।

শান্তিনিকেতন
১লা ফাল্গুন
১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরু

১

অচলায়তন

একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই শুনেছিস ?

দ্বিতীয়। শুনেছি—কিন্তু চুপ কর !

তৃতীয়। কেন বল দেখি ?

দ্বিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয় ?

প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।

তৃতীয়। কী বলেছেন বল না।

প্রথম। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু আসছেন !

তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই ?

দ্বিতীয়। ভয় করছে।

প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।

তৃতীয়। কিন্তু ভাই গুরু কী ?

দ্বিতীয়। তা জানি নে।

তৃতীয়। কে জানে ?

দ্বিতীয়। এখানে কেউ জানে না।

প্রথম। শুনেছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।

তৃতীয়। তাহলে এখানে কোথায় ধরবে ?

প্রথম। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।

তৃতীয়। কোথাও না ?

প্রথম। কোথাও না।

তৃতীয়। তাহলে কী হবে ?

প্রথম। ভারি মজা হবে। [প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না॥

ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।

সঞ্জীবের প্রবেশ

সঞ্জীব। তাই তো শুনেছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো।

পঞ্চক। কে দিলে তা তো কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না, পঞ্চক?

পঞ্চক। বাঃ, সেইজন্যেই তো পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।

সঞ্জীব। সেই বুঝি তোমার তৈরি হওয়া?

পঞ্চক। আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আসবেন তখন ওই সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।

সঞ্জীব। তাই তো দেখছি। [প্রস্থান

পঞ্চক। গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেছ? বোঝা ফেলো। গুরু আসছেন যে।

জয়োত্তম। আরে ছুঁয়ো না, এ-সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহদ্বার সাজাতে চলেছি।

পঞ্চক। গুরু কোন্‌ দ্বার দিয়ে ঢুকবেন তা জানবে কী করে?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।

পঞ্চক। তোমরাও জান না আমিও জানি নে—তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মর, আমি হালকা হয়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই। [প্রস্থান

পঞ্চক। গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চক। এবার দাদা স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চক। আমি মহাপঞ্চক গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক। কেন বলো তো?

পঞ্চক। গুরু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে!

মহাপঞ্চক। গুরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্চক। তার জন্যে ভাবনা কী। নির্লজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব!

মহাপঞ্চক। মন্তরে ভুল হলে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চক। অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্রটা—

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ওই শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি সময় নষ্ট ক'রো না। গুরু আসছেন।

পঞ্চক। গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না॥

ও কী ও। কান্না শুনি যে। এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই অচলায়তনে ওই বালকের চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে।

প্রস্থান ও বালক সুভদ্রকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল—কী হয়েছে বল।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস? কী পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে?

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি!

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে।

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে;—আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তাহলে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত—আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম। অ্যাঁ, সুভদ্র। তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ। ভয় নেই সুভদ্র, কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিঁকতেই পারত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে যে সে—

পঞ্চক। তাহলে কী?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন বলি সুভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে—কিন্তু যাই হ'ক না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় কর না ?

সকল ছেলে। ভয় কর না ?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ ?

পঞ্চক। দেখেছি বই কি। ও-মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ। কী ভয়ানক। আঠারো বার !

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল ?

পঞ্চক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয়। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি।

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পঞ্চক। তাহলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।—ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়। না না, বলিস নে।

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না—কী ভয়ানক।

প্রথম। আচ্ছা, একটু,—খুব একটুখানি বল ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর ব'লো না সুভদ্র। ওই যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল চল—আর না।

পঞ্চক। কেন ? এখন তোমাদের কী ?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি ? আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কী ?

দ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈঋর্ত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না ?

পঞ্চক। কেন রে ?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না ?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য। [সুভদ্র ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়।

পঞ্চক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনতে হবে এখন বিরক্ত করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন ? সুভদ্র শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে ?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ ? আচ্ছা বেশ। তাহলে বসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কনুই ঠেকিয়েছ। তাহলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ওই জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে।

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র যাও তুমি।—কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে—তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায় মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ। করেছিস কী। আজ তিন-শ পঁয়তাল্লিশ বছর ওই জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে।

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিন-শ পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়-মশায়ের মুখে আর কথা নেই। গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই আচার্যদেবকে জানাই গে!

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব।

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন।

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি— কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য। না আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। সুতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো একমুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য। ঠিক, ঠিক,—ঠিক বলেছ সুতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব। এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি!

উপাচার্য। আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সুতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। ওই যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়। এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল। ওই আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস, পঞ্চক।

পঞ্চক। করলেন কী। আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে।

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বৎস।

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি।

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয় ?

আচার্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নিচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস।

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যূনক জাতির সঙ্গে মেশ।

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান।

আচার্য। না না থাক, ব'লো না। কিন্তু যূনকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে ?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে—তুমি ভুল করো গে—আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চক। ওই উপাচার্য আসছেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি।

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিন-শ বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি—সবাই ভুলেই গেছে। ওই যে মহাপঞ্চক আসছে—যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেই জন্যেই তো এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান জলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস?

মহাপঞ্চক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার স্থালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে। [সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই।

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকমিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই—সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়। যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এ রকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি। এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এস পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

[উপাচার্যের প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়?

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সকলই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান?

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল? এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এই সব অনাচার ঘটতে লাগল ?

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী ?

অধ্যেতা। সুভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য ?

মহাপঞ্চক। কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে।

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক ?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ডাকতেই সুভদ্র ছুটে এল কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে ?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি ? স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য !

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী। এতদিন এই আয়তনে আছি কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি !

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক না !

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয়—আপনি বলে দিন না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে ?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী। মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে। পারবে না?

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এস সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এস হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কর রে নৃত্য কর।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম বলছি থাম।

পঞ্চক। গান

ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন— ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ রে ও ভাই নাচ রে,—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে,—
লাজভয় ঘুচিয়ে দে রে;
তোরে আজ থামায় কে রে!

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না। ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া। ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হ'য়োনা। ঘোর বিপদ আসন্ন সে-কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ ক'রো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস ক-জন লোকে পারে। ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে।

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত ক'রো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জয়োত্তম। দেখুন আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেই জন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তাহলে আর দ্বিধা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে

জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার—আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

বিশ্বম্ভর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কী হয়েছে।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে। ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এস আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার—আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর। না না, আয় রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনও কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মুষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে। কখন সময় পেল সে। সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে।

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে—লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ওই প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে। এস তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য ক'রো না—এস পঞ্চক ওকে কোলে করে নিয়ে এস।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক্! তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী। এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ওই যে যূনকরা।

মহাপঞ্চক। যূনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। চণ্ডক বলে একজন যূনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এদিকে আমাদের অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী।

রাজা। সে কী কথা।

সঞ্জীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ। কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তরদিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেইদিককার জানালা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বম্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি—শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারিগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যূনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়? তারা যে অন্ত্যজজাতি—অশুচি পতিত।

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে ক'রো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

দূতের প্রবেশ

দূত। শুনলুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে?

দূত। চারিদিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তাহলে তো তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপঞ্চক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করাতে থাকো।

মহাপঞ্চক। জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান

পঞ্চক কোথায়?

জয়োত্তম। শুনলুম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যূনকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্চক। পাষণ্ড। আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারিগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এস।

২

পাহাড় মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোনখানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া যূনকদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে। তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস্।

প্রথম যূনক। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে।

দ্বিতীয় যূনক। আয় ভাই ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে ছুঁস নে।

তৃতীয় যূনক। ওই রে। ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যূনককে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম যূনক। সত্যি নাকি। তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় যূনক। আচ্ছা এলে খবর দিয়ো—একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো যূনকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে—তাকে নিয়েই—

তৃতীয় যূনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়। আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম যূনক। সেইজন্যেই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় যূনক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক—তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী একটা ফল পাবে—তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যূনক। কিন্তু যূনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম যূনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে—কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম যূনক। চাষ করি বই কী, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে॥

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস ?

প্রথম যূনক। করি বই কি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি। খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি ?

তৃতীয় যূনক। কেন করব না। এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে!

প্রথম যূনক। কেন।

পঞ্চক। কেন কী রে ? ওটা যে নিষেধ।

প্রথম যূনক। কেন নিষেধ ?

পঞ্চক। শোনো একবার। নিষেধ, তার আবার কেন। সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যূনক। কেন ? ওটা কি তোমরা খাও না ?

পঞ্চক। খাই বই কি, খুব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় যূনক। কেন ?

পঞ্চক। ফের কেন। তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বুঝি ?

দ্বিতীয় যূনক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন ?

পঞ্চক। আবার কেন ? তোরা যে ওই এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় যূনক। আর, খেঁসারির ডাল ?

পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল ; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল ; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কী করতিস বল দেখি!

প্রথম যূনক। আমাদের কথা বল কেন। উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তাহলে তাকে আরও একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস—তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস ?

প্রথম যূনক। লোহার কাজ করি বই কি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম রাম। আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম যূনক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে ?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম যূনক। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কী—এই বুঝে নে না।

দ্বিতীয় যূনক। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি ?

দ্বিতীয় যূনক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

পঞ্চক। এই মনে কর যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র—তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় যূনক। ওর মানে কী ?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস ?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মরীচী ?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী ?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয় ?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী।

তৃতীয় যূনক। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস ?

তৃতীয় যূনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তাহলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

যূনকগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে—আমার সর্বনাশ করলে। আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্‌দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব—কিন্তু খেঁসারির ডাল—না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস না পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

আর একদল যূনকের প্রবেশ

প্রথম যূনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় যূনক। এখন রাখো তোমার পুঁথি রাখো—দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম যূনক। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী রে।

দ্বিতীয় যূনক। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী চাই রে।

তৃতীয় যূনক। কিছু চাই নে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে।

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরও জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম যূনক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

পঞ্চক। ও ভাই তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম যূনক। নিয়ে যাও না। সে তো ভালোই হয়। তাহলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর। গুরু। কী বিপদ। ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো ?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যেদিকে হ'ক একদিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন ; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

একদল যূনকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন ?

প্রথম যূনক। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে ?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করেছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যূনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যূনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যূনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম যূনক। কোথায়?

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় যূনক। এখনই?

দাদাঠাকুর। হাঁ এখনই।

সকলে। ওরে চল্ রে চল্।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধূলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যূনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?

প্রথম যূনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে। [প্রস্থান

৩

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে। বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্যে ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে তোরা সকালবেলায় করিস কী বল তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ। বলিস কী। এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে। তাহলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল। তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি—তোরা আমাকেও হাসাবি—শুনেও মন খুশি হয়। কিছু ভাবিস নে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে—গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।

ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ওই গান শিখিয়ে দে!

আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব—সে কী হয়।

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ওই পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে-যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে—আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনও শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের? আজ তো গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন। আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন? সে কী রকম হল?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল তো?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল। বল বল শুনি, ঠিক বলছিস তো রে?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক। তোমাকে লড়তে কে ডাকছে?

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী? গুরু? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও—আমরা তফাতে সরে যাই।

আর একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়—সে এ পাড়ায় আসবে কেন? এ যে আমাদের গোঁসাই।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই। এমন সাজ তার আর কথনো দেখি নি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

পঞ্চক। এ কী। এ যে দাদাঠাকুর। গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর। প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ওই তো আমাদের গোঁসাই পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ।

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি—আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব যায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ।—কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না?

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ওই অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তাহলে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে। [প্রস্থান

৪

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে। পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের

মাবাপ ভাইবোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনও জুটিয়ে আনতে পারলে না—দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ওই যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কত দূর?

উপাধ্যায়। কত দূর কী? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনও শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী? দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। ওই দেখছ না আলো।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো। এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

বিশ্বম্ভর। আমি তো তখনই বলেছিলুম, এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কী?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হ'ক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শুনছ—ওই শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চারদিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তাহলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পংক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আঃ আজ চারদিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠছে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি। [বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায় এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব?

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না—আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী—এরা যূনক।

সকলে। যূনক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ওই ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এস আমরা

এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম যূনক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যূনক। এ পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যূনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় যূনক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছোয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের?

সকলে। কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত! এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ওই আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ওই বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এস না।

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু।

দাদাঠাকুর। কী বাবা।

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা

দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব ?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজাজানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

যূনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হ'ক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এস দুঃসহ, এস নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এস নির্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হ'ক লয়।
তোমারি হউক জয়।

অরূপ রতন

ভূমিকা

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

মাঘ ১৩২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবনা

গান

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো ॥
দেখবে ব'লে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥
আমায় তোরা ডাকিস না রে,
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব
অকূল সুধা-সাগর তলে গো ॥

অরূপ রতন

১

প্রাসাদ-কুঞ্জ

সুরঙ্গমা। প্রভু একটা কথা আছে।

নেপথ্যে। কী বলো।

সুরঙ্গমা। রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবে না?

নেপথ্যে। সে কি আমাকে চেনে?

সুরঙ্গমা। না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথ্যে। অনেক বাধা আছে।

সুরঙ্গমা। তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

নেপথ্যে। বহু দুঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সুরঙ্গমা। সেই দুঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো।

নেপথ্যে। আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।

সুরঙ্গমা। এই সুযোগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নিচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এস তাকে।

নেপথ্যে। সুদর্শনাকে ব'লো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

সুরঙ্গমা। বাঁশি বাজবে না, আলো জ্বলবে না, সমারোহ হবে না?

নেপথ্যে। না।

সুরঙ্গমা। বরণডালায় সে কি ফুলের মালা তোমাকে দেবে না?

নেপথ্যে। সে ফুল এখনও ফোটে নি।

সুরঙ্গমা। সে-ই ভালো মহারাজ। অন্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হলে আপনিই আসে আলোয়।

বাহির হতে আহ্বান। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। ওই আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশির-ধোওয়া সকালবেলার স্পর্শ। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

সুরঙ্গমা। সুর ছিটিয়েছি।

সুদর্শনা। আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সুরঙ্গমা, আমি শুনি।

সুরঙ্গমা। মুখের কথায় বলে উঠতে পারি নে।

সুদর্শনা। বলো, তিনি কি খুব সুন্দর ?

সুরঙ্গমা। সুন্দর ? একদিন সুন্দরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল যেদিন, বুক ফেটে গেল, সেইদিন বুঝলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ংকর ব'লে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ংকর ব'লে আনন্দ করি—তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি—তুমি আনন্দ।

গান

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাই নি তো আনন্দ ॥
খেলা ঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিত ভেঙে যেই আসলে ঘরে
ঘুচল আমার বন্ধ,
সুখের খেলা আর রোচে না
পেয়েছি আনন্দ ॥
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার,
নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার,
উগ্র ব্যথায় নূতন ক'রে
বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব-কিছু মোর নিলে এসে,
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব,
দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ ॥

সুদর্শনা। প্রথমটা তুমি তাঁকে চিনতে পার নি ?

সুরঙ্গমা। না।

সুদর্শনা। কিন্তু দেখো, তাঁকে চিনতে আমার একটুও দেরি হবে না। আমার কাছে তিনি সুন্দর হয়ে দেখা দেবেন।

সুরঙ্গমা। তার আগে একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। নেব, আমার কিছুতে দ্বিধা নেই।

সুরঙ্গমা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

সুদর্শনা। চিরদিন ?

সুরঙ্গমা। সে-কথা বলতে পারি নে।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আমি সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

সুরঙ্গমা। জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

সুদর্শনা। আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে-কথা কাউকে জানাতে পারব না ?

সুরঙ্গমা। জানাতে পার কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।

সুদর্শনা। এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে না, সে কি হয় ?

সুরঙ্গমা। লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবে না যে।

সুদর্শনা। পারবই, নিশ্চয় পারব।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা চেষ্টা দেখো।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন—এ তিনি এড়াতে পারবেন না।

সুরঙ্গমা। সে-কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ো, তাহলেই সব সহজ হবে।

সুদর্শনা। ও-কথা কেন বলছ ? আমি তো সেইজন্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আর কিন্তু বিলম্ব ক'রো না।

সুরঙ্গমা। তাঁর দিকে সমস্তই প্রস্তুত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হই।

সুদর্শনা। কোথায় যাচ্ছ ?

সুরঙ্গমা। বসন্ত-উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

সুদর্শনা। কী রকমের আয়োজনটা হওয়া চাই ?

সুরঙ্গমা। মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমের বনেও মুকুল আপনি ধরে। আমাদের মানুষের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হতে চায় না। কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চলবে না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

সুদর্শনা। আমি সেদিন কী দেব সুরঙ্গমা ?

সুরঙ্গমা। সে-কথা তুমিই বলতে পার।

সুদর্শনা। আমি নিজ হাতে মালা গেঁথে সুন্দরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

সুরঙ্গমা। সে-ই ভালো।

সুদর্শনা। তাঁকে দেখব কী করে ?

সুরঙ্গমা। সে.তিনিই জানেন।

সুদর্শনা। আমাকে কোথায় যেতে হবে ?

সুরঙ্গমা। কোথাও না, এইখানেই।

সুদর্শনা। কী বল সুরঙ্গমা, অন্ধকারের সভা এইখানেই ? যেখানে চিরদিন আছি এইখানেই ? সাজতে হবে না ?

সুরঙ্গমা। নাই বা সাজলে। একদিন তিনিই সাজাবেন যে-সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে
আঁচল রঙিন হবে।
তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটায় পূজার কুসুমগুলি,
সেই ধূলি হায় কখন আমায়
আপন করি' লবে॥
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধুলার কাঙাল যাত্রিদলে
চলে যারা, আপন ব'লে
চিনবে আমায় সবে॥

সুদর্শনা। আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না।

সুরঙ্গমা। ক'রো না দেরি—তাঁকে ডাকো, এইখানেই দয়া করবেন।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমি তো মনে করি যে ডাকছি, সাড়া পাই নে। বোধ হয় ডাকতে জানি নে। তুমি আমার হয়ে ডাকো না—তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

সুরঙ্গমার গান

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও
এস দুই বাহু বাড়ায়ে॥
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি
সেজেছি তো শুচি দুকূলে,
বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল
গেঁথেছি তো মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে॥

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

সুদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি কি এর মধ্যে আছ?

নেপথ্যে। এই তো আমি আছি।

সুদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই?

নেপথ্যে। চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে—অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

সুদর্শনা। ভয়ে যে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে।

নেপথ্যে। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না।

সুদর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। হাঁ পাচ্ছি।

সুদর্শনা। কী রকম দেখছ ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোকলোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহুপুরাতনের নূতন রূপ।

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি ক'রে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্মজন্মান্তর থেকে শুনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন ক'রে ? না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব—সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপথ্যে। আচ্ছা দেখো। তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। কী প্রভু।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসব তো এল।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে ?

নেপথ্যে। আজ তোমার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। পুষ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

নেপথ্যে। সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন ?

নেপথ্যে। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। চোখে ধাঁধা লাগবে না ?

নেপথ্যে। সুদর্শনার কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস তো পথে ঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কৌতূহলের অতীত।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ॥
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি,
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি,
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ॥
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি' ফিরিছ বুঝি পাগল প্রায়,
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ॥

[উভয়ের প্রস্থান

২

উৎসব-ক্ষেত্র

বিদেশী পথিকদল ও প্রহরীর প্রবেশ

বিরাজদত্ত। ওগো মশায়।

প্রহরী। কেন গো ?

ভদ্রসেন। রাস্তা কোথায় ? এখানে রাজাও দেখি নে রাস্তাও দেখি নে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা ব'লে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা ?

মাধব। ওই যে শুনেছি আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে ?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। সামনে চলে যাও।

বিরাজদত্ত। শোনো একবার কথা শোনো। বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী ?

মাধব। তা ভাই রাগ করিস কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, তোমার ওই একটা বড়ো দোষ।

মাধব। কী দোষ দেখলে?

বিরাজদত্ত। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল? বলো তো ভাই ভদ্রসেন, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

ভদ্রসেন। ভাই বিরাজদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ মাধবের ওই এক রকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তাহলে ম'লে ওকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

বিরাজদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই—রাম রাম।

ভদ্রসেন। সেও তো ওই মাধবের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান—কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উন-পঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়—সে এক বিষম মুশকিল—শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!

বিরাজদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে এ কি কম কথা।

ভদ্রসেন। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু মাধব বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো। [সকলের প্রস্থান

সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

মেয়ের দলের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উৎসবটা হচ্ছে কোথায় ?

ঠাকুরদা। যেদিকে চাইবে সেইদিকেই।

প্রথমা। একেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব !

ঠাকুরদা। আমরা তো তাই বলি।

দ্বিতীয়া। আমাদের দেশের সব চেয়ে খুদে সামন্তরাজও এর চেয়ে ঘটা করে পথে বেরোয়।

ঠাকুরদা। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বঞ্চিত।

তৃতীয়া। আর তোমরা যে কোন্ না-দেখা রাজার কথা বলছ ?

ঠাকুরদা। তাঁকে না চিনতে পারলে আমরাই বঞ্চিত।

প্রথমা। চেনবার উপায়টা কী করেছ ?

ঠাকুরদা। তাঁর সঙ্গে সুর মেলাচ্ছি। এই যে দখিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান সুরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।

দ্বিতীয়া। তোমাদের কর্তারা ঢাকঢোলের বায়না দেন নি বুঝি ? তোমাদের উপরেই সব বরাত ?

ঠাকুরদা। তা নয় তো কী। ভাড়া করে সমারোহ ? তোমরা আমরা আছি কী করতে ? ওরে তোরা ধর না ভাই গান।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।
নব শ্যামল শোভন রথে
এস বকুল-বিছানো পথে,
এস বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।

এস ঘনপল্লবপুঞ্জে
এস হে, এস হে, এস হে ।
এস বনমল্লিকাকুঞ্জে
এস হে, এস হে, এস হে ।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এস পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস ॥

[মেয়েদের প্রস্থান

পুব দুয়ারটা হল । এবার চলো পশ্চিম দুয়ারটার দিকে ।

দেশী পথিকদলের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য । ঠাকুরদা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ যে ?

ঠাকুরদা । নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছি ।

জনার্দন । সেটা কি তোমাকে শোভা পায় ?

ঠাকুরদা । ওরে পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায় ।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ।

কৌণ্ডিল্য । ডাক দিয়েছ সে তো দেখতে পাচ্ছি, পাড়া অস্থির করে তুলেছ । কিন্তু এর দরকার ছিল কি ।

ঠাকুরদা । আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি—বুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল ।

গান

তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে ॥

কৌণ্ডিল্য। তা তুমি নতুন হয়েই রইলে সে-কথা সত্যি, বুড়ো হবার সময় পেলে না।

ঠাকুরদা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাই নে।

গান

ওগো আমার নিত্য নূতন দাঁড়াও হেসে
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাল,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে॥

কৌণ্ডিল্য। রাখো দাদা, তোমার গান রাখো। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বলো দেখি।

কৌণ্ডিল্য। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে সবই দেখেছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন—কাউকে জবাব দিতে পারি নে। এখানে ওইটে বড়ো একটা ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের এই দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে॥
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে।

নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে ॥
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ
কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে।
আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার
বিষম আবর্তে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে ?

কুম্ভ। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে, সেইটে অসহ্য হয়।

জনার্দন। এই দেখো না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবার নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে ; প্রজার মধ্যে যে-রাজাটুকু মিশিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাকে ছাড়িয়ে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন। [সকলের প্রস্থান

বিদেশীদলের পুনঃ প্রবেশ

বিরাজদত্ত। দেখো ভাই ভদ্রসেন, আসল কথাটা হচ্ছে, এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

ভদ্রসেন। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হীহী করে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খুঁজেও মেলে না! কিছু না হ'ক, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহলেও বুঝি রাজার মতো রাজা আছে বটে।

মাধব। কিন্তু এ-রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

বিরাজদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাকবে তাহলে রাজা থাকবার দরকার কী?

মাধব। এই দেখো না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে—রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে—সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায়, সেইটে বলো।

মাধব। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

ভদ্রসেন। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা! তুমি বিরাজদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও না হে—হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি, দেখ নি?

বিরাজদত্ত। রেখে দাও ভাই ভদ্রসেন, ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে। [সকলের প্রস্থান

বাউলের প্রবেশ

গান

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়,
তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে॥
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, হল না,

আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ্‌ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্‌ রে আমার দুই নয়ানে ॥ [প্রস্থান

একদল পদাতিক ও দেশী পথিকের প্রবেশ

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।

কৌণ্ডিল্য। ইস, তাই তো। মস্ত লোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর না কি?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

জনার্দন। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

কুম্ভ। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের এই অবাক দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

জনার্দন। সত্যি না কি ভাই?

দ্বিতীয় পদাতিক। ওই দেখো না নিশেন উড়ছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে, দেখছ না?

কুম্ভ। ওরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি—একেবারে টকটক করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

জনার্দন। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ওই কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

কৌণ্ডিল্য। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়শ্বশুর—অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিন-শ পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘুরে বেড়াল—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই তো বাধত না।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ ক'রো না। আমি নাকে খত দিচ্ছি—যতদুর সরতে বল তত দূরই সরে দাঁড়াব।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি। [পদাতিকদের প্রস্থান

জনার্দন। কুম্ভ, তোমার ওই মুখের দোষেই তুমি মরবে!

কুম্ভ। না ভাই জনার্দন, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি—অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি—আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

জনার্দন। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হ'ক মিথ্যে হ'ক, মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব। অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা না একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় করে যাই—সত্যি হলে লাভ, মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না—দামি জিনিস—বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

কৌণ্ডিল্য। ওই যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতন রাজা বটে। কী চেহারা। যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে।

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো—কী জানি ভাই হতে পারে।

কৌণ্ডিল্য। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয়, পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

জনার্দন। দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি। [সকলের প্রস্থান

বিদেশী পথিকদলের প্রবেশ

মাধব। ওরে রাজা রে রাজা। দেখবি আয়।

বিরাজদত্ত। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারও কথায় কান দিই নি —আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

ভদ্রসেন। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনও কাক ডাকে নি—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন—ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলাম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব। [রাজবেশীর প্রস্থান

দেশী পথিকদের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

বিরাজদত্ত। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো হে, লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

মাধব। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি।

কৌণ্ডিল্য। ওহে রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না? এযে অতিভক্তি।

বিরাজদত্ত। না হে না—রাজাদের যদি মগজই থাকবে তাহলে মুকুট থাকবার দরকার কী। ওই তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে। [সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়।

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কী।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না!

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা—একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর—আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা তোদের চোখেই পড়ত না।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গো। লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বই কি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তা-ই পায়।

ঠাকুরদা। সে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে। [সকলের প্রস্থান

রাজা বিজয়বর্মা, বিক্রমবাহু ও বসুসেনের প্রবেশ

বসুসেন। এই উৎসবের রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারও কোনো বাধা নেই?

বিজয়। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

বিজয়। এই সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

বিক্রম। কিন্তু কান্তিকরাজকন্যা সুদর্শনা তো দৃষ্টিগোচর।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

বিক্রম। একটা ফন্দি দেখাই যাক না।

বসুসেন। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আসছে? সং না কি? রাজা সেজেছে।

বিজয়। এ তামাশা এখানকার রাজা সইতে পারে কিন্তু আমরা সইব না তো।

বসুসেন। কোথাকার গ্রাম্যরাজা হতেও পারে।

পদাতিকগণের প্রবেশ

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[পদাতিকগণের প্রস্থান

বিজয়। এ কী কথা। এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

বসুসেন। তাই তো। তা হলে এঁকেই দেখে ফিরতে হবে! অন্য দর্শনীয়টা?

বিক্রম। শোন কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

বসুসেন। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশী সুবর্ণের প্রবেশ

সুবর্ণ। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

বিক্রম। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সুবর্ণ। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এই জন্যই একবার দেখা দিতে এলুম।

বিক্রম। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

সুবর্ণ। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

বিক্রম। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

সুবর্ণ। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

বিক্রম। আছে বই কি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

সুবর্ণ। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও—(রাজগণের প্রতি) এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

বিক্রম। অসংকোচেই জানাব—তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ হয় না।

সুবর্ণ। না, সে আশঙ্কা ক'রো না।

বিক্রম। এস তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

সুবর্ণ। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজশিবিরে কিছু মুক্তহস্তেই বিতরণ করেছে।

বিক্রম। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে সেই জন্যেই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

সুবর্ণ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত। সেনাপতি।

সুবর্ণ। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে অনুমতি দেন তাহলে বিলম্ব করব না।

বিক্রম। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

সুবর্ণ। আছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না, তখন সবাই সন্দেহ করছিল- লোক যত বেড়ে গেল, সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

বিক্রম। আর কিছু চাই নে, রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখতে চাই—সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমতো চলতে হবে। আমার পরামর্শ শোনো, ভুল ক'রো না।

সুবর্ণ। ভুল হবে না।

বিক্রম। করভোত্থানের মধ্যেই রাজকুমারী সুদর্শনার প্রাসাদ।

সুবর্ণ। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। সেই উদ্যানে আগুন লাগাবে। তারপর অগ্নিদাহের গোলমালে কাজ সিদ্ধ করব।

সুবর্ণ। অন্যথা হবে না।

বিক্রম। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিথ্যা সাবধান হচ্ছি, এদেশে রাজা নেই।

সুবর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দূর করতে বেরিয়েছি, সাধারণের জন্যে সত্য হ'ক মিথ্যা হ'ক, একটা রাজা খাড়া করা চাই ; নইলে অনিষ্ট ঘটে। একটা কথা বুঝতে পারছি নে মহারাজ।

বিক্রম। আমার অনেক কথাই তুমি বুঝতে পারবে না। তবু বলো শুনি।

সুবর্ণ। রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন না।

বিক্রম। সে তো সকলেই করে থাকে। আমি তো সকলের দলে নই। আগুন করবে আমার ঘটকালি, আমি বিপদ ঘটিয়ে বিপদের পারে যাব।

সুবর্ণ। আপনি তো পারে যাবেন মহারাজ, আমি সামান্য লোক, পার পর্যন্ত না পৌঁছোতেও পারি।

বিক্রম। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। সামান্য লোক, কাজে লাগবে এই যথেষ্ট, তার পরে থাকবে কি না থাকবে সেটা ভাববার কথাই নয়।—চলো আর বিলম্ব ক'রো না।

বিজয়। দেখো দেখো, সেই লোকটা আবার একদল লোক নিয়ে আসছে।

বসুসেন। ও যেন উৎসবের খেয়া পার করছে ; নতুন নতুন দলকে দ্বারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে।

সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

বিজয়। কী হে, তুমি যে কখন কোথা দিয়ে ঘুরে আসছ, তার ঠিকানা পাবার জো নেই।

ঠাকুরদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার জো কী—শিঙ্গা যে বেজে উঠছে।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

[প্রস্থান

বসুসেন। লোকটার মধ্যে কিছু কৌতুক আছে।

বিক্রম। কিন্তু এ-সব লোকের কৌতুকে যোগ দেওয়া কিছু নয়—প্রশ্রয় দেওয়া হয়—চলো সরে যাই।

[রাজাদের প্রস্থান

৩

কুঞ্জ-বাতায়ন

সুরঙ্গমার গান

বাহিরে ভুল হানবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ?
বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি ?
রৌদ্রদাহ হলে সারা
নামবে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি ?
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মানবে কি ?

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার কখনোই ভুল হতে পারে না। আমি হব রানী। ওই তো আমার রাজাই বটে।

সুরঙ্গমা। কাকে তুমি রাজা বলছ ?

সুদর্শনা। ওই যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে।

সুরঙ্গমা। ওই যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা ?

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আসছে।

সুরঙ্গমা। ও তোমার রাজা নয়। আমি যে ওকে চিনি।

সুদর্শনা। ও কে ?

সুরঙ্গমা। ও সুবর্ণ। ও জুয়ো খেলে বেড়ায়।

সুদর্শনা। মিথ্যে কথা বলিস নে। সবাই ওকে রাজা বলছে। তুই বুঝি সকলের চেয়ে বেশি জানিস।

সুরঙ্গমা। ও যে সবাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছে, সেইজন্যে সবাই ওর বশ হয়েছে। যখন ভুল ভাঙবে তখন হায় হায় করে মরবে।

সুদর্শনা। তোর বড়ো অহংকার হয়েছে। তুই আমার চেয়ে চিনিস?

সুরঙ্গমা। যদি আমার অহংকার থাকত, তাহলে আমি চিনতে পারতুম না।

সুদর্শনা। আমি ওকেই মালা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুরঙ্গমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

সুদর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত? তোর তো আস্পর্ধা কম নয়। যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখব না। [সুরঙ্গমার প্রস্থান

আমার মন আজ এমনই চঞ্চল হয়েছে। এমন তো কোনোদিন হয় না। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা। আমার মালা কি ভুল পথেই গেছে?

সুরঙ্গমা। হাঁ।

সুদর্শনা। আবার সেই একই কথা? আচ্ছা বেশ, ভুল করেছি, বেশ করেছি। তিনি কেন নিজে দেখা দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দেন না? কিন্তু তোর কথা মানব না। যা আমার কাছ থেকে—মিছিমিছি আমার মনে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিস নে। [সুরঙ্গমার প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলই কটাক্ষপাত করছ। স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ ভরে গেল যে। প্রতিহারী।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। কী রাজকুমারী।

সুদর্শনা। ওই যে আম্রবনবীথিকায় উৎসববালকেরা গান গেয়ে যাচ্ছে, ডাক ডাক ওদের ডেকে নিয়ে আয়। একটু গান শুনি। [প্রতিহারীর প্রস্থান

বালকগণের প্রবেশ

এস এস সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহমন গান গাইছে, কণ্ঠে আসছে না। আমার হয়ে তোমরা গাও।

বালকগণের গান

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে॥
গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে,
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুনদিনের সকালে॥

সুদর্শনা। হয়েছে, হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে—আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। [প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও দেশী পথিকদের প্রবেশ

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের ?

কৌণ্ডিল্য। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী ? রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি ?

জনার্দন। ওরে বাস রে! কাছে ঘেঁযে কে! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায় বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পারলি নে ? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

কুম্ভ। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের

পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড—ওদের তফাতে রেখেই চলতে হবে।

বাউলের প্রবেশ ও গান

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল॥
রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হল কেমন দেখ রে যেমন
রাঙা কমল টলমল!

ঠাকুরদা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তাহলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়।

[সকলের প্রস্থান

স্মুবর্ণ ও রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

স্মুবর্ণ। এ কী কাণ্ড করেছ রাজা বিক্রমবাহু ?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারিদিকে ধরে উঠবে সে আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

স্মুবর্ণ। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

বিক্রম। তুমি তো এদেশেরই লোক—পথ নিশ্চয় জান।

স্মুবর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

বিক্রম। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

স্মুবর্ণ। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা ?

স্মুবর্ণ। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড় করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

বিক্রম। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী ? ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

স্মুবর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

বিক্রম। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো, রক্ষা করো। চারিদিকে আগুন।

বিক্রম। মূঢ় ওঠো, আর দেরি না।

স্মুদর্শনার প্রবেশ

স্মুদর্শনা। রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

স্মুবর্ণ। কোথায় রাজা ? আমি রাজা নই।

স্মুদর্শনা। তুমি রাজা নও ?

স্মুবর্ণ। আমি ভণ্ড˘ আমি পাষণ্ড! (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হ'ক।

[রাজা বিক্রমের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব।

নেপথ্যে। ওদিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারিদিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ ক'রো না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এস।

সুদর্শনা। কোথায় যাব?

সুরঙ্গমা। ওই আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।

সুদর্শনা। সে কী কথা?

সুরঙ্গমা। আগুনকে বিশ্বাস করো, যাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভালো।

সুদর্শনা। রাজা কোথায়?

সুরঙ্গমা। রাজাই আছেন ওই আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।

সুদর্শনা। সত্যি বলছিস?

সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।

[উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আগুনে হল আগুনময়।
জয় আগুনের জয়।
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে
এইবেলা সব যাক না পুড়ে',
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হ'ক রে পরিচয়॥
আগুন এবার চলল রে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর লুকিয়ে কোথায় প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক না ঘুচে,
লজ্জা তোমার যাক রে মুছে,
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক ভয়॥

[গানের দলের প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুরঙ্গমা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

সুরঙ্গমা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

সুরঙ্গমা। হতাশ হ'য়ো না। তোমার সাধ তো মিটেছে, আগুনের মধ্যেই তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনও কাঁপছে।

সুরঙ্গমা। কেমন দেখলে?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো—ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো। [প্রস্থান

সুরঙ্গমা। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই এক দিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব॥
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাব॥
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব॥

সুদর্শনার পুনঃ প্রবেশ

সুদর্শনা। কিন্তু কেন সে আমাকে জোর করে পথ আটকায় না? কেশের গুচ্ছ ধরে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না? আমাকে কিছু সে বলছে না, সেই জন্যেই আরও অসহ্য বোধ হচ্ছে।

সুরঙ্গমা। রাজা কিছু বলছে না, কে তোমাকে বললে?

সুদর্শনা। অমন করে নয়, চীৎকার করে বজ্রগর্জনে—আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। রাজা, আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

সুরঙ্গমা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন?

সুদর্শনা। যেতে দেবেন না? আমি যাবই।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা। আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে তিনি ধরে রাখতে পারতেন কিন্তু রাখলেন না। আমাকে বাঁধলেন না—আমি চললুম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক।

সুরঙ্গমা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে—এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না। [দ্রুত প্রস্থান

৪

রাজপথ

নাগরিকদলের প্রবেশ

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকন্যা সুদর্শনা।

দ্বিতীয়। সকল সর্বনাশের মূলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই তো আছে,—কী আছে বলো না হে বটুকেশ্বর। তুমি বামুনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে আছে বই কি। বেদে যা খুঁজবে তাই পাওয়া যাবে—অষ্টাবক্র বলেছেন, নারীণাঞ্চনখিনাঞ্চশৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং—অর্থাৎ কিনা—

দ্বিতীয়। আরে বুঝেছি বুঝেছি—আমি থাকি তর্করত্নপাড়ায়,—অনুস্বার-বিসর্গের একটা কৌটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই।

প্রথম। আমাদের এ হল যেন কলির রামায়ণ। কোথা থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল দশমুণ্ড রাবণ, আচমকা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল।

তৃতীয়। যুদ্ধের হাওয়া তো চলছে, এদিকে রাজকন্যা যে কোথায় অদর্শন হয়েছেন কেউ খোঁজ পায় না। মহারাজ তো বন্দী, এদিকে কে যে লড়াই চালাচ্ছে তারও কোনো ঠিকানা নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন আমাদের উপায় কী? আমাদের ছিল এক রাজা এখন সাতটা হতে চলল, বেদে পুরাণে কোথাও তো এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বই কি—পঞ্চপাণ্ডবের কথা ভেবে দেখো।

তৃতীয়। আরে সে হল পঞ্চপতি—

প্রথম। একই কথা। তারা হল পতি, এরা হল নৃপতি। কোনোটারই বাড়াবাড়ি সুবিধে নয়।

তৃতীয়। আমাদের পাঁচকড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠল হে—রামায়ণ মহাভারত ছাড়া কথাই কয় না।

দ্বিতীয়। তোরা তো রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এদিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কী ঘটছে খবর কেউ রাখিস নে।

প্রথম। ওরে বাবা—সেখানে যাবে কে? খবর যখন আসবে তখন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে—জানতে বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে?

প্রথম। তা তো সত্যি। তুমি যাও না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চলো না ধনঞ্জয়ের ওখানে। সে সব খবর জানে।

দ্বিতীয়। না জানলেও বানিয়ে দিতে জানে। [সকলের প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সৌভাগ্যবতী বলত, আমি যেখানে যেতুম সেখানেই ঐশ্বর্যের আলো জ্বলে উঠত। আজ আমি এ কী অকল্যাণ সঙ্গে করে এনেছি। তাই আমি ঘর ছেড়ে পথে এলুম।

সুরঙ্গমা। মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে পৌঁছোবে ততক্ষণ তো পথই বন্ধু।

সুদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, তার কথা আর বলিস নে।

সুরঙ্গমা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

সুদর্শনা। কখনোই না।

সুরঙ্গমা। কার উপরে রাগ করছ মা!

সুদর্শনা। আমি তার নাম করতেও চাই নে।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, নাম ক'রো না, তাঁর সবুর সইবে।

সুদর্শনা। আমি পথে বেরোলুম, সঙ্গে সে এল না?

সুরঙ্গমা। সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি।

সুদর্শনা। একবার বারণও করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার?

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর। তাঁকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই এমন দিনরাত ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এমনি পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার দুঃখ আমার থাক, সেই কঠিনেরই জয় হ'ক। [সুদর্শনার প্রস্থান

সুরঙ্গমার গান

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিষ্ঠুর।
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান মাঝে এমন কঠিন সুর॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি' দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজা বিক্রম ও সুবর্ণের প্রবেশ

বিক্রম। কে যে বললে সুদর্শনা এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। যুদ্ধে তার বাপকে বন্দী করা মিথ্যে হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

সুবর্ণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তাহলে তো বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্ষান্ত হ'ন।

বিক্রম। কেন বলো তো?

সুবর্ণ। দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

সুবর্ণ। কান্তিকরাজকে ভয় না করলেও চলে কিন্তু—

বিক্রম। ওই কিন্তুটাকে ভয় করতে শুরু করলে জগতে টেকা দায় হয়।

সুবর্ণ। মহারাজ, ওই কিন্তুটাকে না হয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ও যে বাইরে থেকেই হঠাৎ উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। খুব করেই আটঘাট বেঁধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অগ্নিমূর্তি ধরে ঢুকে পড়ল একটা কিন্তু।

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। অন্তঃপুর ঘুরে এলুম কোথাও তো তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাত্রা শুভ, সেটা বুঝি মিথ্যা হল।

বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াতেই হয়তো শুভ, কে বলতে পারে?

বিক্রম। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ।

বসুসেন। এ কী। ভূমিকম্প না কি।

বিক্রম। ভূমিই কাঁপছে বটে, কিন্তু তাই বলে পা কাঁপতে দেওয়া হবে না।

বসুসেন। এটা দুর্লক্ষণ।

বিক্রম। কোনো লক্ষণই দুর্লক্ষণ নয়, যদি সঙ্গে ভয় না থাকে।

বসুসেন। দৃষ্ট কিছুকে ভয় করি নে কিন্তু অদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে লড়াই চলে না।

বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে খুবই লড়াই চলে।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ। সৈন্যরা প্রায় সকলে পালিয়েছে।

বিক্রম। কেন?

দূত। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকে গেল—কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের ফিরিয়ে আনছি। যুদ্ধের পর হারা চলে কিন্তু যুদ্ধের আগে হার মানতে পারব না। [বিক্রমবাহু ও দূতের প্রস্থান

বিজয়। যার জন্য যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারাও পালায়, এখন আমাদেরই কি পালানো দোষের?

বসুসেন। মনে ধাঁধা লেগেছে, কিন্তু স্থির করতে পারছি নে। [উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ,
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার
উদ্দাম তরঙ্গ ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ ॥
সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝরে
তারা ধুলা হল, ধুলা দিল ভরে।
প্রখর তাপে জরো-জরো
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হ'ক ভঙ্গ ॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। এ কী হল? ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় এসে পড়ছি। ওই যে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার চারিদিকেই যুদ্ধ চলছে। ওই যে আকাশ ধুলোয় অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তকাল ঘুরে বেড়াব? এর থেকে বেরোই কেমন করে?

সুরঙ্গমা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্ছ, ফিরতে চাচ্ছ না, সেই জন্য কোথাও পৌঁছোতে পাচ্ছ না।

সুদর্শনা। কোথায় ফেরবার কথা তুই বলছিস?

সুরঙ্গমা। আমাদের রাজার কাছে। আমি বলে রাখছি, যে-পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে-পথের অন্ত পাবে না কোথাও।

সৈনিকের প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি ?

সৈনিক। আমি নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। শীঘ্র বলো সেখানকার খবর কী।

সৈনিক। মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। কে বন্দী হয়েছেন ?

সৈনিক। আপনার পিতা।

সুদর্শনা। আমার পিতা! কার বন্দী হয়েছেন ?

সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহুর। [সৈনিকের প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা, রাজা, দুঃখ তো আমি সইতে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলেম, কিন্তু আমার দুঃখ চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কেন ? যে আগুন আমার বাগানে লেগেছিল সেই আগুন কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি ? আমার পিতা তোমার কাছে কী দোষ করেছেন ?

সুরঙ্গমা। আমরা যে কেউ একলা নই। ভালোমন্দ সবাইকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেইজন্যেই তো ভয়, একলার জন্যে ভয় কিসের ?

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। কী রাজকুমারী।

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন ?

সুরঙ্গমা। আমাকে কেন বলছ ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারও কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না।

সুদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি তুমি আসতে, তাহলে তোমার যশ বাড়ত বই কমত না। [প্রস্থানোদ্যম

সুরঙ্গমা। কোথায় যাচ্ছ ?

সুদর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদূর নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে। [উভয়ের প্রস্থান

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। যুদ্ধের আরম্ভেই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈন্য কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে ?

বিজয়। বিক্রমবাহুকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না।

বসুসেন। সে আত্মবিনাশের নেশায় উন্মত্ত।

বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বললে, রণক্ষেত্রে সে যেমনি গিয়ে পৌঁছেছে অমনি তার বুকে লেগেছে ঘা। এতক্ষণে তার কী হল কিছুই বলা যায় না।

বসুসেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত ঠেকছে যে, আমরা আয়োজন করলুম কতদিন থেকে, সমারোহ হল ঢের, কিন্তু শেষ হবার বেলায় এক পলকেই কী যে হয়ে গেল ভালো বুঝতে পারা গেল না।

বিজয়। রাত্রির সমস্ত তারা যেমন প্রভাতসূর্যের এক কটাক্ষেই নিবে যায়।

বসুসেন। এখন চলো।

বিজয়। কোথায়?

বসুসেন। ধরা দিতে।

বিজয়। ধরা দিতে, না পালাতে?

বসুসেন। পালানোর চেয়ে ধরা দেওয়া সহজ হবে। [উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

এখনো গেল না আঁধার,
এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ-ব্রত
জীবনে হল না সাধা।
কবে যে দুঃখজ্বালা
হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে
নিশীথরাতের কাঁদা।
এখনো নিজেরি ছায়া
রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে
চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি আলো
চোখেতে লাগাল ধাঁধা॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এ লজ্জা কাটবে।

সুদর্শনা। কাটবে বই কি সুরঙ্গমা—সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমার নিচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু কই রাজা এখনও কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরও কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

সুদর্শনা। হায় কপাল, লোককে ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে!—না না, দুঃখ করব না—যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে—ভালোই হয়েছে—কিছু অন্যায় হয় নি।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী, কর কী। আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদা। ওই তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু।

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন। একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র। সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি—বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে?

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বই কি। নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। পথের ধারে আমি চুপ করে পড়ে থাকব—এক পা-ও নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ করে অনেকদিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব। [প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে। সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তাহলে এমন করে দেখাতেন কারও আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই?

সুদর্শনা যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

[উভয়ের প্রস্থান

নাগরিক দলের প্রবেশ

প্রথম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল, বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল লেগে গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়—কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহু, সে-কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। সে যে পদে পদেই হারছিল, তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল, তার ঠিক নেই।

[সকলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

প্রথম। শুনেছি বিক্রমবাহু মরে নি।

তৃতীয়। না, কিন্তু বিক্রমবাহুর বিচারটা কী রকম হল?

দ্বিতীয়। শুনেছি বিচারকর্তা স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা কিছু করেছে, সে তো ওই বিক্রমবাহুই।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম, তাহলে কি আর আস্ত রাখতুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি, বিচারকর্তাকে দেখি নে, তার বুদ্ধিটাও দেখা যায় না।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি ব'লে কিছু আছে কি! এর মধ্যে সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত, তাহলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে। [সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদা ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ

ঠাকুরদা। একী বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে।

বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হ'ক, সে যতবড়ো রাজাই হ'ক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

বিক্রম। ওই লজ্জাটুকু এখনও ছাড়তে পারি নি। রাজা বিক্রম থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ওই দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, তুমিও পথে যে।

ঠাকুরদা। আমিও সর্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়॥

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী বলো।

ঠাকুরদা। তার কাছে ধরা দিলে এক সঙ্গেই ধরাও দেওয়া হয় ছাড়াও পাওয়া যায়।

যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥ [উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহ নমস্কার॥
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহ নমস্কার॥
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহ নমস্কার।
জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা। হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান। কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা পথে পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না।

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে, তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তার বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে? বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা? না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়েছিলুম। [উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আমার অভিমানের বদলে আজ
নেব তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই
চোখের জলের পালা॥
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর
পরশ পাষাণ-গালা॥
ছিল আমার আঁধারখানি,
তারে তুমিই নিলে টানি,
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে
করল তারে আলা।

সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামি
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণডালা ॥

[প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসে ছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে—এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেইরকম। কে বললে, তিনি নেই—সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন ?

সুরঙ্গমার গান

আমার আর হবে না দেরি,
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ
আমার যাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে
মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি ॥

আমার স্বপন হল সারা
এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর
নাই কিছু আর হাতে
তোমার আশীর্বাদের মালা
নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি ॥

সুদর্শনা। ও কে ও। চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধারে পথে আরও একজন পথিক বেরিয়েছে যে।

সুরঙ্গমা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। বিক্রম রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় ক'রো না।

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব। ভয়ের দিন আমার আর নেই।

রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

বিক্রম। তুমিও চলেছ বুঝি। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় ক'রো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে বিক্রমরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

বিক্রম। কিন্তু তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তাহলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা ব'লো না—যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারও দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন প্রাসাদে ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার

সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে, এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। ওই দেখো, পূর্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল, দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ওই যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হ'ক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হ'ক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে—আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্যে রানীর বেশ নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না। সে বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নিচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ-দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হ'ক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তাঁর গায়েও ধুলো মাখা। তাঁকে বুঝি কেউ ছাড়ে, মনে করছ? যে পায় তাঁর গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে।

বিক্রম। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রং ফিরে যাবে। আর এই আমাদের রানীকে দেখো, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে, কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরও ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপন গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

সুরঙ্গমা। ওই যে সূর্য উঠল। [সকলের প্রস্থান

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হলি ওরে পান্থ
রজনী-জাগর-ক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে ;
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জা ভয় গেল ঝরি,
ঘুচিল রে অভিমান॥

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল। এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই। [প্রস্থান

গান

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি' হৃদয়মাঝে ॥
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন,
গেল কেটে আজ সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে ॥

ঋণশোধ

গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে
গেল গো গেল সরে
তোমার ঐ আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁওয়া লেগে॥
কী যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ঐ শিউলিদলে
ছড়াল কাননতলে,
সে যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে॥

পাত্রগণ

সম্রাট বিজয়াদিত্য

শেখর কবি

ঠাকুরদাদা

লক্ষেশ্বর

উপনন্দ

রাজা সোমপাল

রাজদূত

অমাত্য

বালকগণ

ভূমিকা

রাজসভা

সম্রাট বিজয়াদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি।

বিজয়াদিত্য। কী তোমার রাজনীতি?

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শুরু হতে থাকে।

বিজয়াদিত্য। রাজ্য যতই বাড়বে তাকে রক্ষা করবার দায়ও তো ততই বাড়বে—তাহলে থামবে কোথায়?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

বিজয়াদিত্য। তাহলে তোমার পরামর্শ কী?

মন্ত্রী। আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মানিকপুর আছে সেইটে জয় করে নেবার এই অবসর উপস্থিত হয়েছে।

বিজয়াদিত্য। সেই অবসর আমি দিলুম উড়িয়ে। আমার রাজনীতির কথা আমি তোমাকে বলব?

মন্ত্রী। বলুন।

বিজয়াদিত্য। রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়। রাজা হয়েছি বলেই দেখতে পেয়েছি রাজ্যটা কিছুই নয়।

মন্ত্রী। বলেন কী মহারাজ? ওর মধ্যে কোনো সত্যই কি—

বিজয়াদিত্য। ওর মধ্যে একমাত্র সত্য হচ্ছে রাজা হওয়া। আমি রাজা হতে চাই।

মন্ত্রী। সেইজন্যেই তো—

বিজয়াদিত্য। সেইজন্যেই তো আমি রাজ্যে লোভ করতে চাই নে। কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্যন্ত টেঁকেনি—যে সাম্রাজ্য যতই বড়োই হ'ক। কিন্তু একবারের মতো যে সত্যিকার রাজা হতে পেরেছে চিরকালের মতো সে বেঁচে রইল।

মন্ত্রী। কিন্তু সৈন্যদল প্রস্তুত আছে।

বিজয়াদিত্য। ভালোই হয়েছে।

মন্ত্রী। তবে কি—

বিজয়াদিত্য। তাদের লাগিয়ে দাও শারদোৎসবের কাজে।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ, শরৎকালে জয়যাত্রায় বেরোবার নিয়ম—মহারাজের পূর্বপুরুষেরা—

বিজয়াদিত্য। আমিও বেরোব ঠিক করেছি।

সেনাপতি। তাহলে আদেশ করুন কী ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

বিজয়াদিত্য। তোমাদের কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না।

সেনাপতি। বলেন কী মহারাজ?

বিজয়াদিত্য। আমি একলা যাব।

সেনাপতি। সে কী কথা?

বিজয়াদিত্য। সে তোমরা বুঝবে না। কবি কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি।

শেখর। কী মহারাজ।

বিজয়াদিত্য। আমার পিতার সিংহাসনে এক বছর মাত্র আমি বসেছি—কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। রাজাকে নবীন করবার কী উপায় আমাকে বলে দাও তো।

শেখর। সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা ফেলেন দিকি। ওই মাটির মধ্যে জীবন-যৌবনের জাদুমন্ত্র রয়েছে।

বিজয়াদিত্য। আমার সিংহাসনের খাঁচার দরজা আমি চিরদিনের মতো খুলে রাখতে চাই—যাতে মাটির সঙ্গে আমার সহজ আনাগোনা চলে।

শেখর। যাতে শিউলির মালার সঙ্গে আপনার মুক্তোর মালার অদল-বদল হয়। তাহলে এই শরৎকালে আপনার ওই রাজবেশটা একবার খোলেন—আপন বলে চিনতে কারও ভুল হবে না।

বিজয়াদিত্য। আছে আমার সন্ন্যাসীর বেশ—ধুলোর সঙ্গে তার সুর মেলে। কবি তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শেখর। না মহারাজ, আমাকে যদি সঙ্গে নেন তাহলে আপনার 'পরে মন্ত্রী আর সেনাপতির বিষম অশ্রদ্ধা হবে, আর আমার 'পরে হবে রাগ।

বিজয়াদিত্য। ঠিক বটে। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে বলো। আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মতো ঝলমল করে উঠল তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপছে পড়ছে—

গান

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়—
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়।

বিজয়াদিত্য। তুমি আমাকে ঘরে টিঁকতে দিলে না দেখছি। চললেম আমি অমৃতের ঋণ শোধ করতে।

শেখর। গান

আজ মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

বিজয়াদিত্য। কবি, ভালোবাসা তো দেব, কিন্তু কোথায় দেব?

শেখর। মহারাজ, যেদিন সময় আসে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন বাজে-খরচের

দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে। আজ সেই দিন এসেছে— আমার মন দিশেহারা হয়েছে।

গান

আমি যদি রচি গান অথির পরান
সে গান শোনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার।
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়?
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

বিজয়াদিত্য। বুঝেছি, কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অমৃতের ঋণ শোধ করতে বেরোব। তুমি একবার মন্ত্রীকে ডেকে দাও। [শেখরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। মন্ত্রী, আমি আজই বাহির হব।

মন্ত্রী। তার আয়োজন—

বিজয়াদিত্য। বিনা আয়োজনে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কী এমন বিশেষ কর্তব্য আছে যে—

বিজয়াদিত্য। আছে কর্তব্য। আমি সেই বীনকারকে ডাকতে যাব।

মন্ত্রী। বীনকার? সেই সুরসেন? আমি এখনই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিজয়াদিত্য। না না, রাজার ডাকে বীণার ঠিক সুরটি বাজে না। আমি তার দরজার বাইরে মাটিতে বসে শুনব, তারপরে যদি ডাক পড়ে তবে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে শুনব।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কী কথা বলছেন?

বিজয়াদিত্য। সিংহাসনে সুর পৌঁছোয় না। শ্রোতার আসন থেকে আমাকে চিরদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি মাটিতে বসব মেঠো ফুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে। কবিকে ডেকে দাও তো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। দিচ্ছি এখনই দিচ্ছি। [মন্ত্রীর প্রস্থান

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি, আমার বেরোবার সময় হল। যাবার আগে সেই মেঠো ফুলের গানটা শুনিয়ে দাও।

শেখর। গান

যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি ;
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে শোনা সে সুর এ কি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির 'পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, বেতসিনীতীরে পিঞ্জরীতে বীনকার সুরসেনের বাস। যখন আপনি সেখানে যাওয়াই স্থির করেছেন তখন সেই সঙ্গে একটা রাজকার্যও সম্পন্ন করতে পারেন।

বিজয়াদিত্য। সেখানে রাজকার্য আছে না কি ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। পিঞ্জরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্য সভায় সর্বদাই মহারাজের নামে স্পর্ধাবাক্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয়াদিত্য। বড়ো কৌতূহল হচ্ছে, মন্ত্রী। স্তুতিবাক্য অনেক শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন নিজের কানে স্পর্ধাবাক্য শুনি নি।

মন্ত্রী। ভগবানের কৃপায় কোনোদিন যেন না শুনতে হয়।

বিজয়াদিত্য। রাজা হবার ওই তো বিড়ম্বনা। পরিহাস করে তোমরা আমাদের

বল পৃথিবীপতি কিন্তু পৃথিবীকে সিংহাসনের মাপে ছোটো করে তোমরা আমাদের খেলনা বানিয়ে দিয়েছ—সব দেখা দেখতে পাই নে, সব শোনা শোনবার জো নেই ।

মন্ত্রী। যাদের সব দেখাই দেখতে হয়, সব শোনাই শুনতে হয় তারাই তো হতভাগ্য।

বিজয়াদিত্য। সেই হতভাগ্যদের দশাই আমি পরীক্ষা করে দেখব। সোমপালের স্পর্ধাবাক্য আমি নিজের কানে শুনব।

মন্ত্রী। তাহলে শেখরই মহারাজের সঙ্গে যাবেন, আর কেউ না ?

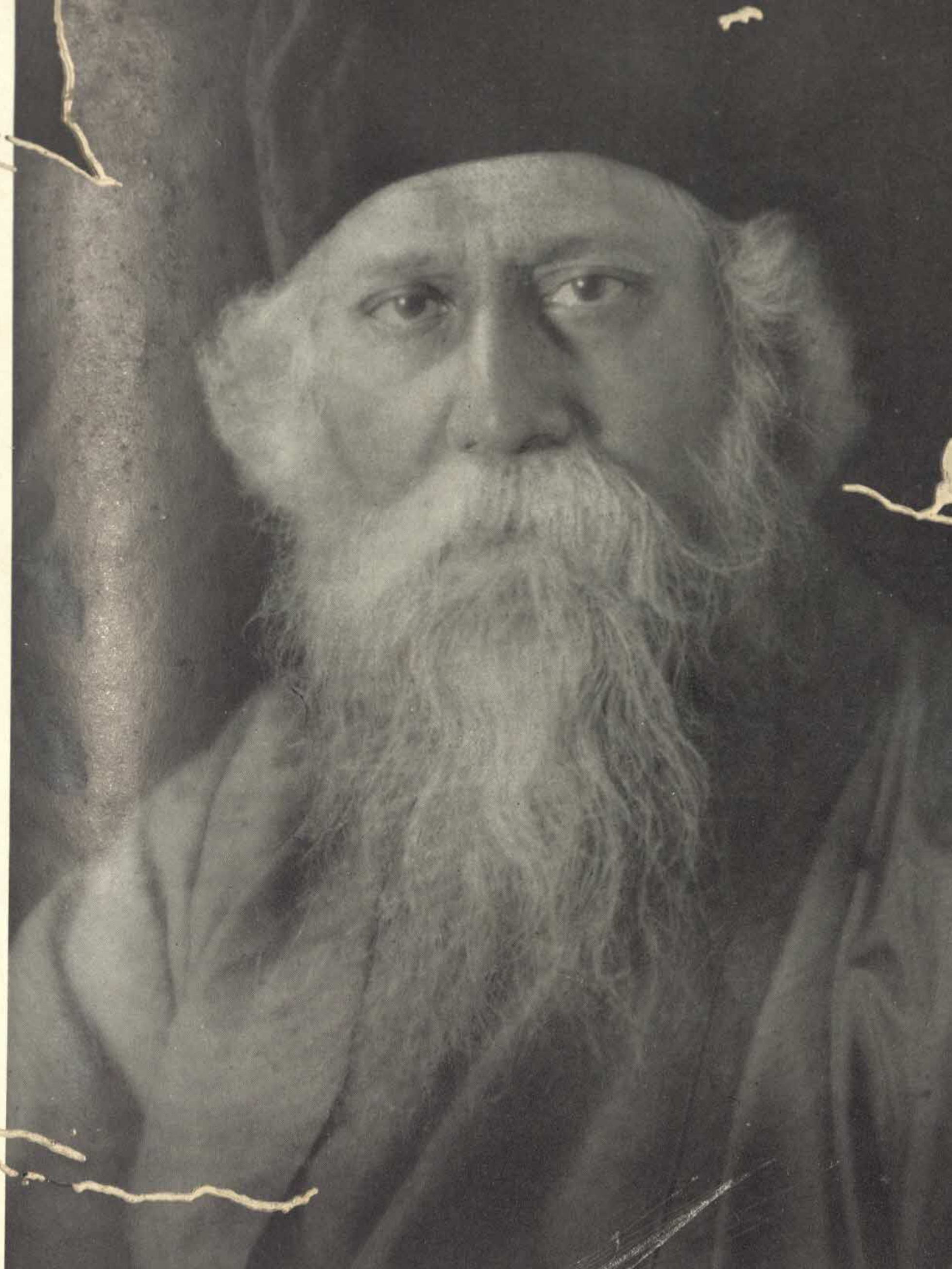
শেখর। না মন্ত্রী, এ-যাত্রায় আমার প্রয়োজন নেই। জানলার দরকার হয় যেখানে প্রাচীর আছে—যেখানে খোলা আকাশ সেখানে জানলায় কী হবে—রাজসভায় কবিকে না হলে চলে না।

[প্রস্থান

মন্ত্রী। তোমার কথা বুঝলেম না।

শেখর। মহারাজ, চার দিকের ভ্রূভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি আপনি চলে গেলে কবির পক্ষে এখানে অরাজক হবে। আমিও আপনারই পথ ধরলেম।

বিজয়াদিত্য। ভালো হল কবি, আজ শরতের নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছি—তুমি সঙ্গে না থাকলে তার প্রতিসম্ভাষণের বাণী পেতেম কোথায় ?



রবীন্দ্রনাথ
প্রাগ ১৯২১

ঋণশোধ

বেতসিনী নদীর তীর

বালকগণ

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
কেয়া পাতায় নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর। (ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগুলো তো জ্বালালে। ওরে চোবে। ওরে গিরধারিলাল। ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো ; একটাকেও ছাড়িস নে।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা। মার-মূর্তি কেন ?

লক্ষেশ্বর। আরে দেখো না ! সকাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না ? গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে ! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন !

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বুঝি সময় নেই ! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে !

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক ! হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো আয় তো রে ! চল তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বসো গে ! আর হিসেবে ভুল হবে না। [লক্ষেশ্বরের প্রস্থান

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদা চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুরদা আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে।

[ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কী রে তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে ? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর। মৃত্যু ! মৃত্যু হলে চলবে কেন। আমার টাকাগুলোর কী হবে ?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র। কী শুভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ। আমি শুভ সংবাদ দিতে আসি নি! আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। বটে! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মতলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল দেখি!

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব—তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ওই-রকম মরাই স্বভাব।—আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমতো টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে। আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিক মতো দিয়ো বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে। [উপনন্দের প্রস্থান

ওই যে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয় সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মতলবটা কী বল্‌ দেখি!

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই এই বেতসিনীর ধারে আমোদ করবে বলে আসছে,—আমাকে ছুটি দিলে আমিও তাদের সঙ্গে খেলি।

লক্ষেশ্বর। বেতসিনীর ধারে! ওই রে খবর পেয়েছে বুঝি। বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্‌ শীঘ্র চল্‌, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা।

লক্ষেশ্বর। দিন আবার সুন্দর কী রে। এই রকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি। যা বলছি ঘরে যা। (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিশ্রী দিন। আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়।

শেখর কবির প্রবেশ

এ লোকটা আবার এখানে কে আসে? কে হে তুমি? এখানে তুমি কী করতে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

শেখর। আমি সন্ধান করতে বেরিয়েছি।

লক্ষেশ্বর। ভাব দেখে তাই বুঝেছি। কিন্তু কিসের সন্ধানে বলো দেখি?

শেখর। সেইটে এখনও ঠিক করতে পারি নি।

লক্ষেশ্বর। বয়স তো কম নয়, তবু এখনও ঠিক হয় নি? তবে কী উপায়ে ঠিক হবে?

শেখর। ঠিক জিনিসে যেমনি চোখ পড়বে।

লক্ষেশ্বর। ঠিক জিনিস কি এই রকম মাঠে-ঘাটে ছড়ানো থাকে।

শেখর। তাইতো শুনেছি। ঘরের মধ্যে সন্ধান করে তো পেলেম না।

লক্ষেশ্বর। লোকটা বলে কী? তুমি ঘরে বাইরে সন্ধান করবার ব্যবসা ধরেছ— রাজা খবর পেলে যে তোমাকে আর ঘরের বার হতে দেবে না। পাহারা বসিয়ে দেবে।

শেখর। আমি রাজাকে সুদ্ধ এই ব্যবসা ধরাব—যা মাঠে ঘাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিদ্যে তাঁকে শেখাতে চাই।

লক্ষেশ্বর। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলো তো।

শেখর। তাহলে একেবারেই বুঝতে পারবে না।

লক্ষেশ্বর। ওহে বাপু, তোমার ওই সন্ধানের কাজটা ঠিক আমার এই ঘরের কাছটাতে না হয়ে কিছু তফাতে হলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

শেখর। আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্ছে কেন বলো তো।

লক্ষেশ্বর। সত্যি কথা বলব? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাজার চর। কোথা থেকে কী আদায় করা যেতে পারে রাজাকে সেই সন্ধান দেওয়াই তোমার মতলব।

শেখর। আদায় করবার জায়গা তো আমি খুঁজি বটে। তোমার বুদ্ধি আছে হে।

লক্ষেশ্বর। আছে বই কি। সেইজন্যেই হাত জোড় করে বলছি আমার ঘরটার দিকে উঁকি দিয়ো না—আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

শেখর। তোমার চেহারা দেখেই বুঝেছি সন্ধান করবার মতো ঘর তোমার নয়।

লক্ষেশ্বর। আশ্চর্য তোমার বুদ্ধি বটে। এ নইলে রাজকর্মচারী হবে কোন্ গুণে? রাজা বেছে বেছে লোক রাখে বটে। অকিঞ্চনের মুখ দেখলেই চিনতে পার?

শেখর। তা পারি। অতএব তোমার ঘরে আমার আনাগোনা চলবে না।

লক্ষেশ্বর। তোমার উপরে ভক্তি হচ্ছে। তাহলে আর বিলম্ব ক'রো না—এইখান থেকে একটুখানি—

শেখর। আমি তফাতেই যাচ্ছি—তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। "তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি"! লোকটা যখন কথা কয় সব ঝাপসা ঠেকে। রাজারা স্পষ্ট কথা সহ্য করতে পারে না, তাই বোধ হয় দায়ে পড়ে এই রকম অভ্যেস করেছে। [প্রস্থান

পুঁথি প্রভৃতি লইয়া উপনন্দের প্রবেশ ও একটি কোণে লিখিতে বসা

ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ

গান

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

একজন বালক। ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।

গান

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,

আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা।

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুরদা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন। তোমার সঙ্গে আড়ি। জন্মের মতো আড়ি।

ঠাকুরদাদা। এত বড়ো দণ্ড। নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি। না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর।

গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ওই দেখো কে আসছে, ওকে তো কখনো দেখি নি।

ঠাকুরদাদা। পাগড়ি দেখে মনে হচ্ছে লোকটা পরদেশী।

প্রথম বালক। পরদেশী! ভারি মজা।

দ্বিতীয় বালক। আমি পরদেশী হব ঠাকুরদা।

তৃতীয় বালক। আমিও হব পরদেশী—কী মজা।

সকলে। আমরা সবাই পরদেশী হব।

প্রথম বালক। আমাদের ওই রকম পাগড়ি বানিয়ে দাও ঠাকুরদা, তোমার পায়ে পড়ি।

শেখরের প্রবেশ

প্রথম বালক। তুমি পরদেশী?

শেখর। ঠিক বলেছ।

দ্বিতীয় বালক। তুমি কী কর?

শেখর। আমি সব জায়গায়ই দেশ খুঁজে বেড়াই।

তৃতীয় বালক। তার মানে কী, পরদেশী ?

শেখর। দেখো না, শরৎকালে রাজারা দেশ জয় করতে বেরোয়—তার আসল কারণ পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও এখনও তারা দেশ খুঁজে পায় নি, কোনো কালে পাবেও না।

প্রথম বালক। কেন পাবে না ?

শেখর। তারা নির্বোধ, মনে করে লড়াই করে দেশ পাওয়া যায়। বিনা লড়াইয়ে যারা জয় করতে জানে তারাই আপন দেশ খুঁজে পায়।

দ্বিতীয় বালক। তুমি খুঁজে পেয়েছ ?

শেখর। বড়ো শক্ত। কেননা, মানুষে লুকিয়ে রাখে। ওই বাড়িটার কাছে সন্ধানে গিয়েছিলেম একটা মানুষ ছুটে এসে বললে, এ তোমার জায়গা নয়, এ আমার।

সকলে। ও বুঝেছি। লক্ষ্মীপেঁচা।

প্রথম বালক। তার কোটরের কাছে গেলেই সে ঠোকর দিতে আসে।

দ্বিতীয় বালক। কিন্তু পরদেশী, আমাদের কাছে তোমার কোনো ভয় নেই।

শেখর। বাবা, তাহলে তোমাদের মধ্যেই আমার দেশ খুঁজে পাব।

গান

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে।
আশ্বিনে ওই শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে
খবর যে তার পৌঁছোল রে,
ঘরছাড়া ওই মেঘের কানে।

ঠাকুরদাদা। ও ভাই, আমার জায়গা তোমাকে ছেড়ে দিলেম।

শেখর। ছাড়তে হবে কেন ? দুজনেরই জায়গা আছে।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে চিনে নিয়েছি। তুমি মন ভোলাতে জান।

শেখর। আমার নিজের মন ভুলেছে বলেই আমি মন ভুলিয়ে বেড়াই।

প্রথম বালক। তার মানে কী পরদেশী? কেমন করে মন ভোলে?

শেখর। গান

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তারে,
সে যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না।
তার খেয়া গেল পারে
সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ করে সব সারা
(ঐ) এগিয়ে গেল কারা
আনমনা মন সেদিকপানে দৃষ্টি হানে না।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে ছাড়ছি নে ভাই, নিজের মনের কথা তোমার মুখ থেকে শুনে নেব।

ছেলেরা। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

শেখর। তোমরা ছাড়লে আমিই বুঝি তোমাদের ছাড়ব মনে করছ? একবার চারদিকটা ঘুরে আসছি—কোথায় এলুম একবার বুঝে নিই। [প্রস্থান

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ওই দেখো, ওই দেখো সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ।

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর।

ঠাকুরদাদা। আরে থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা। এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই। আপনি কে?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী। হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি—আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ।

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কতদিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী। খুব অল্পদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশায়!

প্রথম বালক। সন্ন্যাসী ঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এস ভাই। আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এস।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ! ভারি তো কাজ। ঠাকুর, তুমি ওকে বলো না। ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া) আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ। ঠাকুরদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়। আর এমন দিনেও ঋণশোধ। ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ওই ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে। ওই ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো। লেখো, লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ,—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হ'ক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই না।

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল, বাবাসকল। আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক। দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও না।

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?

প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না।

উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো?

দ্বিতীয় বালক। কক্‌খনো না।

উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে। আচ্ছা তুমি দেখো।

উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক। কিছু ভুল থাকবে না।

প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা।

ছেলেরা। এই যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী।

শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এ কী। তুমি পরদেশী না কি?

শেখর। পর-দেশী আমার সাজমাত্র, আসলে আমি সব-দেশী।

সন্ন্যাসী। সাজের দরকার কী ছিল?

শেখর। রাজাকে সাজতে হয় সন্ন্যাসী, রাজা যে কী জিনিস সেই বোঝবার জন্যে। যে-মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চায় তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ো হয়ে বসে আছেন ওটাও ওঁর সাজমাত্র—উনি যে বালক সেটা উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো করে চিনে নিচ্ছেন।

ঠাকুরদাদা। ভাই, এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে?

শেখর। সাজের ভিতর থেকে মানুষকে খুঁজে বের করা, সেই তো আমার কাজ। ঠাকুরদা, আমি আগে থাকতে তোমাকে বলে রাখছি এই যে মানুষটিকে দেখছ উনি বড়ো যে-সে লোক নন—একদিন হয়তো চিনতে পারবে।

ঠাকুরদাদা। সে আমি কিছু কিছু চিনেছি—নিজের বুদ্ধির গুণে নয় ওঁরই দীপ্তির গুণে।

সন্ন্যাসী। আর এই পরদেশীকে কী রকম ঠেকছে ঠাকুরদা।

ঠাকুরদাদা। সে আর কী বলব, যেন একেবারে চিরদিনের চেনা।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, আমার পক্ষেও তাই। কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যেন ওঁকে চেনবার জো নেই। উনি যে কিসের খোঁজে কখন কোথায় ফেরেন তা বোঝা শক্ত।

গান

শেখর। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
ও সে আছে বলে
আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়,
ও সে সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে পুলক লাগায় দখিন সমীরণে।
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে
আনমনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের বলে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম বালক। কিন্তু আর লিখতে ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয় বালক। না, আর নয়।

সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক।

উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।

প্রথম বালক। আচ্ছা পরদেশী, তুমি এত গান গাও কেন?

শেখর। আর কোনো গুণ যদি থাকত তাহলে গাইতেম না। ওই দেখ না কেন, তোমাদের সেই লক্ষ্মীপেঁচা তো গান গায় না।

সকলে। না, সে চেঁচায়।

শেখর। তার মানে, সার বস্তুর দ্বারা ভরতি হয়ে ও একেবারে নিরেট।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তোমার দেশের গল্প তুমি আমাদের শোনাবে?

শেখর। আমার দেশের গল্প ভারি অদ্ভুত।

সকলে। আমরা অদ্ভুত গল্প শুনব।

শেখর। আচ্ছা, তাহলে চলো, কোপাই নদীর ধার দিয়ে একবার পারুলডাঙায় তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি গে। চলতে চলতে গল্প হবে।

সন্ন্যাসী। এই দেখো, ওর সঙ্গে আমরা পারব না—আমাদের সব চেলা ভাঙিয়ে নিলে।

শেখর। ভাঙিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু টিঁকিয়ে রাখা শক্ত। এখনই ফিরে আসবে।

[বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল ?

উপনন্দ। স্বরসেন।

সন্ন্যাসী। স্বরসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে ?

সন্ন্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল ?

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এত বড়ো গুণী ? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এদেশে এসেছ ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি ?

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা ?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে জানেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে ?

সন্ন্যাসী। তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর। আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয় ? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন স্বরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি।

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কী রকমে সম্বন্ধ হল ?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম।

পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বললেন. এস বাবা, আমার ঘরে এস। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তাহলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব.; তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রং দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না। বাবা, লেখো, লেখো। আমরা ততক্ষণ আমাদের দলবলের খবর নিয়ে আসি গে। [প্রস্থান

শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ

শেখর। বিজয়াদিত্যকে তুমি হার মানাতে চাও তাহলে আগে ওই অপূর্বানন্দ সন্ন্যাসীকে বশ করো। রাজা সোমপাল, তিনিও নিশ্চয় তোমার মনের কথা জানেন।

সোমপাল। কোথায় তাঁকে পাব?

শেখর। তিনি এখানেই এসেছেন আমি জানি। কাছাকাছি কোথাও আছেন।

সোমপাল। দেখো আমি লোক চিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোমার দ্বারা আমার কাজ উদ্ধার হবে।

শেখর। তা হতেও পারে, অসম্ভব নয়। বিজয়াদিত্যকে বশ করবার ফন্দি আমি হয়তো তোমাকে কিছু কিছু বলে দিতে পারব।

সোমপাল। দেখো, তোমাকে আমি রাজমন্ত্রী করে দেব।

শেখর। আমার যদি মন্ত্রণা চাও তাহলে আমাকে মন্ত্রী ক'রো না। মন্ত্রণা দেওয়াই যার কাজ তার মন্ত্রণা কোনো রাজার ভালো লাগে না। বিজয়াদিত্যের সভায় যে একজন কবি আছে আমি দেখেছি—

সোমপাল। আরে ছি ছি, সে-ও আবার কবি হল! ওই তো রায়শেখরের কথা বলছ?

শেখর। হাঁ সেই বটে।

সোমপাল। সে আমার বিদূষকেরও যোগ্য নয়।

শেখর। একেবারেই নয়।

সোমপাল। বিজয়াদিত্য যেমন রাজা তার কবিটিও তেমনি।

শেখর। তাই তো অনেকে বলে। তোমার সভায় তাকে—

সোমপাল। আমার সভায় যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কিছুতেই—

শেখর। নিশ্চয়ই। ততক্ষণ সে—

সোমপাল। সে-কথা পরে হবে। এখন সন্ন্যাসীকে তুমি খুঁজে বের করো; দেখা হলেই তাকে আমার রাজসভায় পাঠিয়ে দিয়ো, বিলম্ব ক'রো না। আমি বরঞ্চ আমার দূতকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান

সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। উপনন্দ, ওই যে পরদেশী এসেছে ওকে দেখে তোমার মনে হয় না কি, তোমার আচার্য স্বরসেনেরই ও জুড়ি?

উপনন্দ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন তাঁরই বীণা শুনছি।

সন্ন্যাসী। তুমি যেমন তাঁকে পেয়েছিলে তেমনি করেই এই মানুষটিকে পাবে।

উপনন্দ। উনি কি আমাকে নেবেন?

সন্ন্যাসী। ওর মুখ দেখেই কি বুঝতে পার নি?

উপনন্দ। পেরেছি। আমার প্রভুই বুঝি ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে। তা তো নয় দেখছি। পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে। উপনন্দ।

উপনন্দ। কী।

লক্ষেশ্বর। ওঠ্‌, ওঠ্‌, ওই জায়গা থেকে। এখানে কী করতে এসেছিস?

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা না কি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু। ভারি সেয়ানা দেখছি। তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে—কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে। আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু। আমি কি শিশু।

সন্ন্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার।

ঠাকুরদাদা। আরে কী বলিস লখা? আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রং-বাঁটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব না। টাকা হয়েছে বলে অহংকার। কাকে কী বলতে হয় জান না। [সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুকায়ন

সন্ন্যাসী। আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা। লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে। বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে, কি, কী করবে। তিনখানা জাহাজ এখনও সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধুলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর,—হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ওই বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি। ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া। তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন।

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকুরদা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বই কি। বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ। আচ্ছা তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এত দিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস চুকে গেল। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। ওরে। সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে। রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে না কি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো। এখন কী করি। (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বসো—এই যে এইখানে—আর একটু বাঁ দিকে সরে এস—এই হয়েছে। খুব চেপে বসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তাহলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে লখা করে কী। হঠাৎ খেপে গেল না কি।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি—শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারি নে। [প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ।

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদূত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদূত। আপনি তাহলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তাহলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদূত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই—ওইখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সন্ন্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

রাজদূত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে। [প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হ'ক আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর তুমিই অপূর্বানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা কিছু ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধুহাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী। কী বর চাই।

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে—সে অতি যৎসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না। শরৎ-কাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে—এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী। আমিও সেই সন্ধানেই আছি আর যেন ঘুরতে না হয়।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর। ওঃ তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে!

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সন্ন্যাসী। কিছু পেয়েছি বই কি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর আর একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা, সে তো কম কথা নয়। তাহলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই

চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তাহলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন ; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠবে ? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী। তাহলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দুকূল যাবে না তো ? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তাহলে তোমার তল্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা। আচ্ছা রাজি। তোমার চেলাই হব। ওই রে রাজা আসছে। আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দিগণের গান

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে।
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারী,
সংকট শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে॥

রাজা সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জয় হ'ক, কী বাসনা তোমার।

সোমপাল। সে-কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু।

সন্ন্যাসী। তাহলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

সোমপাল। পরিহাস নয় ঠাকুর। বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সোমপাল। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

সোমপাল। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

সোমপাল। মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নেই।

সোমপাল। তাহলে ঠাকুর আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তাহলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

সোমপাল। কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে—সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তাহলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে?

সোমপাল। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব—তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তাহলে ভারি খুশি হব।

সোমপাল। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না।

সোমপাল। তবে বিদায় হই। প্রণাম। [প্রস্থান

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

সোমপাল। বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ, নিতান্তই সাধারণ মানুষ।

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

সোমপাল। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাঁপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

সোমপাল। প্রণাম। [প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা।

উপনন্দ। মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে—তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তাহলে আমার খুব আনন্দ হবে,—মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তাহলেই ঋণটা শোধ হয়ে

যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তাহলে বালক বলে ছোটো জাত বলে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কি যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয় ?

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য ? তিনি যে আমাদের সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তাই না কি ?

উপনন্দ। তুমি জান না বুঝি ?

সন্ন্যাসী। তা হবে। না হয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন ?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তাহলে বিনা-মূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর এও কি সম্ভব ?

সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই ?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তাহলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম—পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে মরব। আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তাহলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চারদিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকে আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেয়ে মনটা তবু একটু হালকা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না হল না। তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি আমার বুকের ভিতরে যেন গুরগুর করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ওই এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী। সব সময়ে কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে, হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ওই মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর। তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি মরে গেলে কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হ'ক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ওই সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হ'ক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম। [প্রস্থান

ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। ওহে পরদেশী, তুমি তো মানুষের ভিতরকার মতলব সব দেখতে পাও। তুমি জান আমি বেরিয়েছিলুম বিশ্বের ঋণ শোধ করতে।

ঠাকুরদাদা। কী ঋণ প্রভু আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন না?

সন্ন্যাসী। আনন্দের ঋণ ঠাকুরদা। শরতে যে সোনার আলোয় সুধা ঢেলে দিয়েছে—তার শোধ করতে চাই যদি তো হৃদয় ঢেলে দিতে হবে। ওহে উদাসী, তুমি বল কী?

শেখর। গান

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেছে
মরণ কভু তারে থামায় ?
যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়।
ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তার ধারি ধার,
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তার।
আমার শরৎ-রাতের শেফালি বন
সৌরভেতে মাতে যখন,
তখন পালটা সে তান লাগে তব
শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়।

সন্ন্যাসী। এই ঋণশোধের ছবি আমি দেখে নিলেম ওই উপনন্দের মধ্যে। ওই তো প্রেমের ঋণ প্রেম দিয়ে শুধছে। উপনন্দকে তুমি দেখেছ ?

শেখর। হাঁ তাকে দেখে নিয়েছি, বুঝেও নিয়েছি। ছেলেদের মুখে উপনন্দ আর ঠাকুরদা এই দুই নাম বাজছে। তাদের কাছ থেকে ওর সব খবর পেলুম।

সন্ন্যাসী। ওকে সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে।

শেখর। ওই দুঃখের রতনমালা বিশ্বের কণ্ঠে ঝলমল করছে।

গান

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।
ধনধান্য তোমারি ধন
কী করবে তা কও,
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার॥

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি এখানে এসে জুটেছে। (চোখ টিপিয়া) ঠাকুরদা, এঁকে চিনতে পেরেছ কি, ইনি একজন সন্ধানী লোক।

শেখর। সেইজন্যেই তো তোমাকে ছেড়ে এখন এঁকে ধরেছি।

লক্ষেশ্বর। এঁকে দেখে ঠাউরেছ ওঁর সঞ্চয় কিছু আছে, আমার মতো অকিঞ্চন না।

শেখর। ঠিক বটে। সেইজন্যে লেগে আছি, আদায় না করে ছাড়ছি নে।

লক্ষেশ্বর। কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে মিলে চুপিচুপি কী পরামর্শ করছিলে বলো দেখি?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। অ্যাঁ! এরই মধ্যে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হয়েছে। তুমি যেই মনে করলে

আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ ! কিন্তু এসব কি ঠাকুরদার কর্ম। ওঁর পুঁজিই বা কী।

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি না কি ঠাকুরদা ? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ। তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তাহলে এতদিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্ধ্বস্বরে চোবে, তেওয়ারি, গিরধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে।

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু বলে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ওই। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না।

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই। ওই যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। ওই দেখছ না দূরে—আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে। সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হ'ক তুমি যে-রকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস ক'রো না—অংশীদার আর বাড়িয়ো না। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, পুত্র দাও ধন দাও করে আমাকে একেবার মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ওই যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল বলে।

[দ্রুত প্রস্থান

শেখরকে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর। সন্ন্যাসী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। কী বাবা।

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও।

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সন্ন্যাসী। এই পরদেশীকে তোমাদের সহায় করো, এ মানুষটি সকল খেলাই খেলতে জানে।

প্রথম বালক। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তুমি বলে দাও আমাদের কী করতে হবে।

শেখর। আচ্ছা, তাহলে চল তোমাদের সাজিয়ে নিয়ে আসি গে।

[বালকগণকে লইয়া কবির প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

ঠাকুরদাদা। এই যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও যেন খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন।

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে। আমি একদল ছেলেকে নিয়ে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী-রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় বক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো ফেলো তোমার জটা ফেলো।

চতুর্থ ব্যক্তি। ওরে দেখ না গেরুয়া পরেছে। কিন্তু এটা দামী জিনিস রে।

প্রথম ব্যক্তি। বাবা, তোমার এই শখের সন্ন্যাসীর সাজ কেন।

সন্ন্যাসী। আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কবির কাছে? এ যে শুনি নতুন কথা। আমাদের গাঁয়ে আছে

ভূষণ কবি, কৈবত্তর পো, লেখে ভালো, কিন্তু দীক্ষা দিতে এলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতুম না।

প্রথম বক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে।

সন্ন্যাসী। যদি-বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভণ্ড না কি?

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় বক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় বক্তি। একটি লোক আছে বাবা—সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতাল-সিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা ম'লো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে চল্ রে বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে-কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে-রকম যোগবল আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল।

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে?

দ্বিতীয় বক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বই কি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল না ভাই, কোন্ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মুশকিলেই ফেলেছ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার

মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক গে ও-সব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুরদাই জিতলে বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুরদা। ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যবসা দেখছি তোমার। কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না। [প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র। এবারে সকলে মিলে শারদোৎসবের আবাহন গানটি ধরো। কবি, তুমি ধরিয়ে দাও। ঠাকুরদা, তুমিও যোগ দিয়ো।

গান

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এস গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্বতে।
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জর তান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,

হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা॥

শেখর। পৌঁচেছে, গান আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা তাহলে আগে ধ্যানের গানটি গেয়ে নিই।

গান

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কী মন্ত্র হবে গাওয়া॥

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক। কই দেখিয়ে দাও না।

শেখর। ওই যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ আমিও দেখেছি।

শেখর। ওই যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক। কিসে ?

শেখর। কিসে ! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না ?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ পাচ্ছি।

শেখর। তবে আর কী ! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা। আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।

গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।

শেখর। সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে আসি গে।

[ছেলেদের লইয়া গাহিতে গাহিতে শেখরের প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল ! লখা গেরুয়া ধরেছে যে।

লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো—এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভু ! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে ? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা করো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। সন্ন্যাসী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। বসো, বসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ। একটু বিশ্রাম করো।

সোমপাল। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে—তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী। বল কী। বোধ হয় শরৎ-কালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিঁকতে দেয় নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

সোমপাল। কী সর্বনাশ। রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন!

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার উদ্‌যোগে ছিলে।

সোমপাল। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে—তা সে যাই হ'ক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি; তুমি তাঁকে ব'লো সে-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমি কি এমনি উন্মত্ত? আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে?

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা।

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু?

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি গেরুয়া পরে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ওই চক্রবর্তী সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে। লোকটা কী-রকম দুর্ভাগা দেখেছ।

সোমপাল। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে।

সন্ন্যাসী। ওই বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

সোমপাল। আরে চুপ, চুপ। তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি। তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক সে তুমি মনেই রেখে দাও।

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

সোমপাল। কী মুশকিলেই পড়লেম। সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্ না। ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ। এখান থেকে যাও না।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে। একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হ'ক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য। [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

সোমপাল। আরে করেন কী, করেন কী। আমাকে পরিহাস করছেন নাকি। আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু এ কী কাণ্ড। আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয়দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি। কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর।

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

সোমপাল। মহারাজ দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

সোমপাল। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ আমার হার মেনে আনন্দ।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর। এ কী, রাজা যে। এরা সব কারা। [পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী। এস, এস, বাবা, এস। কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা। ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী ক'রো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম এই কদিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা। তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বল বাবা!

উপনন্দ। ঠাকুর তুমি নেবে?

সন্ন্যাসী। নেব বই কি। তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি।

সন্ন্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী।

শ্রেষ্ঠী। আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও।

শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন?

সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল।

সন্ন্যাসী। ওগো স্বভূতি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা।

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায় আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল।

মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ। তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী। ইনি যে-গৃহে জন্মেছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন—পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর।

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ।

সন্ন্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তাহলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে?

সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনও দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চারদিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সোমপাল। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন,—

সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

সোমপাল। যাকে ইচ্ছা নাম করুন সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। না হয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী। বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

সোমপাল। কেবল মাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায় তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে না কি।

ঠাকুরদাদা। কারও পালাবার পথ কি রেখেছ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে। ওই আসছে।

শেখরের সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এস, বাবা, সব এস।

সকলে। একী! এ যে রাজা। আরে পালা, পালা। [পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা। আরে পালাস নে পালাস নে।

সন্ন্যাসী। তোমরা পালাবে কি, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

সোমপাল। যে আদেশ। [প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি এইবার এখানে গান শেষ করি।

শেখর। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে।

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে।

উপন্যাস ও গল্প

চার অধ্যায়

১৩।১৮

চার অধ্যায়

ভূমিকা

এলার মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে। তার মা মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার-বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারত না। বেহিসাবি মেজাজের অসংযত ঝাপটায় সংসারকে তিনি যখন-তখন ক্ষুব্ধ করে তুলতেন, শাসন করতেন অন্যায় করে, সন্দেহ করতেন অকারণে। মেয়ে যখন অপরাধ অস্বীকার করত, ফস করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস। অথচ অবিমিশ্র সত্যকথা বলা মেয়ের একটা ব্যসন বললেই হয়। এজন্যেই সে শাস্তি পেয়েছে সব-চেয়ে বেশি। সকল রকম অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা তার স্বভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। তার মার কাছে মনে হয়েছে, এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিরুদ্ধ।

একটা কথা সে বাল্যকাল থেকে বুঝেছে যে, দুর্বলতা অত্যাচারের প্রধান বাহন। ওদের পরিবারে যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী ছিল, যারা পরের অনুগ্রহ-নিগ্রহের সংকীর্ণ বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে নিঃসহায়ভাবে আবদ্ধ তারাই কলুষিত করেছে ওদের পরিবারের আবহাওয়াকে, তারাই ওর মায়ের অন্ধ প্রভুত্বচর্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপেই ওর মনে অল্পবয়স থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এত দুর্দাম হয়ে উঠেছিল।

এলার বাপ নরেশ দাশগুপ্ত সাইকলজিতে বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, অধ্যাপনায় তিনি বিশেষভাবে যশস্বী। প্রাদেশিক প্রাইভেট কলেজে তিনি স্থান নিয়েছেন যেহেতু সেই প্রদেশে তাঁর জন্ম, সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লোভ কম, সে-সম্বন্ধে দক্ষতাও সামান্য। ভুল করে লোককে বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস করে নিজের ক্ষতি করা বারবারকার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর শোধন হয় নি। ঠকিয়ে কিংবা অনায়াসে যারা উপকার আদায় করে তাদের কৃতঘ্নতা সব-চেয়ে অকরুণ। যখন সেটা প্রকাশ পেত সেটাকে মনস্তত্ত্বের বিশেষ তথ্য বলে মানুষটি অনায়াসে স্বীকার করে নিতেন, মনে বা মুখে নালিশ করতেন না। বিষয়বুদ্ধির-ত্রুটি নিয়ে স্ত্রীর কাছে কখনো তিনি ক্ষমা পান নি, খোঁটা খেয়েছেন প্রতিদিন। নালিশের কারণ অতীতকালবর্তী হলেও তাঁর স্ত্রী কখনো ভুলতে পারতেন না, যখন-তখন তীক্ষ্ণ খোঁচায় উসকিয়ে দিয়ে তার দাহকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া অসাধ্য করে তুলতেন।

বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুঃখ পেতে দেখে বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ—যেমন সকরুণ স্নেহ মায়ের থাকে অবুঝ বালকের 'পরে। সব-চেয়ে তাকে আঘাত করত যখন মায়ের কলহের ভাষায় তীব্র ইঙ্গিত থাকত যে, বুদ্ধিবিবেচনায় তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এলা নানা উপলক্ষ্যে মায়ের কাছে তার বাবার অসম্মান দেখতে পেয়েছে, তা নিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে চোখের জলে রাত্রে তার বালিশ গেছে ভিজে। এ-রকম অতিমাত্র ধৈর্য অন্যায় বলে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারে নি।

অত্যন্ত পীড়িত হয়ে একদিন এলা বাবাকে বলেছিল, "এ-রকম অন্যায় চুপ করে সহ্য করাই অন্যায়।"

নরেশ বললেন, "স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু আরাম নেই।"

"চুপ করে থাকাতে আরাম আরও কম"—বলে এলা দ্রুত চলে গেল।

এদিকে সংসারে এলা দেখতে পায়, যারা মায়ের মন জুগিয়ে চলবার কৌশল জানে তাদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর অন্যায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি। এলা সইতে পারে না, উত্তেজিত হয়ে সত্য প্রমাণ উপস্থিত করে বিচারকর্ত্রীর সামনে। কিন্তু কর্তৃত্বের অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই দুঃসহ স্পর্ধা। অনুকূল ঝ'ড়ো হাওয়ার মতো তাতে বিচারের নৌকো এগিয়ে দেয় না, নৌকো দেয় কাত করে।

এই পরিবারে আরও একটি উপসর্গ ছিল যা এলার মনকে নিয়ত আঘাত করেছে। সে তার মায়ের শুচিবায়ু। একদিন কোনো মুসলমান অভ্যাগতকে বসবার জন্যে এলা মাদুর পেতে দিয়েছিল—সে মাদুর মা ফেলে দিলেন, গালচে দিলে দোষ হত না। এলার তার্কিক মন, তর্ক না করে থাকতে পারে না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা এই সব ছোঁয়াছুঁয়ি নাওয়াখাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদেরই কেন এত পেয়ে বসে? এতে হৃদয়ের তো স্থান নেই, বরং বিরুদ্ধতা আছে; এ তো কেবল যন্ত্রের মতো অন্ধভাবে মেনে চলা।" সাইকলজিস্ট বাবা বললেন, "মেয়েদের হাজার বছরের হাতকড়ি-লাগানো মন; তারা মানবে, প্রশ্ন করবে না,—এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে, সেইজন্যে মানাটা যত বেশি অন্ধ হয় তার দাম তাদের কাছে তত বড়ো হয়ে ওঠে। মেয়েলি পুরুষদেরও এই দশা।" আচারের নিরর্থকতা সম্বন্ধে এলা বারবার মাকে প্রশ্ন না করে থাকতে পারে নি, বারবার তার উত্তর পেয়েছে ভর্ৎসনায়। নিয়ত এই ধাক্কায় এলার মন অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

নরেশ দেখলেন পারিবারিক এই সব দ্বন্দ্বে মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে উঠছে, সেটা

তাঁকে অত্যন্ত বাজল। এমন সময় একদিন এলা একটা বিশেষ অবিচারে কঠোরভাবে আহত হয়ে নরেশের কাছে এসে জানাল, "বাবা, আমাকে কলকাতায় বোর্ডিঙে পাঠাও। প্রস্তাবটা তাদের দুজনের পক্ষেই দুঃখকর, কিন্তু বাপ অবস্থা বুঝলেন, এবং মায়াময়ীর দিক থেকে প্রতিকূল ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে। আপন নিষ্করুণ সংসারে নিমগ্ন হয়ে রইলেন অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়।

মা বললেন, "শহরে পাঠিয়ে মেয়েকে মেমসাহেব বানাতে চাও তো বানাও কিন্তু ওই তোমার আদুরে মেয়েকে প্রাণান্ত ভুগতে হবে শ্বশুরঘর করবার দিনে। তখন আমাকে দোষ দিয়ো না।" মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বারবার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ীর হাড় জালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাঁর অনুকম্পা মুখর হয়ে উঠত। এর থেকে মেয়ের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে, ন্যায়-অন্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।

এলা যখন ম্যাট্রিক পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মায়ের মৃত্যু হল। নরেশ মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাবে মেয়েকে রাজি করতে চেষ্টা করেছেন। এলা অপূর্ব-সুন্দরী, পাত্রের তরফে প্রার্থীর অভাব ছিল না, কিন্তু বিবাহের প্রতি বিমুখতা তার সংস্কারগত। মেয়ে পরীক্ষাগুলো পাস করলে, তাকে অবিবাহিত রেখেই বাপ গেলেন মারা।

সুরেশ ছিল তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। নরেশ এই ভাইকে মানুষ করেছেন, শেষ পর্যন্ত পড়িয়েছেন খরচ দিয়ে। দু-বছরের মতো তাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত এবং মহাজনের কাছে ঋণী হয়েছেন। সুরেশ এখন ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কর্ম উপলক্ষ্যে ঘুরতে হয় নানা প্রদেশে। তাঁরই উপর পড়ল এলার ভার। একান্ত যত্ন করেই ভার নিলেন।

সুরেশের স্ত্রীর নাম মাধবী। তিনি যে-পরিবারের মেয়ে সে-পরিবারে স্ত্রীলোকদের পরিমিত পড়াশুনোই ছিল প্রচলিত; তার পরিমাণ মাঝারি মাপের চেয়ে কম বই বেশি নয়। স্বামী বিলেত থেকে ফিরে এসে উচ্চপদ নিয়ে দূরে দূরে যখন ঘুরতেন তখন তাঁকে বাইরের নানা লোকের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হত। কিছুদিন অভ্যাসের পরে মাধবী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে বিজাতীয় লৌকিকতা পালন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এমন কি, গোরাদের ক্লাবেও পঙ্গু ইংরেজি ভাষাকে সকারণ ও অকারণ হাসির দ্বারা পূরণ করে কাজ চালিয়ে আসতে পারতেন।

এমন সময় সুরেশ কোনো প্রদেশের বড়ো শহরে যখন আছেন এলা এল তাঁর ঘরে; রূপে গুণে বিদ্যায় কাকার মনে গর্ব জাগিয়ে তুললে। ওঁর উপরিওআলা বা সহকর্মী

এবং দেশী ও বিলিতি আলাপী-পরিচিতদের কাছে নানা উপলক্ষ্যে এলাকে প্রকাশিত করবার জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এলার স্ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না যে, এর ফল ভালো হচ্ছে না। মাধবী মিথ্যা আরামের ভান করে ক্ষণে ক্ষণে বলতে লাগলেন, "বাঁচা গেল—বিলিতি কায়দার সামাজিকতার দায় আমার ঘাড়ে চাপানো কেন বাপু। আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি।" ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারিদিকে প্রায় একটা জেনানা খাড়া করে তুললে। সুরেশের মেয়ে সুরমার পড়াবার ভার সে অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে নিলে। একটা থীসিস লিখতে লাগিয়ে দিলে তার বাকি সময়টুকু। বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা। এই নিয়ে সুরেশ মহা উৎসাহিত। এই সংবাদটা চারদিকে প্রচার করে দিলেন। মাধবী মুখ বাঁকা করে বললেন, "বাড়াবাড়ি।"

স্বামীকে বললেন, "এলার কাছে ফস করে মেয়েকে পড়তে দিলে! কেন, অধর মাস্টার কী দোষ করেছে? যাই বল না আমি কিন্তু—"

সুরেশ অবাক হয়ে বললেন, "কী বল তুমি! এলার সঙ্গে অধরের তুলনা!"

"দুটো নোটবই মুখস্থ করে পাস করলেই বিদ্যে হয় না,"—বলে ঘাড় বেঁকিয়ে গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

একটা কথা স্বামীকে বলতেও তাঁর মুখে বাধে—"সুরমার বয়স তেরো পেরোতে চলল, আজ বাদে কাল পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে, তখন এলা সুরমার কাছে থাকলে—ছেলেগুলোর চোখে যে ফ্যাকাসে কটা রঙের নেশা—ওরা কি জানে কাকে বলে সুন্দর?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন, এ সব কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার-কানা।

যত শীঘ্র হয় এলার বিয়ে হয়ে যাক এই চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন গৃহিণী। বেশি চেষ্টা করতে হয় না, ভালো ভালো পাত্র আপনি এসে জোটে—এমন সব পাত্র, সুরমার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য মাধবী লুব্ধ হয়ে ওঠেন। অথচ এলা তাদের বারে বারে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়।

ভাইঝির একগুঁয়ে অবিবেচনায় উদ্বিগ্ন হলেন সুরেশ, কাকী হলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তিনি জানেন সৎপাত্রকে উপেক্ষা করা সমর্থবয়সের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ। নানারকম বয়সোচিত দুর্যোগের আশঙ্কা করতে লাগলেন, এবং দায়িত্ববোধে অভিভূত হল তাঁর অন্তঃকরণ। এলা স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, সে তার কাকার স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে।

এমন সময় ইন্দ্রনাথ এলেন সেই শহরে। দেশের ছাত্রেরা তাঁকে মানত রাজ-

চক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত। একদিন সুরেশের ওখানে তাঁর নিমন্ত্রণ। সেদিন কোনো এক সুযোগে এলা অপরিচয়সত্ত্বেও অসংকোচে তাঁর কাছে এসে বললে "আমাকে আপনার কোনো একটা কাজ দিতে পারেন না ?"

আজকালকার দিনে এ রকম আবেদন বিশেষ আশ্চর্যের নয় কিন্তু তবু মেয়েটির দীপ্তি দেখে চমক লাগল ইন্দ্রনাথের। তিনি বললেন, "কলকাতায় সম্প্রতি নারায়ণী হাই স্কুল মেয়েদের জন্যে খোলা হয়েছে। তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি, প্রস্তুত আছ ?"

"প্রস্তুত আছি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন।"

ইন্দ্রনাথ এলার মুখের দিকে তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে বললেন, "আমি লোক চিনি। তোমাকে বিশ্বাস করতে আমার মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় নি। তোমাকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে !"

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে এলার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল।

সে বললে, "আপনার কথায় আমার ভয় হয়। ভুল করে আমাকে বাড়াবেন না। আপনার ধারণার যোগ্য হবার জন্যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে গেলে ভেঙে পড়ব। আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিয়ে চলব আপনার আদর্শ, কিন্তু ভান করতে পারব না।"

ইন্দ্রনাথ বললেন, "সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও তুমি দেশের।"

এলা মাথা তুলে বললে "এই প্রতিজ্ঞাই আমার।"

কাকা গমনোদ্যত এলাকে বললেন "তোকে আর কোনোদিন বিয়ের কথা বলব না। তুই আমার কাছেই থাক্। এখানেই পাড়ার মেয়েদের পড়াবার ভার নিয়ে একটা ছোটোখাটো ক্লাস খুললে দোষ কী।"

কাকী স্নেহার্দ্র স্বামীর অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওর বয়স হয়েছে, ও নিজের দায় নিজেই নিতে চায়, সে ভালোই তো। তুমি কেন বাধা দিতে যাও মাঝের থেকে। তুমি যা-ই মনে কর না কেন, আমি বলে রাখছি ওর ভাবনা আমি ভাবতে পারব না।"

এলা খুব জোর করেই বললে, "আমি কাজ পেয়েছি, কাজ করতেই যাব।"

এলা কাজ করতেই গেল।

এই ভূমিকার পরে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হল, এখন কাহিনী অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দৃশ্য—চায়ের দোকান। তারই একপাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকালেজপাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। কিছু আছে য়ুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা। সেগুলো অল্পবিত্ত ছেলেরা পাত উলটিয়ে পড়ে চলে যায়, দোকানদার আপত্তি করে না। স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিসের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।

সামনে সদর রাস্তা, বাঁ' পাশ দিয়ে গেছে গলি। যাঁরা নিভৃতে চা খেতে চায় তাদের জন্যে ঘরের এক অংশ ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা দিয়ে ভাগ করা। আজ সেইদিকটাতে একটা বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ। যথেষ্ট পরিমাণ টুলচৌকির অসদ্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স। চায়ের পাত্রেও অগত্যা বৈসাদৃশ্য, তাদের কতকগুলি নীলরঙের এনামেলের, কতকগুলি সাদা চীনামাটির। টেবিলে হাতলভাঙা দুধের জগে ফুলের তোড়া। বেলা প্রায় তিনটে। ছেলেরা এলালতাকে নিমন্ত্রণের সময় নির্দেশ করে দিয়েছিল ঠিক আড়াইটায়। বলেছিল, এক মিনিট পিছিয়ে এলে চলবে না। অসময়ে নিমন্ত্রণ, যেহেতু ঐ সময়টাতেই দোকান শূন্য থাকে। চা-পিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটার পর থেকে। এলা ঠিক সময়েই উপস্থিত। কোথাও ছেলেদের একজনেরও দেখা নেই। একলা বসে তাই ভাবছিল—তবে কি শুনতে তারিখের ভুল হয়েছে। এমন সময় ইন্দ্রনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল। এ-জায়গায় তাঁকে কোনোমতেই আশা করা যায় না।

ইন্দ্রনাথ য়ুরোপে কাটিয়েছেন অনেক দিন, বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন সায়ান্সে। যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়। য়ুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারই লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কোনো বিজ্ঞান-আচার্যের বিশেষ সুপারিশ অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু সে কাজ অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওআলার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে। শেষে এমন জায়গায় তাঁকে বদলি হতে হল যেখানে ল্যাবরেটরি নেই।

বুঝতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনে সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ। একই প্রদক্ষিণপথে অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে অবশেষে কিঞ্চিৎ পেনশন ভোগ করে জীবলীলা সংবরণ করবেন, নিজের এই দুর্গতির আশঙ্কা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন অন্য যে-কোনো দেশে সম্মানলাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল।

একদা ইন্দ্রনাথ জার্মান ফরাসি ভাষা শেখাবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কালেজের ছাত্রদের সাহায্য করবার। ক্রমে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের গোপন তলদেশ বেয়ে একটা অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "এলা, তুমি যে এখানে ?"

এলা বললে, "আপনি আমার বাড়িতে ওদের যাওয়া নিষেধ করেছেন সেইজন্যে ছেলেরা এখানেই আমাকে ডেকেছে।"

"সে খবর আগেই পেয়েছি। পেয়েই জরুর তাদের অন্যত্র কাজে লাগিয়ে দিলুম। ওদের সকলের হয়ে অ্যাপলজি করতে এসেছি। বিলও শোধ করে দেব।"

"কেন আপনি আমার নিমন্ত্রণ ভেঙে দিলেন ?"

"ছেলেদের সঙ্গে তোমার সহৃদয়তার সম্পর্ক আছে সেই কথাটা চাপা দেবার জন্যে। কাল দেখতে পাবে তোমার নাম করে একটা প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি লিখেছেন ? আপনার কলমে বেনামি চলে না ; লোকে ওটাকে অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করবে না।"

"বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা করে লেখা ; বুদ্ধির পরিচয় নেই, সদুপদেশ আছে।"

"কী রকম ?"

"তুমি লিখছ—ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে। বঙ্গনারীদের কাছে তোমার সকরুণ আপিল এই যে, তারা যেন লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করে। বলেছ—দূর থেকে ভর্ৎসনা করলে কানে পৌঁছোবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা। শাসনকর্তাদের সন্দেহ হতে পারে, তা হ'ক। বলেছ— তোমরা মায়ের জাত ; ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পার, মরণ সার্থক হবে। আজকাল সর্বদাই বলে থাক—তোমরা মায়ের জাত, ওই কথাটাকে লবণাম্বুতে ভিজিয়ে লেখার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। মাতৃবৎসল পাঠকের চোখে জল আসবে। যদি তুমি পুরুষ হতে, এর পরে রায়বাহাদুর পদবী পাওয়া অসম্ভব হত না।"

"আপনি যা লিখেছেন সেটা যে একেবারেই আমার কথা হতে পারে না তা আমি বলব না। এই সর্বনেশে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসি—অমন ছেলে আছে কোথায়! একদিন ওদের সঙ্গে কালেজে পড়েছি। প্রথম প্রথম ওরা আমার নামে বোর্ডে লিখেছে যা-তা—পিছন থেকে ছোটো এলাচ বলে চেঁচিয়ে ডেকেই ভালো-মানুষের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েছে। ফোর্থ ইয়ারে পড়ত আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী—তাকে বলত বড়ো এলাচ, সে-বেচারার বহরে কিছু বাহুল্য ছিল, রংটাও উজ্জ্বল ছিল না। এই সব ছোটোখাটো উৎপাত নিয়ে অনেক মেয়ে রাগারাগি করত, আমি কিন্তু ছেলেদের পক্ষ নিয়েছি। আমি জানতুম, আমরা ওদের চোখে অনভ্যস্ত তাই ওদের ব্যাপারটা হয়ে পড়ে এলোমেলো—কদর্যও হয় কখনো কখনো, কিন্তু সেটা ওদের স্বাভাবিক নয়। যখন অভ্যেস হয়ে গেল; সুর আপনি এল সহজ হয়ে। ছোটো এলাচ হল এলাদি। মাঝে মাঝে কারও সুরে মধুর রস লেগেছে—কেনই বা লাগবে না? আমি কখনো ভয় করি নি তা নিয়ে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই সহজ, মেয়েরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি ওদের মৃগয়া করবার দিকে ঝোঁক না দেয়। তার পরে একে একে দেখলুম ওদের মধ্যে সব-চেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের 'পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য—"

"অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—"

"হাঁ তারাই, ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরিয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মরতে ছোটে আমি চাই নে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাস্টারমশায়, সত্যি কথা বলব। যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে! আমার বুক ফেটে যায়।"

"বৎসে, এই যে ধিক্কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ লেগেছিল। ডাক্তারি শেখবার গোড়ায় মড়া কাটবার সময় ঘৃণায় প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলুম। ওই ঘৃণাটাই ঘৃণ্য। শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা। তোমরা বলে থাক—মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির হাতে স্বতই বানানো। জন্তুজানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।"

"এ-সব মস্ত কথা বলে আপনি ভোলাচ্ছেন আমাদের। আমরা আসলে যা, তার চেয়ে দাবি করছেন অনেক বেশি। এতটা সইবে না।"

"দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়। তোমাদের আমরা যা বিশ্বাস করতে থাকব তোমরা তাই হয়ে উঠবে। তোমরাও তেমনি করে আমাদের বিশ্বাস করো যাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।"

"আপনাকে কথা কওয়াতে ভালোবাসি কিন্তু এখন সে নয়। আমি নিজে কিছু বলতে ইচ্ছে করি।"

"আচ্ছা। তাহলে এখানে নয়, চলো ওই পিছনের ঘরটাতে।"

পর্দাটানা আধা অন্ধকার ঘরে গেল ওরা। সেখানে একখানা পুরোনো টেবিল, তার দুধারে দুখানা বেঞ্চ, দেয়ালে একটা বড়ো সাইজের ভারতবর্ষের ম্যাপ।

"আপনি একটা অন্যায় করছেন—এ-কথা না বলে থাকতে পারলুম না।"

ইন্দ্রনাথকে এমন করে বলতে একমাত্র এলাই পারে। তবু তার পক্ষেও বলা সহজ নয়, তাই অস্বাভাবিক জোর লাগল গলায়।

ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বলতে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতি-পরিমাণে ছাঁটা, যত্ন না করলেও এলোমেলো হবার আশঙ্কা নেই। মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর উপর দুইপাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবি সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার 'পরে কারও আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারও আছে অকারণ ভয়।

ইন্দ্রনাথ হাসিমুখে বললে, "কী অন্যায়?"

"আপনি উমাকে বিয়ে করতে হুকুম করেছেন, সে তো বিয়ে করতে চায় না।"

"কে বললে চায় না?"

"সে নিজেই বলে।"

"হয়তো সে নিজে ঠিক জানে না, কিংবা নিজে ঠিক বলে না।"

"সে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ে করবে না।"

"তখন সেটা ছিল সত্য, এখন সেটা সত্য নেই। মুখের কথায় সত্য সৃষ্টি করা যায় না। প্রতিজ্ঞা উমা আপনিই ভাঙত, আমি ভাঙালুম, ওর অপরাধ বাঁচিয়ে দিলুম।"

"প্রতিজ্ঞা রাখা না-রাখার দায়িত্ব ওরই, না হয় ভাঙত, না হয় করত অপরাধ।"

"ভাঙতে ভাঙতে আশেপাশে ভাঙচুর করত বিস্তর, লোকসান হত আমাদের সকলেরই।"

"ও কিন্তু বড়ো কান্নাকাটি করছে।"

"তাহলে কান্নাকাটির দিন আর বাড়তে দেব না—কাল-পরশুর মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে দেওয়া যাবে।"

"কাল-পরশুর পরেও তো ওর সমস্ত জীবনটাই আছে।"

"মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।"

"আপনি নিষ্ঠুর!"

"কেননা, মানুষকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।"

"আপনি জানেন উমা সুকুমারকে ভালোবাসে।"

"সেইজন্যেই ওকে তফাত করতে চাই।"

"ভালোবাসার শাস্তি?"

"ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তাহলে বসন্ত রোগ হয়েছে বলেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে ঘর থেকে বের করে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।"

"সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো হয়।"

"সুকুমার তো কোনো অপরাধ করে নি। ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে কজন আছে?"

"ও যদি নিজেই উমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়?"

"অসম্ভব নয়। সেইজন্যেই এত তাড়া। ওর মতো উচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম ঘটানো মেয়েদের পক্ষে সহজ;—সৌজন্যকে প্রশ্রয় বলে সুকুমারের কাছে প্রমাণ করা দুই-এক ফোঁটা চোখের জলেই সম্ভব হতে পারে। রাগ করছ শুনে?"

"রাগ করব কেন? মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হয়েছে সত্যের

অনুরোধে ন্যায়বিচার করবার। আমি সেটা করে থাকি বলেই মেয়েরা আমাকে দেখতে পারে না। যার সঙ্গে উমার বিয়ের হুকুম সেই ভোগীলালের মত কী ?"

"সেই নিষ্কণ্টক ভালোমানুষের মতামত বলে কোনো উপসর্গ নেই। বাঙালির মেয়েমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে জানে। ও-রকম মুগ্ধ স্বভাবের ছেলেকে দলের বাইরের আঙিনায় সরিয়ে ফেলা দরকার। জঞ্জাল ফেলার সব-চেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।"

"এই সমস্ত উৎপাতের আশঙ্কা সত্বেও আপনি মেয়ে-পুরুষকে একত্র করেছেন কেন ?"

"শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে-সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না বলে। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে—দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।"

গম্ভীর মুখে এলা বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখ নামিয়ে বললে, "আমাকে আপনি তবে ছেড়ে দিন।"

"এতখানি ক্ষতি করতে বল কেন ?"

"আপনি জানেন না।"

"জানি নে কে বললে ? দেখা গেল একদিন তোমার খদ্দরে একটুখানি রং লেগেছে। জানা গেল অন্তরে অরুণোদয়। বুঝতে পারি একটা কোন্ পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় তোমার কান পাতা থাকে। গেল শুক্রবারে যখন এলুম তোমার ঘরে, তুমি ভেবেছিলে আর-কেউ বা। দেখলুম মনটা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লাগল। লজ্জা ক'রো না তুমি, এতে অসংগত কিছুই নেই।"

কর্ণমূল লাল করে চুপ করে রইল এলা।

ইন্দ্রনাথ বললে, "তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, এই তো ? তোমার মন তো জড় পাষাণে গড়া নয়। যাকে ভালোবাস তাকেও জানি। অনুশোচনার কারণ কিছুই দেখছি নে।"

"আপনি বলেছিলেন একমনা হয়ে কাজ করতে হবে। সকল অবস্থায় তা সম্ভব না হতে পারে।"

"সকলের পক্ষে নয়। কিন্তু ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই—তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।"

"আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগি নে, সে আপনি জানেন।"

"তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনের কাজ-করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।"

"আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই আমার অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

"কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো। শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ ক'রো না সংসার-পিঁজরেয় বেঁধে।"

"কিন্তু তবে আপনি যে ওই উমা—"

"উমা! কালু!—ভালোবাসার শুষ্ক রুদ্ররূপ ওরা সইতে পারবে কী করে? যে দাম্পত্যের ঘাটে ওদের সকল সাধনার অন্ত্যেষ্টিসংকার, সময় থাকতে সেখানেই দুজনকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠাচ্ছি।—সে-কথা থাক্‌। শোনা গেল তোমার ঘরে ডাকাত ঢুকেছিল পরশু রাত্রে।"

"হাঁ, ঢুকেছিল।"

"তোমার জুজুৎসু শিক্ষায় ফল পেয়েছিলে কি?"

"আমার বিশ্বাস ডাকাতের কবজি দিয়েছি ভেঙে।"

"মনটার ভিতর আহা উহু করে ওঠে নি?"

"করত কিন্তু ভয় ছিল ও আমাকে অপমান করবে। ও যদি যন্ত্রণায় হার মানত আমি শেষ পর্যন্ত মোচড় দিতে পারতুম না।"

"চিনতে পেরেছিলে সে কে?"

"অন্ধকারে দেখতে পাই নি।"

"যদি পেতে তাহলে জানতে, সে অনাদি।"

"আহা সে কী কথা। আমাদের অনাদি! সে যে ছেলেমানুষ।"

"আমিই তাকে পাঠিয়েছিলুম।"

"আপনিই ! কেন এমন কাজ করলেন ?"

"তোমারও পরীক্ষা হল, তারও।"

"কী নিষ্ঠুর।"

"ছিলুম নিচের ঘরে, তখনই হাড় ঠিক করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে মনে কর ব্যথাকাতর। বোঝাতে চেয়েছিলুম বিপদের মুখে কাতরতা স্বাভাবিক নয়। সেদিন তোমাকে বললুম, ছাগলছানাটাকে পিস্তল করে মারতে। তুমি বললে, কিছুতেই পারবে না। তোমার পিসতুত বোন বাহাদুরি করে মারলে গুলি। যখন দেখলে জন্তুটা পা ভেঙে পড়ে গেল, কাঠিন্যের ভান করে হা হা করে হেসে উঠল। হিস্টিরিয়ার হাসি, সেদিন রাত্তিরে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু তোমাকে যদি বাঘে খেতে আসত আর তুমি যদি ভীতু না হতে তাহলে তখনই তাকে মারতে, দ্বিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জন, নইলে নিজেকে সেন্টিমেন্টাল বলে ঘৃণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে। বুঝতে পেরেছ ?"

"পেরেছি।"

"যদি বুঝে থাক একটা প্রশ্ন করব। তুমি অতীনকে ভালোবাস ?"

কোনো উত্তর না দিয়ে এলা চুপ করে রইল।

"যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না ?"

"তার পক্ষে এতই অসম্ভব যে হাঁ বলতে আমার মুখে বাধবে না।"

"যদিই সম্ভব হয় ?"

"মুখে যা-ই বলি না কেন, নিজেকে কি শেষ পর্যন্ত জানি ?"

"জানতেই হবে নিজেকে। সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।"

"আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি আমাকে ভুল করে বেছে নিয়েছেন।"

"আমি নিশ্চিত জানি আমি ভুল করি নি।"

"মাস্টারমশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।"

আমি নিষ্কৃতি দেবার কে ? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"

"লোক চিনতে আপনি কি কখনো ভুল করেন না ?"

"করি। অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাবে দু-রকম বুনোনির কাজ। দুটোর মধ্যে মিল নেই। অথচ দুটোই সত্য। তারা নিজেকেও নিজে ভুল করে।"

ভারি গলায় আওয়াজ এল, "কী হে ভায়া।"

"কানাই বুঝি? এস এস।"

কানাইগুপ্ত এল ঘরে। বেঁটে মোটা মানুষটি আধবুড়ো। সপ্তাহখানেক দাড়িগোঁফ কামাবার অবকাশ ছিল না, কণ্টকিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল। সামনের মাথায় টাক; ধুতির উপর মোটা খদ্দরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত, জামা নেই। হাত দুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয়, সর্বদা কাজে উদ্যত, দলের লোকের যথাসম্ভব অন্নসংস্থানের জন্যই কানাইয়ের চায়ের দোকান।

কানাই তার স্বাভাবিক চাপা ভাঙা গলায় বললে, "ভায়া, তোমার খ্যাতি আছে বাক্‌সংযমে, তুমি মুনি বললেই হয়। এলাদি তোমার সেই খ্যাতি বুঝি দিলে মাটি করে।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "কথা না-বলারই সাধনা আমাদের। নিয়মটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ব্যতিক্রমের দরকার। এই মেয়েটি নিজে কথা বলে না, অন্যকে কথা বলবার ফাঁক দেয়, বাক্যের 'পরে এ একটি বহুমূল্য আতিথ্য।"

"কী বল তুমি ভায়া। এলাদি কথা বলে না! তোমার কাছে চুপ, কিন্তু যেখানে মুখ খোলে সেখানে বাণীর বন্যা। আমি তো মাথাপাকা মানুষ, সাড়া পেলেই খাতাপত্র ফেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুনতে আসি। এখন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে হবে। এলাদির মতো কণ্ঠ নয় আমার, কিন্তু সংক্ষেপে যেটুকু বলব তা মর্মে প্রবেশ করবে।"

এলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ইন্দ্রনাথ বললে, "যাবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। দলের লোকের কাছে আমি তোমাকে নিন্দে করে থাকি। এমন কি, এমন কথাও বলেছি, যে, একদিন তোমাকে হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন সরিয়ে দিতে হবে। বলেছি, অতীনকে তুমি ভাঙিয়ে নিচ্ছ, সেই ভাঙনে আরও কিছু ভাঙবে।"

"বলতে বলতে কথাটাকে সত্য করে তুলছেন কেন? কী জানি, এখানকার সঙ্গে হয়তো আমার একটা অসামঞ্জস্য আছে।"

"থাকা সত্ত্বেও তোমাকে সন্দেহ করি নে। কিন্তু তবু ওদের কাছে তোমার নিন্দে করি। তোমার শত্রু কেউ নেই এই জনপ্রবাদ, কিন্তু দেখতে পাই তোমার বারো আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হয়ে ওঠে। এই

নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। এদের নাম খাতায় টুকে রাখি। অনেকগুলো পাতা ভরতি হল।"

"মাস্টারমশায়, ওরা নিন্দে ভালোবাসে বলেই নিন্দে করে, আমার উপর রাগ আছে বলে নয়।"

"অজাতশত্রু নাম শুনেছ এলা। এরা সবাই জাতশত্রু। জন্মকাল থেকেই এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধূলিসাৎ করছে।"

"ভায়া, আজ এই পর্যন্ত, বিষয়টা আগামীবারে সমাপ্য। এলাদি, তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ ভাঙবার মূলে যদি গোপনে আমি থাকি, কিছু মনে ক'রো না। আমার চায়ের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসন্ন। বোধ হয় মাইল শ-তিন তফাতে গিয়ে এবার নাপিতের দোকান খুলতে হবে। ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের-করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, ব'লো, অলকা তেল মাখার পর থেকে চুল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।"

যাবার সময় এলা দরজার কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে বললে, "মাস্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আসবে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।"

এলা চলে গেলে ইন্দ্রনাথ বললে, "তোমাকে চঞ্চল দেখছি কেন হে কানাই ?"

"সম্প্রতি রাস্তার ধারে আমার ওই সামনের টেবিলেই বসে গোটাতিনেক গুণ্ডা ছেলে বীররস প্রচার করছিল। আওয়াজে বোঝা যায় জন বুষভেরই পুষ্যি বাছুর। আমি সিডিশনের নমুনা সুদ্ধ ওদের নামে পুলিসে রিপোর্ট করে দিয়েছি।"

"আন্দাজ করতে ভুল কর নি তো কানাই ?"

"বরং ভুল করে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না করে ভুল করা সাংঘাতিক। খাঁটি বোকাই যদি হয় তাহলে কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না, আর যদি হয় খাঁটি দুশমন তাহলে ওদের মারবে কে ? আমার রিপোর্টে উন্নতিই হবে। সেদিন চড়া গলায় শয়তানি শাসনপ্রণালীর উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবার প্রস্তাব তুলেছিল। নিশ্চয়ই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্যাশবাক্স নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেছিলুম। হঠাৎ একটা ধুলোমাখা ছেঁড়াকাপড়-পরা ছেলে এসে চুপি চুপি বললে, টাকা চাই পঁচিশটা, যেতে হবে দিনাজপুরে। আমাদের মথুর মামার নাম করলে। আমি লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে বলে উঠলুম, শয়তান, এতবড়ো স্পর্ধা তোমার। এখনই ধরিয়ে দেব পুলিসের হাতে।—সময় হাতে

একটুও ছিল না, নইলে প্রহসনটা শেষ করতুম, নিয়ে যেতুম থানায়। তোমার ছেলেরা যারা পাশের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল তারা আমার উপর অগ্নিশর্মা; ওকে দেবে বলে চাঁদা তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সবার পকেট কুড়িয়ে তেরো আনার বেশি ফণ্ড উঠল না। ছেলেটা আমার মূর্তি দেখে সরে পড়েছে।"

"তবে তো দেখছি তোমার ঢাকনির ফুটো দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে—মাছির আমদানি শুরু হল।"

"সন্দেহ নেই। ভায়া, এখনই ছড়িয়ে ফেলো তোমার ছেলেগুলোকে দূরে দূরে—ওদের একজনও যেন বেকার না থাকে। Ostensible means of livelihood প্রত্যেকেরই থাকা চাই।"

"চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু উপায় ঠাউরেছ?"

"অনেকদিন থেকে। হাত খোলসা ছিল না, নিজে করতে পারি নি। ভেবে রেখেছি, উপকরণও জমিয়েছি ধীরে ধীরে। মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জরাশনি বটিকা, তার বারো আনা কুইনীন। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে লেবেল বদলে নাম দেব ম্যালেরিয়ারি গুটিকা, কুইনীনের পিছনে অনেকখানি মিথ্যে কথা জুড়তে হবে। প্রতুল সেনকে লাগানো যাবে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ওই গুটিকা প্রচার করার কাজে। তোমার নিবারণ ফাস্ট ক্লাস এম. এসসি লজ্জা ত্যাগ করে পড়ুক ভৈরবী কবচ নিয়ে, এই কবচে সপ্তধাতুর উপরে নব্য রসায়নের আরও গোটাকতক নূতন ধাতুর নাম জড়িয়ে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্মিলন সাধনা করা যেতে পারে। জগবন্ধু সংস্কৃত শ্লোকের উপর ব্যাকরণের ভেলকি লাগিয়ে উচ্চস্বরে প্রমাণ করতে থাকুক যে, চাণক্য জন্মেছিলেন বাংলাদেশে নেত্রকোণায়, আমারও জন্মস্থান ওই সাবডিবিশনে। এই নিয়ে সাংঘাতিক কথা-কাটাকাটি চলুক সাহিত্যে, অবশেষে চাণক্য-জয়ন্তী করা যাবে আমারই প্রপিতামহের প'ড়ো ভিটের 'পরে। তোমাদের ক্যাম্বেলি ডাক্তার তারিণী সাণ্ডেল মা শীতলার মন্দির নির্মাণের জন্যে চাঁদা চেয়ে পাড়া অস্থির করে বেড়াক। আসল কথা হচ্ছে, তোমার সব-চেয়ে মাথাউঁচু গ্রেনেডিয়ার ছেলের দলকে কিছুদিন বাজে ব্যবসায়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে—কেউ বা ওদের বোকা বলুক, কেউ বা বলুক ওরা চতুর বিষয়ী লোক।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "তোমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ব্যবসায়ে লাগি। আর-কিছুর জন্যে না, কেবল দেউলে হবার কার্যপ্রণালী এবং সাইকোলজি অনুশীলন করবার জন্যে।"

কানাই বললে, "তুমি যে-ব্যবসায়ে লেগেছ ভায়া, সেটা আজ হ'ক বা কাল হ'ক

নিশ্চিত দেউলে হবারই মুখে আছে। যারা দেউলে হয় তারা বোঝে না বলে হয় তা নয়, তারা লোকসানের রাস্তা কোনোমতে ছাড়তে পারে না বলেই হয়—দেউলে হওয়ার মরণটান একটা সাব্লাইম আকর্ষণ। ও-বিষয়টা বর্তমানে আলোচনা করে ফল নেই; একটা প্রশ্ন মনে আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নিই। এলার মতো সুন্দরী সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না—এ-কথা মান কি না?"

"মানি বই কি।"

"তাহলে ওকে তোমাদের মধ্যে রেখেছ কোন্ সাহসে?

"কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাজে আমি আগুনকে বাদ দিতে চাই নে।"

"অর্থাৎ তাতে কাজ নষ্ট হ'ক বা না হ'ক, তুমি কেয়ার কর না।"

"সৃষ্টিকর্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের হিসেব করে সৃষ্টির কাজ চলে না; অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্তনা। ঠাণ্ডা মালমসলা নিয়ে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে যে পুতুল গড়া হয় তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন আমার নয়। ওই যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে,—ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।"

"ভায়া, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র। খেপে ওঠে যদি কোনো গ্যাস, যদি কোনো যন্ত্র ফেটে ফুটে ছিটকে পড়ে তাহলে আমাদের কপাল ভাঙবে সাতখানা হয়ে। সেটা নিয়ে গর্ব করবার মতো জোর আমাদের খুলির তলায় নেই।"

"জবাব দিয়ে বিদায় নেও না কেন?"

"ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারই দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হয়তো মিলতে পারে। তোমার এই সর্বনেশে রিসর্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়োখেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যবসার সাদা চোখে। অবশেষে খতেনের খাতায় আগুন লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা ক'রো না, ভায়া। ওর প্রত্যেক সিকি পয়সায় আছে আমাদের বুকের রক্ত।"

"আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে

মানায় বলেই আমি আছি,—এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চারদিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল; সে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ কানাই। কেন? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হ'ক। তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। আর বেশি কী চাই? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।"

"ভায়া, আমার মতো অকাল্পনিক প্র্যাক্‌টিক্যাল লোককেও তুমি টান মেরে এনেছ ঘোরতর পাগলামির তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে। ভাবি যখন, এ রহস্যের অন্ত পাই নে আমি।"

"আমি কাঙালের মতো করে কিছুই চাই নে বলেই তোমাদের 'পরে আমার এত জোর। মায়া দিয়ে ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকি নে কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য প্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল। যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল আজ তারা ধুলোয় মিলিয়ে গেছে,—তাদের হিসাবের খাতায় কোথায় মস্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে? আমি তা কখনোই করি নে। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।"

"তবে!"

"তবে! দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক উর্ধ্বে—আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"

"আর আমরা!"

"তোমরা কি খোকা! মাঝদরিয়ায় যে-জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে?"

"না যদি পারি তবে ?"

"তবে কী। তোমরা কজনে জেনে শুনে সেই ডুবোজাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কাঁপে নি। এমন যে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত। রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ করে। তোমরা তবু হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা—বাস, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে। তার পরে ? কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

"তুমি যা বলছ তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে বলে বোধ হয়।"

"কোন্ কথাটা ?"

"তোমার মনে কি রাগও নেই ? এত ইম্পার্সোন্যাল তুমি !"

"রাগ কার 'পরে ?"

"ইংরেজের 'পরে।"

"যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।"

"তা হ'ক, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক।"

"সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব-চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না—লজ্জা পায়। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সব-চেয়ে ভয় ;—ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায়। ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল স্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।"

"অদ্ভুত তুমি।"

"ষোলো আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে। এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জাতের ঘাড়ে নেই এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।"

"সে ওরা বুঝবে। কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈতুক করে তুলেছ এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে।"

"অত্যন্ত ভুল। আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।"

"শত্রুকে যদি শত্রু ব'লে তাকে দ্বেষ না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী করে?"

"রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।"

"কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই।"

"নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না—সামনে মৃত্যুই যদি সব-চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও। পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।"

"ওই আসছেন রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকি ভগীরথ। ওঁকে চা খাইয়ে আসি গে। সেই সঙ্গে স্পষ্টভাষায় খবরও দেব যে, পুলিসকে সব কথা রিপোর্ট করা হয়েছে। তোমার দলের বোকারা আমাকে লিঙ্ক্‌ করে না বসে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

এলা বসে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে একমনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা কাঠের বোর্ডে কোলের উপর আড় করে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তখনও চুল রয়েছে অযত্নে। বেগনি রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃতে ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন। এলার হাতে একজোড়া লালরং-করা শাঁখা, গলায় একছড়া সোনার হার। হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য। খদ্দরের সবুজ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রান্তে দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী স্কুলের তাঁতে-বোনা শতরঞ্চ মেঝের উপর পাতা। একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে ব্লটিং প্যাড; তার একপাশে কলম-পেনসিল সাজানো দোয়াত দান, অন্যধারে পিতলের ঘটিতে গন্ধরাজ ফুল। দেয়ালে ঝুলছে কোনো একটি দূরবর্তী কালের ফোটোগ্রাফের প্রেতাত্মা, ক্ষীণ হলদে রেখায় বিলীনপ্রায়। অন্ধকার হল, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি-উঠি করছে এমন সময় খদ্দরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, "এলী।"

এলা খুশিতে চমকে উঠে বললে, "অসভ্য, জানান না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস কর।"

এলার পায়ের কাছে ধপ করে মেঝের উপর বসে অতীন বললে, "জীবনটা অতি ছোটো, কায়দাকানুন অতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত পরমায়ু ছিল সনাতন যুগে মান্ধাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।"

"আমার কাপড় ছাড়া হয় নি এখনও।"

"ভালোই। তাহলে আমার সঙ্গে মিশ খাবে। তুমি থাকবে রথে, আমি থাকব পদাতিক হয়ে—এ-রকম দ্বন্দ্ব মস্তুর নিয়মে অধর্ম। এককালে আমি ছিলুম নিখুঁত ভদ্রলোক, খোলসটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে। বর্তমান বেশভূষাটা দেখছ কী রকম?"

"অভিধানে ওকে বেশভূষা বলে না।"

"কী বলে তবে?"

"শব্দ পাচ্ছি নে খুঁজে। বোধ হয় ভাষায় নেই। জামার সামনেটাতেই ওই যে বাঁকাচোরা ছেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লম্বা বিজ্ঞাপন?"

"ভাগ্যের আঘাত দারুণ হলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি—ওটা তারই পরিচয়। এ জামা দরজিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আত্মসম্মানবোধ আছে।"

"আমাকে দিলে না কেন ?"

"নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার ?"

"ওটাকে সহ্য করবার এমনই কী দরকার ছিল ?"

"যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহ্য করে।"

"তার অর্থ ?"

"তার অর্থ, একটির বেশি নেই বলে।"

"কী বল তুমি অন্তু! বিশ্বসংসারে তোমার ওই একটি বই জামা আর নেই ?"

"বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়ে বললুম। পূর্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময়ে দেশে এল বন্যা। তুমি বক্তৃতায় বললে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দিনে, (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা ?) বহু নরনারীর লজ্জা রক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনও তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। কিন্তু মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই অত্যাবশ্যক। সেদিন দেশহিতৈষিণীদের মধ্যে রেষারেষি চলছিল,—কে কত দান সংগ্রহ করতে পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরঙ্গ তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুশিতে।"

"সে কী কথা! আমি কি জানি অমন নিঃশেষ করে দেবে ?"

"আশ্চর্য হও কেন ? দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি এই দেহে দুর্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে ? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের 'পরে তাহলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য।"

"ছি ছি অন্তু, কেন আমাকে বললে না ?"

"দুঃখ ক'রো না। একান্ত শোচনীয় নয়, দুটো জামা বাঁচিয়ে রেখে দিলুম নিত্য আবশ্যকের গরজে, পালা করে কেচে পরা চলছে। আরও দুটো আছে আপদ্ধর্মের জন্যে ভাঁজ করা। যদি কোনোদিন সন্দিগ্ধ সংসারে ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে সেই জামা দুটোতে ধোবা-দরজির সার্টিফিকেট রইল।"

"সৃষ্টিকর্তার সার্টিফিকেট রয়েছে ওই চেহারাতেই—সাক্ষী ডাকতে হবে না তোমার।"

"স্তুতি! নারীর দরবারে স্তবের অত্যুক্তি চিরদিন পুরুষদেরই অধিকারভুক্ত, তুমি উলটিয়ে দিতে চাও?"

"হাঁ চাই। প্রচার করতে চাই, আধুনিক কালে মেয়েদের অধিকার বেড়ে চলেছে। পুরুষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে। স্বজাতির গুণগরিমার উপরে সাহিত্যিক রং চড়াচ্ছে। সেটা তাদের অঙ্গরাগেরই সামিল, স্বহস্তের বাঁটা, বিধাতার হাতের নয়। আমার এতে লজ্জা করে। এখন চলো বসবার ঘরে।"

"এ-ঘরেও বসবার জায়গা আছে। আমি তো একাই একটা বিরাট সভা নই।"

"আচ্ছা তবে বলো জরুরি কথাটা কী?"

"হঠাৎ কবিতার একটা পদ মনে পড়ে গেছে অথচ কোথায় পড়েছি কিছুতেই মনে আসছে না। সকাল থেকে হাওয়া হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।"

"অত্যন্ত জরুরি দেখছি। আচ্ছা বলো।"

"একটু ভেবে বলো কার রচনা—

তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

"কোনো নামজাদা কবির তো নয়ই।"

"পূর্বশ্রুত বলে মনে হচ্ছে না তোমার?"

"চেনা গলার আভাস পাচ্ছি একটুখানি। অন্য লাইনটা গেছে কোথায়?"

"আমার বিশ্বাস ছিল, অন্য লাইনটা আপনিই তোমার মনে আসবে।"

"তোমার মুখে যদি একবার শুনি তাহলে নিশ্চয় মনে আসবে।"

"তবে শোনো—

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

অতীনের মাথায় করাঘাত করে এলা বললে, "আজকাল কী পাগলামি শুরু করেছ তুমি?"

"সেই চৈত্রমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি শুরু। যে-সব দিন চরমে

না পৌঁছোতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসরঘরে। আজ সেইখানে তোমাকে ডাক দিতে এলুম—কাজের ক্ষতি করব।”

কাঠের বোর্ড আর খাতাখানা মেজের উপর ফেলে দিয়ে এলা বললে, “থাক পড়ে আমার কাজ। আলোটা জেলে দিই।”

“না থাক্—আলো প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করে, চলো দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে। চার বছরের কিছু কম হবে, স্টীমারে খেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে। তখনও আঁকড়ে ছিলুম পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটাকে সেটা ছিল দেনার গর্তে ভরা। তখনও দেহে মনে শৌখিনতার রং লেগে ছিল দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে আছি ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ বেতের কেদারায়। ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল মূর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক-প্যাসেঞ্জার। হঠাৎ আমার পশ্চাদ্বর্তী অগোচরতার মধ্যে থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজও চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি; খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুইধারে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসংকোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে, আপনি খদ্দর পরেন না কেন?—মনে পড়ছে?”

“খুব স্পষ্ট। তোমার মনের ছবিকে তুমি কথা কওয়াতে পার, আমার ছবি বোবা।”

“আমি আজ সেদিনের পুনরুক্তি করে যাব, তোমাকে শুনতে হবে।”

“শুনব না তো কী। সেদিন যেখানে আমার নূতন জীবনের ধুয়ো, পুনঃ পুনঃ সেখানে আমার মন ফিরে আসতে চায়।”

“তোমার গলার স্বরটি শুনেই আমার সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই স্বর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো; যেন আকাশ থেকে কোন্ এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে। অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তাহলে সেদিনকার খেয়াতরী এতবড়ো আঘাটায় পৌঁছিয়ে দিত না—ভদ্রপাড়াতেই শেষ পর্যন্ত দিন কাটত চলতি রাস্তায়। মনটা আর্দ্র দেশলাইকাঠির মতো, রাগের আগুন জ্বলল না। অহংকার আমার স্বভাবের সর্বপ্রধান সদ্‌গুণ, তাই ধাঁ করে মনে হল, মেয়েটি যদি আমাকে বিশেষভাবে পছন্দ না করত

তাহলে এমন বিশেষভাবে ধমক দিতে আসত না, খদ্দরপ্রচার—ও একটা ছুতো, সত্যি কিনা বলো।"

"ওগো, কতবার বলেছি,—অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণে বসে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর-কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সব-চেয়ে আশ্চর্য একচমকের চিরপরিচয়। মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চারদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শেওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনই মনে মনে পণ করলুম এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।"

"আমার কপালে তোমার একবচনের চাওয়াটা চাপা পড়ল বহুবচনের চাওয়ার তলায়।"

"আমার উপায় ছিল না অন্ত। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একল্যার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।"

"অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্মবিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙতে তবে সত্যরক্ষা হত। যে লোভ পবিত্র যা অন্তর্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।"

"অন্ত, শাস্তির সীমা নেই, দিনরাত মারছে আমাকে। যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এল আমার সামনে, তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এতবড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে। একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে, ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এর আগে কখনো মন বিচলিত হয় নি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু চঞ্চলতা জয় করে খুশি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে। জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি—বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।"

"আমিও হেরেছি আমার সেই বন্দিনীর কাছে। হার শেষ হয় নি, প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তেই হারছি।"

"অন্ত, ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ যখন অপূর্ব আবির্ভাবের মতো আমাকে দূর থেকে দেখা দিয়েছিলে, তখনও জানতুম থার্ড ক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক আভিজাত্যের

একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। অবশেষে তুমি চড়লে রেলগাড়িতে সেকেণ্ডক্লাসে। আমার দেহমনকে প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন কি, মনে একটা চাতুরীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেষমুহূর্তে উঠে পড়ব তোমার গাড়িতে, বলব,—তাড়াতাড়িতে ভুলে উঠেছি। কাব্যশাস্ত্রে মেয়েরাই অভিসার করে এসেছে, সংসারবিধিতে বাধা আছে বলেই কবিদের এই করুণা। উসখুস-করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।"

"কেন স্বীকার করলে?"

"নারীজাতির গুমর ভেঙে কেবল ওই স্বীকারটুকুই তোমাকে দিতে পেরেছি, আর তো কিছু পারি নি।"

হঠাৎ অতীন এলার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "কেন পারলে না? কিসের বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে? সমাজ? জাতিভেদ?"

"ছি, ছি, এমন কথা মনেও ক'রো না। বাইরে বাধা নয়, বাধা অন্তরে।"

"যথেষ্ট ভালোবাস নি?"

"ওই যথেষ্ট কথাটার কোনো মানে নেই অন্তু। যে শক্তি হাত দিয়ে পর্বতকে ঠেলতে পারে নি তাকে দুর্বল বলে অপবাদ দিয়ো না। শপথ করে সত্য গ্রহণ করেছিলুম, বিয়ে করব না। না করলেও হয়তো বিয়ে সম্ভব হত না।"

"কেন হত না?"

"রাগ ক'রো না অন্তু, ভালোবাসি বলেই সংকোচ। আমি নিঃস্ব, কতটুকুই বা তোমাকে দিতে পারি!"

"স্পষ্ট করেই বলো।"

"অনেকবার বলেছি।"

"আবার বলো, আজ সব বলাকওয়া শেষ করে নিতে চাই, এর পরে আর জিজ্ঞাসা করব না।"

বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদিমণি।"

"কী রে অখিল, আয় না ভিতরে।"

ছেলেটার বয়স ষোলো কিংবা আঠারো হবে। ক্ষেদালো দুষ্টুমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া, কচি শামলা রং, চঞ্চল চোখদুটো জলজল করছে। খাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা

জামা, বুক বের করা ; শর্টের দুইদিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিতে ফুলে-ওঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র ফলাওআলা একটা হরিণের শিঙের ছুরি ; কখনো বা সে খেলার নৌকো কখনো এরোপ্লেনের নমুনা বানায়। সম্প্রতি মল্লিক কোম্পানির আয়ুর্বৈদিক বাগানে দেখে এসেছে জলতোলা হাওয়া-যন্ত্র ; বিস্কুটের টিন প্রভৃতি নানা ফালতো জিনিস জোড়াতাড়া দিয়ে তারই নকলের চেষ্টা চলছে। আঙুল কেটেছে, তার উপরে ন্যাকড়া জড়ানো, এলা জিজ্ঞাসা করলে কানেই আনে না। এলা এই বাপমা-মরা ছেলের দূরসম্পর্কের আত্মীয়, অনেক উৎপাত সহ্য করে। কার কাছ থেকে বেঁটে জাতের এক বাঁদর অখিল সস্তা দামে কিনেছে। জন্তুটা ভাঁড়ারে চৌর্যবৃত্তিতে সুদক্ষ। এলার ছোটো পরিবারে এই জন্তুটা একটা মস্ত অত্যাচার।

ঘরে ঢুকেই অখিল সলজ্জ দ্রুতবেগে পা ছুঁয়ে এলাকে প্রণাম করলে। এলা বুঝলে প্রণামটা একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত, কেননা ভক্তিবৃত্তিটা অখিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

এলা বললে, "তোর অন্তুদাদাকে প্রণাম করবি নে ?"

কোনো জবাব না দিয়ে অখিল অতীনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। অতীন উচ্চস্বরে হেসে উঠল। অখিলের পিঠ চাপড়িয়ে বললে, "শাবাশ, মাথা যদি হেঁট করতেই হয় তো এক-দেবতার পায়ে। সেই একেশ্বরীর কাছে আমারও মাথা হেঁট, এখন প্রসাদের ভাগ নিয়ে রাগারাগি ক'রো না ভাই, উদ্বৃত্তই বেশি।"

এলা অখিলকে বললে, "তোর কী কথা আছে বলে যা।"

অখিল বললে, "কাল আমার মায়ের মৃত্যুদিন।"

"তাই তো। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। কাউকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে চাস ?"

"কাউকে না।"

"তবে কী চাস ?"

"পড়ার ছুটি চাই তিন দিন।"

"কী করবি ছুটি নিয়ে ?"

"খরগোশের খাঁচা বানাব।"

"খরগোশ তোর একটিও বাকি নেই, খাঁচা বানাবি কার জন্যে ?"

অতীন হেসে বললে, "খরগোশ তো কল্পনা করলেই হয়, খাঁচাটা বানানোই আসল কথা। মানুষ অনিত্য, আসে আর যায় কিন্তু নিত্যকালের মতো পাকা করে তাদের খাঁচা বানাবার ভার নিয়েছেন ভগবান মনু থেকে আরম্ভ করে মনুর আধুনিক অবতার পর্যন্ত। এই কাজে তাঁদের ভীষণ শখ।"

"আচ্ছা, অখিল যা তোর ছুটি।"

দ্বিতীয় কথাটি না বলে অখিল দৌড়ে চলে গেল।

অতীন বললে, "ওকে পোষ মানাতে পারলুম না। আমার সাবেক সম্পত্তির ঝড়তিপড়তির মধ্যে ছিল একটা কব্‌জিঘড়ি, আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাত রাজার ধন। একদিন সেটা ওকে দিতে গিয়েছিলুম। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। এর থেকে বুঝবে ওতে আমাতে ব্যাপারটা কম্যুন্যাল হয়ে উঠেছে, অন্ত-অখিল রায়ট হবার লক্ষণ।"

"ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই, তবু এই বাঁদরটার কাছে হার মানলে কেন?"

"মাঝখানে আছে তৃতীয় পক্ষ, নইলে ওতে আমাতে হরিহর বনে যেতুম। থাক্‌ সে-কথা; এখন বলো, তোমার কৈফিয়তটা কী? কেন আমাকে সরিয়ে রাখলে?"

"একটা সোজা কথা কেন তুমি মনে রাখ না যে, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো?"

"কারণ এই সোজা কথাটা ভুলতে পারি নি যে, তোমার বয়স আটাশ, আমার বয়স আটাশ পেরিয়ে কয়েক মাস। প্রমাণ করা খুব সহজ, কারণ দলিলটা তাম্রশাসনে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা নয়।"

"আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে। তোমার আটাশে যৌবনের সব সলতেই নির্ধূম জ্বলছে। এখনও তোমার জানলা খোলা যাদের দিকে, তারা অনাগত তারা অভাবিত।"

"এলী, আমার কথাটা কিছুতে বুঝতে চাচ্ছ না বলেই বুঝছ না। দলের কাছে ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্ছ, আমাকেও। ভোলাও কিন্তু এ-কথা ব'লো না আমার জীবনে এখনও অনাগত অভাবিত দূরে রয়ে গেছে। এসেছে সে, সে তুমি। তবুও আজও সে অনাগত। চিরদিনই কি তবে জানলা খোলা থাকবে তার দিকে? সেই শূন্যের ভিতর দিয়ে কেবলই বাজবে আমার আর্তস্বর, চাই তোমাকে চাই, আর অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসবে না কোনো উত্তর?"

"ফিরে আসছে না, এমন কথা বলছ কী করে অকৃতজ্ঞ? চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। যে-সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত সে-সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।"

"কেন? কী ক্ষতি হত তাতে?"

"আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারও মতো নও যে তুমি ; মস্ত তুমি। তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোকসামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোটো সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মানুষ হবে তুমি! আমি কত উপরে মুখ তুলে তোমার মাথা দেখতে পাই তোমাকে বোঝাব কেমন করে? মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে; তারা ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট।"

"এলা, যে পায় সেই জানে যথেষ্ট কাকে বলে।"

"নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্তু। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা। সেই শ্রেষ্ঠতা যে কী, ভাগ্যক্রমে আমি তা জানবার সুযোগ পেয়েছি। পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।"

"মাথায় বড়ো।"

"হাঁ মাথায় বড়োই তো। প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বড়ো হবার তোরণদ্বার সেই মাথায়। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্ট থাক্ না-থাক্ আমি নম্র হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছি সেই উপরের দিকে চেয়ে।"

"কোনো নীচ উৎপাত করে নি?"

"করেছে। আমাদের টানে যারা নেমে আসে বায়োলজির নিচের তলায়, তারা বিশ্রী হয়ে বিগড়ে যায়। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন না থাকলেও নিচে টেনে আনবার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবেভাবে বানানো কথায়।"

"বোকাদের ভোলাবার জন্যে?"

"হাঁ গো, তোমরা বোকা! অতি সহজ মন্ত্রেই ভোল, তাই আমাদের এত গুমর। আমরা বোকাদের ভালোবেসেছি, তবু তাদের স্থূল বোকামির সর্বোচ্চ শিখরে দেখেছি সূর্যোদয়, আলো এনেছে তারা, পূজা করেছি তখন। অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক দেখেছি কৃপণ কুৎসিত। সব বাদ দিয়ে সব মেনে নিয়ে তবু অনেক

বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়। তাদের অনেকের নাম থাকবে না কারও মনে, তবু তারা বড়ো।"

"এলী, তোমার কথা শুনে লজ্জা করছে, মনে হচ্ছে একটা প্রতিবাদ না করলে ভালো শোনাবে না। তবু ভালোও লাগছে। কিন্তু সত্য কথায় তোমার কাছে হার মানতে পারব না। আমাদের দেশের পুরুষদের যে কাপুরুষতার লক্ষণ ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যার কথা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে সে আমি আজ তোমার কাছে বলব। আমি দেখেছি আমার জানা পরিবারের মধ্যে এবং আমার নিজের পরিবারেও শাশুড়ীর অসহ্য অন্যায় আধিপত্য। শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত।"

"হাঁ সে তো জানি। নিজের ঘরে দেখেছি, যে-মানুষ হাড়ে দুর্বল, দুর্বলের যম সে—তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।"

"এলা, ও-কথা বলে তুমি তোমার ভাবী শাশুড়ীর নিন্দার ভূমিকা করে রেখো না। নববধূর 'পরে অমানুষিক অত্যাচারের খবর প্রায় শুনতে পাই, আর দেখি তার প্রধান নায়িকা শাশুড়ী। কিন্তু শাশুড়ীকে অপ্রতিহত অন্যায় করবার অধিকার দিয়েছে কে? সে তো ওই মায়ের খোকারা। অত্যাচারিণীর বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখবার শক্তি নেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে করবার বয়স হয়? যখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে। যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে। আজ দেখি আমাদের দেশে যারা বড়ো-কিছু করবার সংকল্প করে তারা মেয়েকে ত্যাগ করতে চায়—মেয়েকে ভয় করে সেই স্ত্রৈণ কাপুরুষেরা। সেইজন্যেই এই কাপুরুষের দেশে তুমি পণ করেছ বিয়ে করবে না, পাছে কোনো কচি মন বেঁকে যায় তোমার মেয়েলি প্রভাবে। যথার্থ পুরুষ যারা, তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে—বিধাতার নিজের হাতের এই হুকুমনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়। পরীক্ষার ভার ছিল তোমার হাতে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখলে না কেন?"

"অন্তু, তর্ক করতে পারতুম কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেননা, জানি তুমি নিতান্ত ক্ষোভের মুখে এই সব কুযুক্তি পেড়েছ। আমার পণের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছ না।"

"না ভুলতে পারব না। তুমি বললে কি না, পুরুষেরা মস্ত বড়ো, মেয়েরা তাদের ছোটো করবে এই তোমার ভয়! মেয়েদের বড়ো হবার দরকারই হয় না। তারা যতটুকু ততটুকুই সুসম্পূর্ণ। হতভাগা যে-পুরুষ বড়ো নয় সে অসম্পূর্ণ, তার জন্যে সৃষ্টিকর্তা লজ্জিত।"

"অন্তু, সেই অসম্পূর্ণের মধ্যেও আমরা বিধাতার ইচ্ছাটা দেখতে পাই—সেটা বড়ো ইচ্ছা।"

"এলী, বিধাতার ইচ্ছাটাই যে বড়ো তা বলতে পারি নে, তাঁর কল্পনাটাও কোনো অংশে ছোটো নয়। সেই কল্পনার তুলির ছোঁওয়ায় জাদু লেগেছে মেয়েদের প্রকৃতিতে, তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে আর্টিস্টের সাধনা, রঙে সুরে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করছে। এটা সহজ শক্তির কর্ম, সেইজন্যেই এটা সহজ নয়। ওই যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার হারটি দেখা দিয়েছে ওর জন্যে তোমাকে নোটবই মুখস্থ করতে হয় নি। আপনার জীবনলোকে রূপের সৃষ্টিতে রস জোগাতে পারল না, এমন হতভাগিনী আছে, মোটা সোনার বালা পরে গিন্নীপনা করে সেই মুখরা; নয় তো দাসী হয়ে জীবন কাটায় উঠোন নিকিয়ে। সংসারে এই সব অকিঞ্চিৎকরের সীমাসংখ্যা নেই।"

"সৃষ্টিকর্তাকেই দোষ দেব অন্তু। লড়াই করবার শক্তি কেন দেন নি মেয়েদের? বঞ্চনা করে কেন তাদের আপনাকে বাঁচাতে হয়? পৃথিবীতে সব-চেয়ে জঘন্য যে স্পাইয়ের ব্যবসা সেই ব্যবসাতে মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি এ-কথা যখন বইয়ে পড়লুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে বলেছি সাতজন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই। আমি মেয়ের চোখে দেখেছি পুরুষকে, তাই সব কাটিয়ে তাদের ভালোকে দেখতে পেয়েছি, তাদের বড়োকে। যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেয়ে—এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার। নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজি-পড়া মেয়েদের মুখে বাধে—কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে আমি সেবিকা, তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা। আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।"

"ভালোই তো; তোমার সেই ভক্তির জন্যে অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু আমাকে কেন? ভক্তি না হলেও আমার চলবে। মেয়েদের সম্বন্ধের যে ফর্দটা তুমি দিলে, মা বোন মেয়ে, তার মধ্যে প্রধান একটা বাদ পড়ে গেল, আমারই কপালদোষে।"

"তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্তু। আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। যে-তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরিব। তাই আমার সমস্ত দাবি তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণমনে

সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সংকোচে দুঃখ পাবে না।”

অত্যন্ত ব্যথার জায়গায় যেন ঘা লাগল, জলে উঠল অতীনের দুই চোখ। পায়চারি করে এল ঘরের এধার থেকে ওধারে। তার পরে এলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, “তোমাকে শক্ত কথা বলবার সময় এসেছে। জিজ্ঞাসা করি দেশের কাছে হ'ক যার কাছেই হ'ক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বল তো তাই বলো, বরদান বল যদি তাও বলতে পারো; অহংকার করতে যদি দাও তো করব অহংকার, নম্র হয়ে যদি আসতে বল দ্বারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তোমার আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ তুমি ছোটো করে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ—দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর-এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।”

বিবর্ণ হয়ে এল এলার মুখ। বললে, “কী বলছ, ভালো বুঝতে পারছি নে।”

“আমি বলছি নারীকে কেন্দ্র করে যে-মাধুর্যলোক বিস্তৃত, তার প্রসার যদি বা দেখতে হয় ছোটো, অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই,—সে খাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদের দলের বানানো দেশে—অন্যের পক্ষে যাই হ'ক আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো খাঁচা। আমার আপন শক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার, যা তার যথার্থ আপন নয় তাকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে পাগলামি করে, লজ্জা পাই, অথচ বেরোবার দরজা বন্ধ। জান না, আমার ডানা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, দুই পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ি। আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিলে?”

ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, “তুমি ভুললে কেন, অন্তু?”

“ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ, নইলে ভুলেছি বলে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।”

“তাই যদি হয় তবে আমাকে ভর্ৎসনা করছ কেন?”

“কেন? সেই কথাটাই বলছি। ভুলিয়ে তুমি সেইখানেই নিয়ে যাও যেখানে তোমার আপন বিশ্ব, আপন অধিকার। দলের লোকের কথার প্রতিধ্বনি করে

বললে, জগতে একটিমাত্র কর্তব্যের পথ বেঁধে দিয়েছ তোমরা কজনে। তোমাদের সেই শানবাঁধানো সরকারি কর্তব্যপথে ঘুর খেয়ে কেবলই ঘুলিয়ে উঠছে আমার জীবনস্রোত।"

"সরকারি কর্তব্য ?"

"হাঁ তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্‌টোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওআলা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল।"

"অন্তু, ওদের অনেকেই যে পাগলামি করে পা ফেলতে লাগল, তাল রাখতে পারলে না।"

"গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পার, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তাহলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।"

"অন্তু, গোড়াতেই কেন আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে না ? কেন আমাকে অপরাধী করলে ?"

"সে তো তোমাকে বারবার বলেছি। তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তায়। সেই মরাটা চুকে গেলে তুমি আমাকে দু-হাত বাড়িয়ে ফিরে ডাকবে—ডাকবে তোমার শূন্য বুকের কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।"

"পায়ে পড়ি, অমন করে ব'লো না।"

"বোকার মতো বলছি, রোমান্টিক শোনাচ্ছে। যেন দেহহীন বস্তুহীন পাওয়াকে

পাওয়া বলে! যেন তোমার সেদিনকার বিরহ আজকের দিনের প্রতিহত মিলনের এক কড়াও দাম শোধ করতে পারে!”

“আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে, অন্তু।”

“কী বলছ! আজ পেয়েছে! চিরকাল পেয়েছে। যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখ ফোটে নি, তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা কত অসংলগ্ন বাণী। বয়স হল, সাহিত্যলোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজ্যসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশথগাছ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধুলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলংকার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও। তোমার অন্তু চিরদিন কথায়-পাওয়া মানুষ। তাকে কোনোদিন ঠিকমতো চিনবে সে-আশা আর রইল না—তাকে কি না ভরতি করে নিলে দলের শতরঞ্চ খেলায় বোড়ের মধ্যে।”

এলা চৌকি থেকে নেমে পড়ে অতীনের পায়ের উপর মাথা রাখলে। অতীন তাকে টেনে তুলে পাশে বসালে। বললে, “তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। আমার চারিদিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চিরস্বতন্ত্র, সে-কথা জানেন তোমাদের মাস্টারমশায়, তবু আমাকে বিশ্বাস করেন কেন?”

“সেইজন্যেই বিশ্বাস করেন। সবার সঙ্গে মিলতে হলে সবার মধ্যে নাবতে হয় তোমাকে। তুমি কিছুতেই নাবতে পার না। তোমার ’পরে আমার বিশ্বাস সেইজন্যেই। কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে এত বিশ্বাস করতে পারে নি। তুমি যদি সাধারণ পুরুষ হতে তাহলে সাধারণ মেয়ের মতোই আমি তোমাকে ভয় করতুম। নির্ভয় তোমার সঙ্গ।”

“ধিক সেই নির্ভয়কে। ভয় করলেই পুরুষকে উপলব্ধি করতে। দেশের জন্যে দুঃসাহস দাবি কর, তোমার মতো মহীয়সীর জন্যে করবে না কেন? কাপুরুষ আমি। অসম্মতির নিষেধ ভেদ করে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারি নি বহুপূর্বে যখন সময় হাতে ছিল? ভদ্রতা! ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগলাঝোরা সে, ভদ্রশহরের পোষ-মানা কলের জল নয়।”

এলা দ্রুত উঠে পড়ে বললে, "চলো অন্ত, ঘরে চলো।"

অতীন উঠে দাঁড়াল, বললে "ভয়! এতদিন পরে শুরু হল ভয়! জিত হল আমার। যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনও মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি ; প্রমাণ করবার সময় বলে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনই তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত ; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে। আজ যে-পথে এসে পড়েছি এ-পথ ক্ষুরধারার মতো সংকীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।"

"দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।" এই বলে দু-হাত বাড়িয়ে গেল অতীনের কাছে, চোখ বুজে তার বুকের উপর পড়ে তার মুখের দিকে মুখ তুলে ধরলে।

জানালা থেকে এলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "সর্বনাশ! ওই দেখতে পাচ্ছ ?"

"কী বলো দেখি ?"

"ওই যে রাস্তার মোড়ে। নিশ্চয় বটু—এখানেই আসছে।"

"আসবার যোগ্য জায়গা সে চেনে।"

"ওকে দেখলে আমার সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে ওঠে। ওর স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ। যত চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে চলতে, ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে, ততই ও কাছে এসে পড়ে। অশুচি, অশুচি ওই মানুষটা।"

"আমিও ওকে সহ্য করতে পারি নে এলা।"

"ওর সম্বন্ধে অন্যায় কল্পনা করছি বলে নিজেকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করি—কোনোমতেই পারি নে। ওর ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো দূরের থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার অপমান করে।"

"ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপ ক'রো না এলা। মনে মনে ওর অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করতে পার না ?"

"ওকে ভয় করি বলেই মন থেকে সরাতে পারি নে। ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপস জন্তুর মতো। মনে হয় ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে আমাকে একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেলবে—কেবলই তারই চক্রান্ত করছে। একে তুমি আমার অবুঝ মেয়েলি আশঙ্কা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে

পার, কিন্তু এই ভয়টা ভূতে পাওয়ার মতো আমাকে পেয়েছে। শুধু আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে আমার আরও ভয় হয়, আমি জানি তোমার দিকে ওর ঈর্ষা সাপের ফণার মতো ফোঁস ফোঁস করছে।"

"এলা, ওর মতো জন্তুদের সাহস নেই, আছে দুর্গন্ধ, তাই কেউ ওদের ঘাঁটাতে চায় না। কিন্তু আমাকে ও সর্বান্তঃকরণে ভয় করে, আমি ভয়ংকর বলে যে তা নয়, আমি ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় বলে।"

"দেখো অন্তু, জীবনে অনেক দুঃখবিপদের সম্ভাবনা আমি ভেবেছি, তার জন্যে প্রস্তুতও আছি কিন্তু একদিন কোনো দুর্যোগে যেন ওর কবলে না পড়ি, তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।" অন্তুর হাত চেপে ধরলে, যেন এখনই উদ্ধার করবার সময় হয়েছে।

"জানো অন্তু, হিংস্র জন্তুর হাতে অপমৃত্যুর কল্পনা কখনো কখনো মনে আসে, তখন দেবতাকে জানাই, বাঘে খায় ভালুকে খায় সেও ভালো, কিন্তু আমাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে কুমিরে খাবে—এ যেন কিছুতে না ঘটে।"

"আমি কি বাঘভালুকের কোঠায় না কি?"

"না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি। ওই শোনো পায়ের শব্দ। উপরে উঠে এল বলে।"

অতীন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বললে, "বটু, এখানে নয়, চলো নিচে বসবার ঘরে।"

বটু বললে, "এলাদি—"

"এলাদি এখন কাপড় ছাড়তে গেলেন, চলো নিচে।"

"কাপড় ছাড়তে? এত দেরিতে? সাড়ে আটটা—"

"হাঁ হাঁ, আমিই দেরি করিয়ে দিয়েছি।"

"কেবল একটা কথা। পাঁচ মিনিট।"

"তিনি স্নানের ঘরে গেছেন। বলে গেছেন, এ ঘরে কেউ আসে তাঁর ইচ্ছে নয়।"

"আপনি?"

"আমি ছাড়া।"

বটু খুব স্পষ্ট একটা ঠোঁটবাঁকা হাসি হাসলে। বললে, "আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে, আর আপনি দুদিন এসেই উঠে পড়েছেন, আর্যপ্রয়োগে। এক্‌সেপশন্ পিছল পথের আশ্রয়, বেশিকাল সয় না বলে রেখে দিলুম।" বলে তর তর করে নেমে চলে গেল।

ছোটো একটা করাত হাতে দোলাতে দোলাতে অখিল এসে বললে, "চিঠি!" ওর অসমাপ্ত সৃষ্টিকাজের মাঝখানে থেকে উঠে এসেছে।

"তোমার দিদিমণির ?"

"না আপনার। আপনারই হাতে দিতে বললে।"

"কে ?"

"চিনি নে।" বলেই চিঠিখানা দিয়ে চলে গেল। চিঠির কাগজের লাল রং দেখেই অতীন বুঝলে, এটা ডেন্‌জর সিগ্‌ন্যাল। গোপন ভাষায় লেখা চিঠি পড়ে দেখলে— "এলার বাড়িতে আর নয়, তাকে কিছু না জানিয়ে এই মুহূর্তে চলে এসো।"

কর্মের যে-শাসন স্বীকার করে নিয়েছে তাকে অসম্মান করাকে অতীন আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ বলেই জানে। চিঠিখানা যথারীতি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রুদ্ধ নাবার ঘরের বাইরে। পরক্ষণে দ্রুতবেগে গেল বেরিয়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দোতলার দিকে তাকালে। জানলা খোলা, বাইরে থেকে দেখা যায় আরামকেদারার একটা অংশ, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন লালেতে হলদেতে ডোরা-কাটা চৌকো বালিশের এক কোণা। লাফ দিয়ে অতীন চলতি ট্রাম গাড়িতে চড়ে বসল।

তৃতীয় অধ্যায়

গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হলদে-সবুজ ব্রাউন-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশপাতা-পচা পাঁকের স্তরে ভরে-ওঠা ডোবা; তারই পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি, গোরুর গাড়ির চাকায় বিক্ষত। ওল, কচু, ঘেঁটু, মনসা, মাঝে মাঝে আসশেওড়ার বেড়া। ক্বচিৎ ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিয়ে বাঁধা কচি ধানের খেতে জল দাঁড়িয়েছে। গলি শেষ হয়েছে গঙ্গার ঘাটে। সেকালের ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে গাঁথা ভাঙা ফাটা ঘাট কাত হয়ে পড়েছে, তলায় চর পড়ে গঙ্গা গেছে সরে, কিছুদূরে তীরে ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির অভিশপ্ত ছায়ায় দেড়শ বছর আগেকার মাতৃহত্যাপাতকীর ভূত আশ্রয় নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ। অনেককাল কোনো সজীব স্বত্বাধিকারী সেই অশরীরীর বিরুদ্ধে আপন দাবি স্থাপনের চেষ্টামাত্র করে নি। দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুজোর দালান, তার সামনে শেওলা-পড়া রাবিশে এবড়োখেবড়ো প্রশস্ত আঙিনা। কিছুদূরে নদীর ধারে ভেঙে-পড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ডাঙায় তোলা পাঁজর বের-করা ভাঙা নৌকো ঝুরি-নামা বটগাছের অন্ধকার তলায়।

এইখানে দিনের শেষ প্রহরে অতীনের বর্তমান বাসস্থানে ছায়াচ্ছন্ন দালানে প্রবেশ করল কানাই গুপ্ত। চমকে উঠল অতীন, কেননা এখানকার ঠিকানা কানাইয়েরও জানবার কথা ছিল না।"

"আপনি যে!"

কানাই বললে, "গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছি।"

"ঠাট্টাটা বুঝিয়ে দেবেন।"

"ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের রসদ-জোগানদারদের সামান্য একজন। চায়ের দোকানে শনি প্রবেশ করলে; বেড়িয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চলল ওদের কুদৃষ্টি। শেষকালে ওদেরই গোয়েন্দার খাতায় নাম লিখিয়ে এলুম। নিমতলা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান।"

"চা বানানো ছেড়ে খবর বানাচ্ছেন?"

"বানালে এ ব্যবসা চলে না। বিশুদ্ধ খাঁটি খবরই দিতে হয়। যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই। তোমাদের হরেনের সাড়ে পনেরো আনা খবর ওদের কাছে পৌঁছোল, শেষ বাহুল্য খবরটা আমি দিয়েছি। সে এখন জলপাইগুড়িতে সরকারি ধর্মশালায়।"

"এবার বুঝি আমার পালা ?"

"ঘনিয়ে এসেছে। কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছে বটু। আমার অংশে যেটুকু পড়ল তাতে কিছু সময় পাবে। সাবেক বাসায় থাকতে হঠাৎ তোমার ডায়ারি হারিয়েছিল। মনে আছে ?"

"খুব মনে আছে।"

"সেটা পুলিসের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হল।"

"আপনি !"

"হাঁ, সাধু যার সংকল্প ভগবান তার সহায়। একদিন সেটা লিখছিলে, আমারই কৌশলে সরে গেলে পাঁচ মিনিটের জন্যে। সেই সময়ে সরিয়েছি।"

অতীন মাথায় হাত দিয়ে বললে, "সবটা পড়েছেন ?"

"নিশ্চিত পড়েছি। পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল দেড়টা। বাংলা ভাষায় এত তেজ এত রস তা আগে জানতুম না। ওর মধ্যে গোপনীয় কথা আছে বই কি। কিন্তু সেটা ব্রিটিশসাম্রাজ্য সম্পর্কে নয়।"

"কাজটা কি ভালো করেছেন ?"

"কত ভালো করেছি তা বলতে পারি নে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি সমস্ত খাতায় খুঁটিনাটি কথা কিছু লেখ নি, কারও নাম পর্যন্ত নেই। কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা যে, তা কোনো পেনশনভোগী মন্ত্রিপদপ্রার্থীর কলম দিয়ে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষলাভ হত। বটু যদি তোমার সঙ্গে না লাগত তাহলে ওই খাতাখানাই তোমার গ্রহস্বস্ত্যয়নের কাজ করত।"

"বলেন কী। সবটাই পড়েছেন ?"

"পড়েছি বইকি। কী বলব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তাহলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে। সত্যি কথা বলি, তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন।"

"আপনার এই ব্যবসার কথা দলের সবাই জানে ?"

"কেউ না।"

"মাস্টারমশায় ?"

"বুদ্ধিমান, আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নি, শোনেন নি আমার মুখ থেকে।"

"আমাকে বললেন যে !"

"এইটেই আশ্চর্য কথা। আমার মতো সন্দেহজীবী মানুষ কাউকে যদি বিশ্বাস না

করতে পারে তাহলে দম আটকে মরে। আমি ভাবুক নই, বোকাও নই, তাই ডায়ারি রাখি নি, যদি রাখতুম তোমার হাতে দিতে পারলে মন খোলসা হত।”

“মাস্টারমশায়—”

“মাস্টারমশায়ের কাছে খবর দেওয়া চলে কিন্তু মন খোলা চলে না। ইন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্রী আমি, কিন্তু তার সব কথা আমি যে জানি তা মনেও ক'রো না। এমন কথা আছে যা আন্দাজ করতেও সাহস হয় না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিসের পাঁশতলায়। কাজটা গর্হিত কিন্তু নিষ্পাপ। বলে রাখছি, একদিন ওরই বা আমারই সাহায্যে তোমার হাতে শেষ হাতকড়ি পড়বে, তখন কিছু মনে ক'রো না যেন। তোমার এ-বাড়িতে আসার খবর বটুই প্রথম থানার কানাকানি-বিভাগে জানিয়েছে। কাজেই আমাকে টেক্কা দিতে হল, ফোটোগ্রাফ তুলে ওদের কাছে দিয়েছি। এখন কাজের কথা বলি। চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে সময় দিচ্ছি, তার পরেও যদি এখানে থাক তাহলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রাস্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি—এর অক্ষর তোমার জানা আছে, তবু মুখস্থ করেই ছিঁড়ে ফেলো। এই দেখো ম্যাপ। রাস্তার এপাশে তোমার বাসা, ইস্কুলবাড়ির কোণের ঘরে। ঠিক সামনে পুলিসের থানা। সেখানে আছে আমার কোনো এক সম্পর্কে নাতি, রাইটর কনস্টেবল, তাকে রাঘব বোয়াল বলি। তিনপুরুষে পশ্চিমে বাস। বাংলা পড়াবার মাস্টারি পেয়েছ তুমি। সেখানে গেলেই রাঘব তোমার তোরঙ্গ ঘাঁটবে, পকেট ঝাড়া দেবে, গুঁতোগাঁতাও দিতে পারে। সেইটেকেই ভগবানের দয়া বলে মনে ক'রো। বাঙালি মাত্রই যে শ্যালকসম্প্রদায়ভুক্ত এই তত্ত্বটি রঘুবীরের হিন্দিভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তুমি তার কোনোপ্রকার রূঢ় প্রতিবাদের চেষ্টামাত্র ক'রো না, প্রাণ থাকতে এদেশে ফিরে এসো না। বাইসিক্লটা রইল বাইরে। ইশারা যখনই পাবে সেই মুহূর্তে চড়ে ব'সো। এস বাবাজি, শেষ দিনের মতো কোলাকুলি করে নিই।” কোলাকুলি হয়ে গেলে চলে গেল কানাই।

অতীন চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসন্নপতনমুখী, দীপ নিবে এসেছে। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল নির্মল ভোরের আলোয়; সেখান থেকে আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে। পথে পা বাড়াবার সময় যে পাথেয় হাতে ছিল তার কিছুই বাকি নেই; পথের শেষভাগে নিজেকে কেবলই ঠকিয়ে খেয়েছে; একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্যের যে আশ্চর্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন

অলৌকিক ; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে ; বারেবারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশপরা চুরিডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে-পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই যার অন্ত নেই।

দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। ঝিঁঝি পোকার ডাক উঠেছে প্রাঙ্গণে, কোথায় গরুর গাড়ি চলেছে তার আর্তস্বর শোনা যায়।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলা, আত্মহত্যার জন্যে একঝোঁকে মানুষ জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুথালু অন্ধবেগে। অতীন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, "অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে।"

অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে সরিয়ে ধরে ওর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, "এলী, কী কাণ্ড করলে তুমি ?"

সে বললে, "কিছু জানি নে, কী করেছি।"

"এ ঠিকানা কেমন করে জানলে ?"

এলা গভীর অভিমানে বললে, "তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাও নি।"

"যে তোমাকে জানিয়েছে সে তোমার বন্ধু নয়।"

"তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শূন্যে শূন্যে মন ঘুরে বেড়ায়, অসহ্য হয়ে ওঠে। শত্রুমিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নয়। কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো দেখি ?"

"ধন্য তুমি !"

"তুমি ধন্য অন্তু ! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে !"

"ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। ওরা আমাকে

বলে সেন্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সংকটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেন্টেই আমার অমোঘশক্তি।"

"মাস্টারমশায়ও তা জানেন।"

"এলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ভূতুড়ে পাড়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি ভদ্রমহিলা এই জায়গাটার স্বরূপ নির্ধারণ করে নি।"

"তার কারণ, বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি।"

"কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ।"

"জানি সে-কথা, মানব আমার দুর্বলতা, তবু ভাঙব নিয়ম, শুধু নিজের হয়ে না, তোমার হয়েও। প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে। সাড়া দিতে পারি নে বলে যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বলো, আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছ!"

"এত খুশি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্যে বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি।"

"না না, তোমার কেন হবে বিপদ। যা হয় তা আমার হ'ক। তাহলে আমি যাই অন্তু।"

"কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধরে রাখব। দুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক। নতুন বিস্ময়ের বসন্তী রঙে একদিন দেখেছিলুম তোমার ওই মুখ, সে আজ যুগান্তরে পিছিয়ে গেছে। আজ সেই দিনটিকে আবাহন করা যাক এই প'ড়ো ঘরটার মধ্যে। এস, আরও কাছে।"

"রসো, ঘরটা একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করি।"

"হায় রে, টাকের মাথায় চিরুনি চালাবার চেষ্টা!"

এলা একবার চারিদিক ঘুরে দেখলে। মেঝের উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বদলে বই দিয়ে ভরা একটা পুরোনো ক্যাম্বিসের থলি। লেখাপড়া করবার জন্যে একখানা প্যাকবাক্স। কোণে জলের কলসী মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে একছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল-উঠে-যাওয়া একখানা বাটি, দৈবাৎ সুযোগ ঘটলে চা খাওয়া চলে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা বড়ো চওড়া সিন্দুক, তার উপরে গণেশের একটি মাটির মূর্তি। তার থেকে প্রমাণ হয় এখানে অতীনের কোনো এক দোসর আছে। এক থাম থেকে আর-এক থাম পর্যন্ত দড়ি খাটানো, তাতে নানা রঙের ছোপ-লাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা। স্যাতসেতে ঘরে শ্বাসরুদ্ধ আকাশের বাষ্পঘন গন্ধ।

ঠিক এমন না হ'ক এই জাতের দৃশ্য এলা দেখেছে মাঝে মাঝে। কখনো বিশেষ দুঃখ পায় নি, বরঞ্চ ত্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছে। একদা এক

জঙ্গলের ধারে দেখেছিল অনিপুণ হাতে রান্নার চেষ্টায় প'ড়ো চালের খড়বাখারি জ্বালানো চুলোর ভস্মাবশেষ ; মনে হয়েছিল রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সের এ একটা অঙ্গারে আঁকা ছবি। আজ কিন্তু কষ্টে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আরামের বাহুবেষ্টনে ঘেরা ধনীর ছেলেকে অবজ্ঞা করাই এলার অভ্যস্ত। কিন্তু অতীনকে এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতে ওর মন মিশ খাওয়াতে পারে না।

এলার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে অতীন হেসে উঠল, বললে, "আমার ঐশ্বর্য দেখছ স্তম্ভিত হয়ে। তার যে বিরাট অংশটা দেখা যাচ্ছে না, সেইটেতেই তুমি বিস্মিত। আমাদের পা খোলসা রাখতে হয়—দৌড় মারবার সময় মানুষও পিছু ডাকে না, জিনিসপত্রও না। কিছুদূরে পাটকলের মজুরদের বস্তি, তারা আমাকে মাস্টারবাবু বলে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, বুঝিয়ে নেয় দেনাপাওনার রসিদ ঠিক হল কি না। এদের কোনো কোনো সন্তানবৎসলার শখ, ছেলেকে একদিন মজুরশ্রেণী থেকে হজুর-শ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, ফলফুলুরি দেয় এনে, কারও বা ঘরে গরু আছে দুধ জুগিয়ে থাকে।"

"অন্তু, কোণে ওই যে সিন্দুক আছে ওটা কার সম্পত্তি ?"

"অজায়গায় একলা থাকলেই বেশি করে চোখে পড়তে হয়। অলক্ষ্মীর ঝাঁটার মুখে রাস্তার থেকে এসে পড়েছে এই ঘরটাতে মাড়োয়ারি, তৃতীয় বারকার দেউলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে দেউলে হওয়াই ওর সর্বপ্রধান ব্যবসা। এই প'ড়ো দালানটা ওর দুজন ভাইপোর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি। তারা ভোরবেলায় ছাতু খেয়ে কাজ করতে আসে, বস্তির মেয়েদের জন্যে সস্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের সুদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু শোধ করে। ওই যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার যজ্ঞের রান্নায় ব্যবহার করি নে ; ওগুলোতে রং গোলা হয়। কাপড়গুলো তুলে রেখে যায় ওই বাক্সের ভিতর, তা ছাড়া ওতে আছে বস্তির মেয়েদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিস ;—বেলোয়ারি চুড়ি চিরুনি ছোটো আয়না পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার উপর আর প্রেতাত্মার উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর ফেরে না। কলকাতায় মাড়োয়ারি জানি নে কিসের দালালি করে। আমার ইংরেজি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল, জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হই নি। আমার আর্থিক অবস্থারও সন্ধান নেবার চেষ্টা ছিল, বুঝিয়ে দিয়েছি পূর্ব-পুরুষের ঘরে যা ছিল মজুত আজ তারই চোদ্দ আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।"

"এখানে তোমার মেয়াদ কতদিনের ?"

"আন্দাজ করছি চব্বিশ ঘণ্টা। ওই আঙিনায় রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা

সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূরদিগন্তে। আমার ছোঁয়াচ লেগেছে যে-মাড়োয়ারিকে তাকে বেড়ি-পরা মহামারীতে না পায় এই আমি কামনা করি। এখনও বিনা মূলধনে আমার ভাগ্যভাগী হবার সম্ভাবনা যে তার নেই তা বলতে পারি নে।"

"তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা ?"

"হুকুম নেই বলবার।"

"তাহলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোথায় ?"

"কল্পনা করতে দোষ কী। মানস সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।"

ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের করে এলা উলটেপালটে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই-একখানা বাংলা।

অতীন বললে, "এতদিন ওগুলো বয়ে বেড়িয়েছি পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেনসিলে চিহ্নিত তার রাস্তাগলির নির্দেশ পাবে। আর আজ! এই দেখো চেয়ে।"

এলা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, "মাপ করো, অন্তু, আমাকে মাপ করো।"

"তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী ? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।"

"যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।"

অতীন হেসে উঠে বললে, "নিজেরই পাগলামির ফুল স্টীমে এই অস্থানে পৌঁছেছি সে খ্যাতিটুকুও দেবে না আমাকে ? আমাকে নাবালকের কোঠায় ফেলে অভিভাবকগিরি করতে এলে আমি সইব না বলে রাখছি। তার চেয়ে মঞ্চ থেকে নেবে এস ; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো—এস এস বঁধু এস আধো আঁচরে বসো।"

"হয়তো বলতুম কিন্তু আজ তুমি এমন করে খেপে উঠলে কেন ?"

"খেপব না ? বললে কিনা ভুজমৃণালের জোরে তুমি আমাকে পথে বের করেছ!"

"সত্যি কথা বললে রাগ কর কেন ?"

"সত্যি কথা হল ? আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অন্দরের বেগে, তুমি উপলক্ষ্যমাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গমহিলাকে উপলক্ষ্য পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গবর্নরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হয় আমি মূঢ় তবে জাঁক করে বলব সে মূঢ়তা স্বয়ং আমারই, যাকে বলে ভগবদ্দত্ত প্রতিভা।"

"অন্তু, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি বকো না! তোমার জীবিকা আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি এ দুঃখ কখনো ভুলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হয়ে।"

"এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হল, যে-মেয়েটি রিয়ল্। একটুকুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। যে-সংসারে কাঁসার থালায় দুধভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাখা হাতে। যেখানে পোলেটিক্যাল ঠ্যাঙার গুঁতি সেখানে আলুথালু চুলে চোখদুটো পাকিয়ে এসে পড় অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকে, সহজবুদ্ধি নিয়ে নয়।"

"এত কথাও বলতে পার, অন্তু, মেয়েমানুষও তোমার কাছে হার মানে।"

"মেয়েমানুষ কথা বলতে পারে নাকি! তারা তো শুধু বকে। কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিত ভাঙব বলে একদিন মনের মধ্যে ঝ'ড়ো মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মূঢ়তার উপরেই তোমাদের জয়স্তম্ভ গাঁথতে বেরিয়েছ কেবল গায়ের জোরে।"

"তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার ভুলে তুমি ভুল কেন করলে? কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ?"

"ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে যাকে বলে জেস্‌চার। ওটা আমার নিবেদন-কালের ভাষা। যদি দুঃখ না মানতুম তাহলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে ব'লো না ওটা দেশকে ভালোবাসা।"

"দেশ এর মধ্যে নেই অন্তু?"

"দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্যের জোরে যোগ্যতা দেখিয়ে পেতে হ'ত মেয়েকে। আজ সেই মরণপণের সুযোগ পেয়েছি। সে-কথাটা ভুলে সামান্য আমার জীবিকার অভাব নিয়ে তোমার ব্যথা লেগেছে অন্নপূর্ণা!"

"আমরা মেয়েরা সাংসারিক। সংসারে অকুলোন সইতে পারি নে। আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরও আছে কিছু জমা টাকা। দোহাই তোমার, বার বার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ ক'রো না। জানি তোমার খুবই দরকার।"

"খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্যন্ত খোলা রয়েছে।"

"আমি মানছি, অন্তু, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে

ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপার্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চয়ে আমাদের অন্ধ আসক্তি। ভীতু আমরা।"

"ওটা তোমাদের সহজবুদ্ধির উপদেশ। নিঃসম্বলতায় মেয়েদের শ্রী নষ্ট হয়।"

"আমাদের ছোটো নীড়, সেখানে টুকিটাকি কিছু আমরা জমা করি। কিন্তু সে তো কেবল বাঁচবার প্রয়োজনে নয়, ভালোবাসার প্রয়োজনে। আমার যা-কিছু সমস্তই তোমার জন্যে, এ-কথা যদি বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলে বাঁচি।"

"কিছুতেই বুঝব না ও-কথাটা। আজ পর্যন্ত মেয়েরা জুগিয়েছে সেবা, পুরুষরা জুগিয়েছে জীবিকা। তার বিপরীত ঘটলে মাথা হেঁট হয়। যে-চাওয়া নিয়ে অসংকোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছ। সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিলে। বসে পড়লুম কাছে, ঝড়ের ঘা খেয়ে চিল যেমন ধুলায় পড়ে তেমনি। মার-খাওয়া মন নিয়ে এসেছিলুম। কর্তব্যের যেমন-তেমন একটা ছাপমারা জিনিসে মেয়েদের নিষ্ঠা পাণ্ডার পায়ে তাদের অটল ভক্তির মতোই, ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। মুখ তুলে চাইলে না। বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ওই সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শসুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে। দরদ লাগল না তোমার কোনোখানেই; কৃপণ, সেটুকুও দিতে পারলে না! মনে মনে বললুম, আরও বেশি দাম দিতে হবে বুঝি। একদিন ফাটা মাথা কাটা দেহ নিয়ে পড়ব মাটিতে, তখন ভেঙে-পড়া প্রাণটাকে নেবে তোমার কোলে তুলে।"

এলার চোখ ছলছলিয়ে এল, বললে, "আঃ, তোমার সঙ্গে পারি নে, অন্তু! এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না? কেড়ে নিলে না কেন আমার খাতা? বুঝতে পার না, তোমারই সংকোচ আমাকে সংকুচিত করে। অন্তু, তোমার স্বভাব এক জায়গায় মেয়েদের মতো। ইচ্ছা থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দামভাবে তার দাবি প্রকাশ করতে তোমার রুচিতে ঠেকে।"

"বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্তে মাংসে জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেয়েদের দেহে মনে একটা শুচিতার মর্যাদা আছে; তাদের দেহের সম্মানকে সশঙ্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্বপুরুষগত অভ্যাস। আমার কুণ্ঠিত মনকে একটুমাত্র প্রশ্রয় দেবার জন্যে তোমার মন যদি কখনো আর্দ্র হয় তবে আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষে চাইবার অপেক্ষা ক'রো না। আমি শিখি নি তেমন করে চাইতে। ক্ষুধার সীমা নেই, তাই বলে পেটুক হতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নেই। আমার কামনার কৌলীন্য নষ্ট করতে পারিনে।"

এলা অতীনের কাছে এসে ঘেঁসে বসল, তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে

নিজের মাথা হেলিয়ে রাখলে। কখনো কখনো আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অতীন মাথা তুলে বসে এলার হাত চেপে ধরলে। বললে, "যে-দিন মোকামায় খেয়াজাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী পিতামহী অদৃশ্য হাতে কান মলে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারি নি। তার অনতিকাল পর থেকেই মনটা কেবল আকাশকুসুম চয়ন করে বেড়াচ্ছে স্মৃতির আকাশে। সেদিনের কথা তোমার কাছে পুরোনো হয়েছে কি?"

"একটুও না।"

"তাহলে শোনো। ভারি মাল নিচের ডেক থেকে গাড়িতে নিয়ে গেছে আমার বিহারী চাকরটা। কাছে ছিল ছোটো একটা চামড়ার কেস—এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি কুলির অপেক্ষায়। নেহাত ভালোমানুষের মতো হঠাৎ কাছে এসে বললে, কুলি চান? দরকার কী! আমি নিচ্ছি।—হাঁ হাঁ করেন কী, করেন কী, বলতে বলতেই সেটা তুলে ফেললে। আমার বিপত্তি দেখে যেন পুনশ্চ নিবেদনে বললে, সংকোচ বোধ করেন তো এক কাজ করুন, আমার বাক্সটা ওই আছে তুলে নিন, পরস্পর ঋণ শোধ হয়ে যাবে।—তুলতে হল। আমার কেসের চেয়ে সাতগুণ ভারি। হাতলটা ধরে ডান হাতে বাঁ হাতে বদল করতে করতে টলতে টলতে রেলগাড়ির থার্ডক্লাস কামরায় টেনে তুললেম। তখন সিল্কের জামা ঘামে ভিজে, নিশ্বাস দ্রুত, নিস্তব্ধ অট্টহাস্য তোমার মুখে। হয়তো বা করুণা কোনো একটা জায়গায় লুকোনো ছিল, সেটা প্রকাশ করা অকর্তব্য মনে করেছিলে। সেদিন আমাকে মানুষ করবার মহৎ দায়িত্ব ছিল তোমারই হাতে।"

"ছী ছী, ব'লো না, ব'লো না, মনে করতে লজ্জা বোধ হয়। কী ছিলুম তখন, কী বোকা, কী অদ্ভুত! তখন তুমি হাসি চেপে রাখতে বলেই আমার স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। সহ্য করেছিলে কী করে? মেয়েদের কি বুদ্ধি থাকবার কোনো দরকার নেই?"

"থাক্ বা না থাক্ তাতে তো কিছু আসে যায় নি। সেদিন যে-পরিবেষের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিক্স্ নয়, লজিক্ নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শংকরাচার্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদ্গরপাত করে একটু টোল খাওয়াতে পারেন নি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ওই ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে। কী হল তার পরে? তোমার ডাক শুনলুম কানে। কিন্তু এসে পড়েছি কোথায়? তোমার থেকে কতদূরে! তুমিও কি জান তার সব বিবরণ?"

"আমাকে জানতে দাও না কেন অন্তু?"

"বারণ মানতে হয়। শুধু তাই কি? কী হবে সব কথা বলে?—আলো কমে গিয়েছে, এস আরও কাছে এস। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন, সোনার জলে রাঙানো ফ্রেমের মতো। তারই মধ্যে ছবিটিকে বাঁধিয়ে নিই নে কেন? ওই যে তোমার দুই-একগুছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্ছ, কালো পাড়-দেওয়া তসরের শাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারিদিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে পারল না বলে এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ। এই ছোটো একটি অপরূপ পরিপূর্ণতাকে চারদিকে ভ্রূকুটি করে ঘিরে আছে বড়োনামওআলা বড়োছায়া-ওআলা বিকৃতি।"

"কী বলছ, অন্তু!"

"অনেকখানি মিথ্যে। মনে পড়ছে কুলি-বস্তিতে আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়। তোমার সেই সুমহৎ অধ্যবসায়ে আমার মজা লাগল। ডিমক্রাটিক্ পিক্নিকে নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা-খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ ঘোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাকি ছিল না, আমারও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না। নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন কি, তুলো-ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না। দেখো নি তোমাদের পাড়ার খ্রীস্টশিষ্যকে, ব্রাদার বলে যাকে-তাকে বুকে চেপে ধরা তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এতে খ্রীস্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।"

"কী হয়েছে তোমার অন্তু! কোন্ ক্ষোভের মুখে এ-সব কথা বলছ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য বলে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?"

"রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকাল্চারাল ইকনমিক্স চর্চা করতে বলেন নি।"

"শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে হলে কী বলতেন, অন্তু?"

"অনেকদিন আগেই কানে কানে বলে রেখেছেন। সেই তাঁর কানে-কানে কথাটাকে মুখ খুলে বলবার ভার ছিল আমার 'পরে। নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য,

গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে। তোমাকে মুখের উপরই বলছি ওদের যে-পাড়ায় অহংকার করে নম্রতা করতে যাও সেখানে তোমারও জায়গা নেই। দেবী! সবাই দেবী তোমরা। নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ, মেয়েদের অন্য সাজেরই মতো, পুরুষ-দর্জির দোকানে বানানো।"

"দেখো অন্তু, আজও বুঝতে পারি নে যে-পথ তোমার নয়, সে-পথ থেকে কেন তুমি জোর করে ফিরে আস নি?"

"তাহলে বলি। অনেক কথা জানতুম না অনেক কথা ভাবি নি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে-সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরই অসহ্য ব্যথায় আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।"

"তারপরে কি তোমার মত বদলে গেল?"

"শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, সে উপায়বিহীন হলেও সে-ই শক্তিমানের সমকক্ষে দাঁড়ায়; তাতে তার সম্মান রক্ষা হয়। সেই সম্মানের অধিকার আমি কল্পনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল,—অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো—নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?—আমার কথা ওদের কেউ বোঝে নি তা নয়। কিন্তু কত জনই বা!"

"তখনও ওদের ছাড়লে না কেন?"

"আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চারদিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারি নে। কিন্তু একটা কথা এই অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বুঝেছি, গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি

শোচনীয় হয়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।"

"কিছুকাল থেকে এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তু। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেম কিন্তু লজ্জা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমরা কী করতে পারি বলো আমাকে।"

"সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। কিন্তু অন্তত আমাদের কজনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

"সব বুঝতে পারছি, তবু অন্তু আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্‌কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে।"

"তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে।"

"তবু বলো।"

"আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে,—তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম্ কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তর ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।"

"আচ্ছা অন্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে?"

"তা বলি নে। দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।"

এলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে, "ফিরে এস অন্তু।"

"আর ফেরবার পথ নেই।"

"কেন নেই ?"

"অজায়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।"

এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "ফিরে এস, অন্তু। এত বছর ধরে যে-বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।—অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অন্তু, একটা কথা বলো। এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।"

"উপায় নেই।"

"কেন উপায় নেই ? নিশ্চয় আছে।"

"তীর লক্ষ্য হারাতে পারে তূণে ফিরতে পারে না।"

"আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না—গান্ধর্ব বিবাহ হ'ক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।"

"বিপদের পথ হলে নিয়ে যেতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিণী করতে পারব না।—থাক্ থাক্ ও-সব কথা থাক্। এ-জীবনের নৌকো-ডুবির অবসানে কিছু সত্য এখনও বাকি আছে। তারই কথাটা শুনি তোমার মুখে।"

"কী বলব ?"

"বলো, তুমি ভালোবেসেছ।"

"হাঁ বেসেছি।"

"বলো, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সে-কথা তোমার মনে থাকবে আমি যখন থাকব না তখনও।"

এলা নিরুত্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল দুই চোখে। অনেকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললে, "আবার বলছি, অন্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে—নাও এই আমার গলার হার।"

এই বলে পায়ের উপর রাখল হার।

"কিছুতেই না।"

"কেন, অভিমান ?"

"হাঁ, অভিমান। এমন দিন ছিল তখন যদি দিতে, পরতুম গলায়—আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্তটার মধ্যে। ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে।"

এলা অতীনের পায়ের কাছে লুটিয়ে বললে, "নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করে।"

"লোভ দেখিয়ো না, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়।"

"তবে সে-পথ তোমারও নয়। ফিরে এস, ফিরে এস।"

"পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।"

"অন্ত, নিশ্চয় জেনো, তুমি চলে গেলে একমুহূর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ-কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।"

হঠাৎ অতীন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ্ণ হুইস্‌লের শব্দ এল দূর থেকে। চমকে বলে উঠল, "চললুম।"

এলা তাকে জড়িয়ে ধরলে, বললে, "আর-একটু থাকো।"

"না।"

"কোথায় যাচ্ছ ?"

"কিচ্ছু জানি নে।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না।"

একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয়বার হুইস্‌লের শব্দ এল। অতীন গর্জন করে বললে, "ছেড়ে দাও।" বলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পেল, "এলা।"

চমকে উঠে বসল। দেখলে ইলেকট্রিক টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ফিরিয়ে আনুন অন্তকে।"

"সে-কথা থাক্‌। এখানে কেন এলে ?"

"বিপদ আছে জেনেই এসেছি।"

তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে ইন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে ? এখানকার খবর তোমাকে কে দিলে ?"

"বটু।"

"তবু বুঝলে না মতলব ?"

"বোঝবার বুদ্ধি আমার ছিল না। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।"

"তোমাকে মারতে পারলে এখনই মারতুম। যাও ঘরে ফিরে। ট্যাক্সি আছে বাইরে।"

চতুর্থ অধ্যায়

"আবার অখিল!—পালিয়েছিস বোর্ডিং থেকে! তোর সঙ্গে কোনোমতে পারবার জো নেই। বারবার বলছি, এ-বাড়িতে খবরদার আসিস নে। মরবি যে।"

অখিল কোনো উত্তর না দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে, "একজন দাড়িওআলা কে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে ঢুকল। তাই তোমার এ-ঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম।—ওই শোনো পায়ের শব্দ।" অখিল তার ছুরির সব-চেয়ে মোটা ফলাটা খুলে দাঁড়াল।

এলা বললে, "ছুরি খুলতে হবে না তোমাকে, বীরপুরুষ। দে বলছি।" ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিলে।

সিঁড়ি থেকে আওয়াজ এল, "ভয় নেই, আমি অন্তু।"

মুহূর্তে এলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এল—বললে, "দে দরজা খুলে।"

দরজা খুলে দিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করলে, "সেই দাড়িওআলা কোথায়?"

"দাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে বাগানে, বাকি মানুষটাকে পাবে এইখানেই। যাও খোঁজ করো গে দাড়ির।" অখিল চলে গেল।

এলা পাথরের মূর্তির মতো ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, "অন্তু, এ কী চেহারা তোমার?"

অতীন বললে, "মনোহর নয়।"

"তবে কি সত্যি?"

"কী সত্যি?"

"তোমাকে সর্বনেশে ব্যামোয় ধরেছে।"

"নানা ডাক্তারের নানা মত, বিশ্বাস না করলেও চলে।"

"নিশ্চয় তোমার খাওয়া হয় নি।"

"ও কথাটা থাক্। সময় নষ্ট ক'রো না।"

"কেন এলে, অন্তু, কেন এলে? এরা যে তোমাকে ধরবার অপেক্ষায় আছে।"

"ওদের নিরাশ করতে চাই নে।"

অতীনের হাত চেপে ধরে এলা বললে, "কেন এলে এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে। এখন উপায় কী?"

"কেন এলুম সেই কথাটা যাবার ঠিক আগেই বলে চলে যাব। ইতিমধ্যে

যতক্ষণ পারি ওই কথাটাই ভুলে থাকতে চাই। নিচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি গে।"

খানিক পরে উপরে এসে বললে, "চলো ছাদে। নিচের তলাকার আলোর বাল্‌ব-গুলো সব খুলে নিয়েছি। ভয় পেয়ো না।"

দুজনে ছাদে এসে ছাদে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ দরজায় ঠেসান দিয়ে বসল অতীন, এলা বসল তার সামনে।

"এলা, মন সহজ করো। যেন কিছু হয় নি, যেন আমরা দুজনে আছি লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হবার আগে সুন্দরকাণ্ডে। তোমার হাত অমন বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন? কাঁপছে যে। দাও গরম করে দিই।"

এলার হাত দুখানি নিয়ে অতীন জামার নিচে বুকের উপর চেপে রাখলে। তখন দূরের পাড়ায় বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে।

"ভয় করছে, এলী?"

"কিসের ভয়?"

"সমস্ত কিছুর। প্রত্যেক মুহূর্তের।"

"ভয় তোমার জন্যে, অন্তু, আর কিছুর জন্যে নয়।"

অতীন বললে, "এলী, মনে করতে চেষ্টা করো আমরা আছি পঞ্চাশ কি এক-শ বছর পরেকার এমনি এক নিস্তব্ধ রাতে। উপস্থিতের গণ্ডিটা নিতান্ত সংকীর্ণ, তার মধ্যে ভয়ভাবনা দুঃখকষ্ট সমস্তই প্রকাণ্ডতার ভান করে দেখা দেয়। বর্তমান সেই নীচ পদার্থ যার ছোটো মুখে বড়ো কথা। ভয় দেখায় সে মুখোশ পরে—যেন আমরা মুহূর্তের কোলে নাচানো শিশু। মৃত্যু মুখোশখানা টান মেরে ফেলে দেয়। মৃত্যু অত্যুক্তি করে না। যা অত্যন্ত করে চেয়েছি তার গায়ে মোটা অঙ্কের দাম লেখা ছিল বর্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত করে হারিয়েছি তার গায়ে দুদিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম দুঃখ। মিথ্যে কথা! জীবনটা জালিয়াত, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহ-রাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কখনো মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা?"

"তোমার মতো বড়ো করে দেখবার শক্তি আমার নেই অন্তু,—তবু তোমাদের কথা মনে করে উদ্বেগে যখন অভিভূত হয়ে পড়ে মন,—তখন এই কথাটা খুব নিশ্চিত করে অনুভব করতে চেষ্টা করি যে মরা সহজ।"

"ভীরু, মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন? মৃত্যু সব-চেয়ে নিশ্চিত—জীবনের সব গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্যমিথ্যা ভালোমন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। এইরাত্রে এখনই আমরা আছি সেই বিরাটের প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে আমরা দুজনে—মনে পড়ছে ইবসেনের চারিটি লাইন—

Upwards
Towards the peaks,
Towards the stars,
Towards the vast silence."

এলা অতীনের হাত কোলে নিয়ে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ অতীন হেসে উঠল। বললে, "পিছনে মরণের কালো পর্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কৌতুকনাট্য নেচে চলছে অন্তিম অঙ্কের দিকে। তারই একটা ছবি আজ দেখো চেয়ে। আজ তিন বছর আগে এই ছাদের উপর তুমি আমার জন্মদিনের উৎসব করেছিলে, মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"তোমার ভক্ত ছেলের দল সবাই এসেছিল। ভোজের আয়োজন ঘটা করে হয় নি। চিঁড়ে ভেজেছিলে সঙ্গে ছিল কলাইশুঁটি সিদ্ধ, মরিচের গুঁড়ো ছিটানো, ডিমের বড়াও ছিল মনে পড়ছে। সবাই মিলে খেল কাড়াকাড়ি করে। হঠাৎ মতিলাল হাতপা ছুঁড়ে শুরু করলে, আজ নবযুগে অতীনবাবুর নবজন্মের দিন—আমি লাফ দিয়ে উঠে তার মুখ চেপে ধরলুম, বললুম, বক্তৃতা যদি কর, তবে তোমার পুরোনো জন্মের দিনটা এইখানেই কাবার। বটু বললে, ছী ছী অতীনবাবু, বক্তৃতার ভ্রূণহত্যা?—নবযুগ, নবজন্ম, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাঁধাবুলিগুলো শুনলে আমার লজ্জা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে,—কিছুতে রং ধরল না।"

"অন্ধ, নির্বোধ আমি; আমিই ভেবেছিলুম তোমাকে মিলিয়ে নেব আমাদের সকল পদাতিকের সঙ্গে এক উর্দি পরিয়ে।"

"তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিয়ানা করতে। ভেবেছিলে আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ঈর্ষার প্রয়োজন আছে। স্নেহযত্ন কুশলসম্ভাষণ বিশেষ মন্ত্রণা অনাবশ্যক উদ্বেগ মনিহারির রঙিন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিয়ে রেখেছিলে তোমার পসরায়। আজও তোমার করুণ প্রশ্ন কানে শুনতে পাচ্ছি, নন্দকুমার তোমার চোখমুখ লাল দেখছি কেন। বেচারা ভালোমানুষ, সত্যের অনুরোধে মাথাধরা অস্বীকার করতে না-করতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার জলপটি এসে উপস্থিত। আমি মুগ্ধ তবু

বুঝতুম এই অতি অমায়িক দিদিয়ানা তোমার অতি পবিত্র ভারতবর্ষের বিশেষ ফরমাশের। একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।”

“আঃ চুপ করো, চুপ করো অন্ত।”

“অনেক বাজে জিনিসের বাহুল্য ছিল সেদিন তোমার মধ্যে, অনেক হাস্যকর ভড়ং— সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।”

“মানছি, মানছি এক-শবার মানছি। তুমিই সে সমস্ত নিঃশেষে ঘুচিয়ে দিয়েছ। তবে আজ আবার অমন নিষ্ঠুর করে বলছ কেন?”

“কোন্ মনস্তাপে বলছি, শোনো। জীবিকা থেকে ভ্রষ্ট করেছ বলে সেদিন আমার কাছে মাপ চাইছিলে। যথার্থ জীবনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি অথচ সেই সর্বনাশের পরিবর্তে যা দাবি করতে পারতুম তা মেটে নি। আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না; এজন্যে মাপ চাওয়া কি বাহুল্য ছিল? জানি তুমি ভাবছ, এতটা কী করে সম্ভব হল।”

“হাঁ অন্তু, আমার বিস্ময় কিছুতেই যায় না—জানি নে আমার এমন কী শক্তি ছিল।”

“তুমি কী করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ওই আঙুলগুলি, সত্যমিথ্যে সব-কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানি নে, কী মোহের বেগে, ধিক্‌কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্খলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধি-অভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না। এবার জাল ছেঁড়বার সময় এল, তাই আজ বলব তোমাকে সত্য কথা, যত কঠোর হ'ক।”

“বলো, বলো, যা বলতে হয় বলো। দয়া ক'রো না আমাকে। আমি নির্মম, নির্জীব, আমি মূঢ়—তোমাকে বোঝবার শক্তি আমার কোনোকালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মূল্য দিই নি। বহুভাগ্যের ধন চিরজন্মের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শাস্তি যদি থাকে, দাও শাস্তি।”

“থাক্, থাক্, শাস্তির কথা। ক্ষমাই করব আমি। মৃত্যু যে ক্ষমা করে সেই অসীম ক্ষমা। সেইজন্যেই আজ এসেছি।”

“সেইজন্যে?”

“হাঁ কেবলমাত্র সেইজন্যে।”

“না-ই ক্ষমা জানাতে তুমি। কিন্তু কেন এলে এমন করে বেড়া আগুনের মধ্যে?

জানি, জানি, বাঁচবার ইচ্ছে নেই তোমার। তা যদি হয় তাহলে কটা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেষ অধিকার। পায়ে পড়ি তোমার।"

"কী হবে সেবা! ফুটো জীবনের ঘটে ঢালবে সুধা! তুমি জান না, কী অসহ্য ক্ষোভ আমার। শুশ্রূষা দিয়ে তার কী করতে পার, যে-মানুষ আপন সত্য হারিয়েছে!"

"সত্য হারাও নি অন্তু। সত্য তোমার অন্তরে আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।"

"হারিয়েছি, হারিয়েছি।"

"ব'লো না ব'লো না অমন কথা।"

"আমি যে কী যদি জানতে পারতে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠত।"

"অন্তু, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুলছ কল্পনায়+ নিষ্কামভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।"

"স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না। পাণিগ্রহণ! এই হাত নিয়ে! কিন্তু কেন এ-সব কথা! সমস্ত কালো দাগ মুছবে যমকন্যার কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি। আজ বলা যাক্ যত সব হালকা কথা হাসতে হাসতে। সেই জন্মদিনের ইতিবৃত্তটা শেষ করে দিই। কী বল, এলী?"

"অন্তু, মন দিতে পারছি নে।"

"আমাদের দুজনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা-কিছু আছে সে কেবল ওইরকম গোটাকয়েক হালকা দিনের মধ্যে। ভোলবার যোগ্য ভারি ভারি দিনই তো বহুবিস্তর।"

"আচ্ছা, বলো অন্তু।"

"জন্মদিনের খাওয়া হয়ে গেল। হঠাৎ নীরদের শখ হল পলাশির যুদ্ধ আবৃত্তি করবে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গিরিশ ঘোষের ভঙ্গিতে আউড়িয়ে গেল—

> কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ,
> বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমণি।

নীরদ লোক ভালো, অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু নির্দয় তার স্মরণশক্তি। সভাটা ভেঙে ফেলবার জন্যে আমার মন যখন হন্যে হয়ে উঠেছে তখন ওরা ভবেশকে গান গাইতে অনুরোধ করলে। ভবেশ বললে, হার্মোনিয়ম সঙ্গে না থাকলে ও হাঁ করতে পারে না।—তোমার ঘরে ওই পাপটা ছিল না। ফাঁড়া কাটল। আশান্বিত মনে

ভাবছি এইবার উপসংহার, এমন সময় সতু খামকা তর্ক তুললে, মানুষ জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে ? যত বলি থামো সে থামে না। তর্কের মধ্যে দেশাত্মবোধের ঝাঁজ লাগল, চড়তে লাগল গলার আওয়াজ, বন্ধুবিচ্ছেদ হয় আর কি। বিষম রাগ হল তোমার উপরে। আমার জন্মদিনকে একটা সামান্য উপলক্ষ্য করেছিলে, মহত্তর লক্ষ্য ছিল কর্মভাইদের একত্র করা।"

"কোন্‌টা লক্ষ্য কোনটা উপলক্ষ্য বাইরে থেকে বিচার ক'রো না অন্তু। শাস্তির যোগ্য আমি, কিন্তু অন্যায় শাস্তির না। মনে নেই তোমার, সেইবারকার জন্মদিনেই অতীন্দ্রবাবু আমার মুখে নাম নিলেন অন্তু ? সেটা তো খুব ছোটো কথা নয়। তোমার অন্তু নামের ইতিহাসটা বলো শুনি।"

"সখী, তবে শ্রবণ করো। তখন বয়স আমার চার পাঁচ বছর, মাথায় ছিলুম ছোটো, কথা ছিল না মুখে, শুনেছি বোকার মতো ছিল চোখের চাহনি। জ্যেঠামশায় পশ্চিম থেকে এসে আমাকে প্রথম দেখলেন। কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এই বালখিল্যটার নাম অতীন্দ্র রেখেছে কে? অতিশয়োক্তি অলংকার, এর নাম দাও অনতীন্দ্র। সেই অনতি শব্দটা স্নেহের কণ্ঠে অন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার কাছেও একদিন অতি হয়েছে অনতি, ইচ্ছে করে খুইয়েছে মান।"

হঠাৎ অতীন চমকে উঠে থেমে গেল। বললে, "পায়ের শব্দ শুনছি যেন।"

এলা বললে, "অখিল।"

আওয়াজ এল, "দিদিমনি।"

ছাদে আসবার দরজা খুলে দিয়ে এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী।"

অখিল বললে, "খাবার।"

বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই। অদূরবর্তী দিশি রেস্‌টোরাঁ থেকে বরাদ্দমত খাবার দিয়ে যায়।

এলা বললে, "অন্তু, চলো খেতে।"

"খাওয়ার কথা ব'লো না। না খেয়ে মরতে মানুষের অনেকদিন লাগে। নইলে ভারতবর্ষ টিঁকত না। ভাই অখিল, আর রাগ রেখো না মনে। আমার ভাগটা তুমিই খেয়ে নাও। তার পরে পলায়নেন সমাপয়েৎ—দৌড় দিয়ো যত পার।"

অখিল চলে গেল।

দুজনে ছাদের মেঝের উপর বসল। অতীন আবার শুরু করলে। "সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, ওটা একটা ইঙ্গিত রাতকানাদের কাছে। শেষকালে তোমাকে বললুম,

সকাল সকাল তোমার শুতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছ। —প্রশ্ন উঠল, 'কটা বেজেছে?' উত্তর 'সাড়ে দশটা।' সভা ভাঙবার দুটো-একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বললে, বসে রইলেন যে অতীনবাবু? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক্।—কোথায়? না, মেথরদের বস্তিতে; হঠাৎ গিয়ে পড়ে ওদের মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।—সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বললুম, মদ তো বন্ধ করবে, তার বদলে দেবে কী।—বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না। ফল হল, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হল—আপনি কি তবে বলতে চান—তীব্রস্বরে বলে উঠলুম—কিছু বলতে চাই নে।—এতটা বেশি ঝাঁজও বেমানান হল। গলা ভারি করে তোমার দিকে আধখানা চোখে চেয়ে বললুম, তবে আজ আসি। দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্যন্ত এসে পা চলতে চায় না। কী বুদ্ধি হল বুকের পকেট চাপড়িয়ে বললুম, ফাউন্টেন পেনটা বুঝি ফেলে এসেছি। বটু বললে, আমিই খুঁজে আনছি—বলেই দ্রুত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি। খানিকটা খোঁজবার ভান করে বটু ঈষৎ হেসে বললে, দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানতুম আমার ফাউন্টেন পেনটা আবিষ্কার করতে হলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার নিজের বাসাতেই। স্পষ্ট বলতে হল, এলাদির সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বটু বললে, বেশ তো অপেক্ষা করছি। আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও। বটু ঈষৎ হেসে বললে, রাগ করেন কেন অতীনবাবু, আমি চললুম।"

আবার পায়ের শব্দ শুনে অতীন চমকে উঠে থামল। অখিল এল ছাদে। বললে, "কে একজন এই চিরকুট দিয়েছে অতীনবাবুকে। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

এলার বুক ধড়াস করে উঠল, বললে, "কে এল?"

অতীন বললে, বাবুকে ঢুকতে দাও ঘরে।" অখিল জোরের সঙ্গে বললে, "না, দেব না।"

অতীন বললে "ভয় নেই, বাবুকে তুমি চেন; অনেকবার দেখেছ।"

"না চিনি নে।"

"খুব চেন। আমি বলছি, ভয় নেই, আমি আছি।"

এলা বললে, "অখিল, যা তুই মিথ্যে ভয় করিস নে।"

অখিল চলে গেল।

এলা জিজ্ঞাসা করলে, "বটু এসেছে না কি?"

"না বটু নয়।"

"বলো না, কে এসেছে। আমার ভালো লাগছে না।"

"থাক্‌ সে-কথা, যা বলছিলুম বলতে দাও।"

"অন্তু, কিছুতেই মন দিতে পারছি নে।"

"এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী। বেশি দেরি নেই।—তুমি উঠে এলে ছাদে। মৃদুগন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছটি সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে একলা আমার হাতে দেবে বলে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তুর জীবনলীলা শুরু হল এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তার পর থেকে অতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি গাম্ভীর্য ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলস্পর্শ আত্মবিস্মৃতিতে। সেইদিন প্রথম তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, বললে, এই নাও জন্মদিনের উপহার—সেই পেয়েছি প্রথম চুম্বন। আজ দাবি করতে এসেছি শেষ চুম্বনের।"

অখিল এসে বললে, "বাবুটি দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছে। ভাঙল বুঝি। বলছে, জরুরি কথা।"

"ভয় নেই অখিল, দরজা ভাঙবার আগেই তাকে ঠাণ্ডা করব। বাবুকে ওইখানেই অনাথ করে রেখে তুমি এখনই পালাও অন্য ঠিকানায়। আমি আছি এলাদির খবর নিতে।"

এলা অখিলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললে, "সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জন্যে কখানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্বাদ। আমার পা ছুঁয়ে বল্‌, এখনই তুই যাবি, দেরি করবি নে।"

অতীন বললে, "অখিল আমার একটি পরামর্শ তোমাকে শুনতেই হবে। যদি তোমাকে কখনো কোনো প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি ঠিক কথাই বলবে। ব'লো এই রাত এগারোটার সময় আমিই তোমাকে জোর করে এ-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। চলো কথাটাকে সত্য করে আসি।"

এলা আর-একবার অখিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, "আমার জন্যে ভাবিস নে ভাই। তোর অন্তুদা রইল, কোনো ভয় নেই।"

অখিলকে যখন ঠেলে নিয়ে অতীন চলেছে এলা বললে, "আমিও যাই তোমার সঙ্গে অন্তু।"

আদেশের স্বরে অতীন বললে, "না, কিছুতেই না।"

ছাদের ছোটো পাঁচিলটার উপর বুক চেপে ধরে এলা দাঁড়িয়ে রইল—কণ্ঠের কাছে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল কান্না, বুঝলে আজ রাত্রে ওর কাছ থেকে চিরকালের মতো অখিল গেল চলে।

ফিরে এল অতীন। এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী হল, অন্তু ?"

অতীন বললে "অখিল গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।"

"আর সেই লোকটি ?"

"তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। সে বসে বসে ভাবছিল কাজে ফাঁকি দিয়ে আমি বুঝি কেবল গল্পই করছি। যেন নতুন একটা আরব্য উপন্যাস শুরু হয়েছে। আরব্য উপন্যাসই বটে, সমস্তটাই গল্প, একেবারেই আজগবি গল্প। ভয় করছে এলা ? আমাকে ভয় নেই তোমার ?"

"তোমাকে ভয়, কী যে বল।"

"কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ীর গ্রামসম্পর্কে চেনা লোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি ? তার পরে বুড়ীকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁছেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণাভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেইজন্য পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মারফত সে-মকদ্দমা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিশনরের কাছ থেকে সেই হুকুম আনাবে ব'লে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে, কাল ধরা পড়বই। ইতিমধ্যে ভয় ক'রো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আত্মার কালো ভূতটাকে। আজ তোমার ঘরে কেউ নেই।"

"কেন, তুমি আছ।"

"আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে ?"

"নেই বা বাঁচালে।"

"তোমারই আপন মণ্ডলীতে একদিন যারা ছিল এলাদির সব দেশভাই—ভাইফোঁটা দিয়েছ যাদের কপালে প্রতিবৎসর—তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়।"

"তাদের চেয়ে বেশি অপরাধ আমি কী করেছি ?"

"অনেক কথা জান তুমি, অনেকের নামধাম। পীড়ন করলে বেরিয়ে পড়বে।"

"কখনোই না।"

"কী করে বলব যে-মানুষটা এসেছিল আজ, এই হুকুম নিয়েই সে আসে নি? হুকুমের জোর কত সে তো জান তুমি।"

এলা চমকে উঠে বললে, "সত্যি বলছ অন্তু, সত্যি?"

"একটা খবর পেয়েছি আমরা।"

"কী খবর?"

"আজ ভোররাত্রে পুলিস আসবে তোমাকে ধরতে।"

"নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিস আমাকে ধরতে আসছে।"

"কেমন করে জানলে?"

"কাল বটুর চিঠি পেয়েছি, সে খবর দিয়েছে পুলিস আমাকে ধরবে, লিখেছে—সে এখনও আমাকে বাঁচাতে পারে।"

"কী উপায়ে?"

"বলছে, যদি আমি তাকে বিয়ে করি তাহলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।"

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মুখ, জিজ্ঞাসা করলে, "কী জবাব দিলে তুমি?"

এলা বললে, "আমি সেই চিঠির উপরে কেবল লিখে দিলুম পিশাচ। আর-কিছু নয়।"

"খবর পেয়েছি, সেই বটুই আসবে কাল পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের সঙ্গে রফা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।" মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে, "মারো এইবার মারো।" ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বললে, "একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।"

অতীন কঠিন স্বরে বললে, "যাও এখনই শুতে যাও, হুকুম করছি শুতে যাও।"

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগল।—"অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা,

আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।"

অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বললে, "শোও, এখনই শোও। ঘুমোও।"

"ঘুম হবে না।"

"ঘুমোবার ওষুধ আছে আমার হাতে।"

"কিচ্ছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোফর্ম এনেছ? দাও ওটাকে ফেলে। ভীরু নই আমি; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল অন্তু। অন্তু।"

দূরের থেকে হুইস্‌লের শব্দ এল।

ক্যাণ্ডি, সিংহল
৫ জুন, ১৯৩৪

প্রবন্ধ

ধর্ম

উৎসব

সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন—এইজন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খণ্ডপদার্থ প্রত্যেক খণ্ডঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি—তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই—

> নিখিলে তব কী মহোৎসব। বন্দন করে বিশ্ব
> শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ—সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা—মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা সুকঠিন সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই স্বার্থপরতার সুদৃঢ় জালকে অনায়াসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না—তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে-পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি—আমরা ভাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, ভাইয়ের জন্য ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে, আমরা যে-সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্টপরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর ধনিদরিদ্র পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য—এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে-সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই; তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কারণ তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদ্‌পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ—তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য অস্ফুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ তাহার প্রেম উদ্বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই—কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই যে যাহা-কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে—এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ—এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগৎ-প্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকুমাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝরনা আকাশময় ঝরিয়া

পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রযোজন যতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া ফুল ফুটিয়া পাতা গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশিরাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাখিদের শত শত কণ্ঠ হইতে উদ্গিরিত স্বরের উচ্ছ্বাসে অরুণগগনে যেন চারিদিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ,—সৌন্দর্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্যের দিন।

আজ সৌন্দর্যের দিন। সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে—সেই যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর কাহারই বা কী। কিন্তু একদিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর একদিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব—ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধিদ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক

অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন—ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মতো ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এদিনেও তুচ্ছ কৌতূহলে আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে?

হায়, প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, একদিনে সে ঐশ্বর্যলাভ করিবে কী করিয়া? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্বাসিত, হঠাৎ একদিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে-প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব। হে বিশ্বযজ্ঞপ্রাঙ্গণের উৎসব-দেবতা, আমি কে? আজি উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কী আছে? জীবনের নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনাবাঁধানো ঘাটে আসিয়া আজও পৌঁছিয়াছে? তাহার বাধা কি একটি? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে? প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল? দিনের পর দিন কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে অন্তর্যামিন্, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া তুমিই তাহাকে আহ্বান করো। একদিন নহে, প্রত্যহ তাহাকে আহ্বান করো। ফিরাও, ফিরাও, তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও। দুর্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করো। বুদ্ধির

জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চির-জীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলো। যে মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহূত, যাঁহারা প্রতিদিনই নিখিললোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্রনতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে দাও। তাহার মিথ্যা গর্ব, তাহার ব্যর্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই তুমি অপসারিত করিয়া দাও—কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্বনিম্নস্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসব-সভার মহাসংগীত সেখানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উৎসের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহংকার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত—সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্তলিখিত আলোক-লিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে তোমার উদার বায়ু নিঃশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণপ্রাসাদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করো—তোমার উৎসব-প্রাঙ্গণের ধুলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক, কেহই না মানুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে তাহা তুমিই জান—আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে—সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক যাচ্ঞাবাক্যের দ্বারা অপমান না করে।

১৩১২

দিন ও রাত্রি

সূর্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমান্তের শেষ স্বর্ণ-লেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

এই যে, দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কী রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে? এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোনো বৃহৎ অর্থ নাই? আমরা এই যে অনন্ত গগনতলের নাড়িস্পন্দনের ন্যায় দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থানপতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না? তটভূমির উপরে প্রতি বর্ষায় যে একটা জলপ্লাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া উঠিয়া শস্যবপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—এই বর্ষা ও শরতের গতায়াত তট-ভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না?

দিনের পর এই যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাসবশত যেন বঞ্চিত না হই। সূর্য একসময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়—রাত্রি নিঃশব্দকরে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষনেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।

এই অল্পকালের পরিবর্তন কী বিপুল, কী আশ্চর্য। কী অনায়াসে মুহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পদার্পণ করে। অথচ মাঝখানে কোনো বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই, একের অবসান ও অন্যের আরম্ভের মধ্যে কী স্নিগ্ধ শান্তি, কী সৌম্য সৌন্দর্য।

দিনের আলোকে, সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড়ো হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে—আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিস্ফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন-আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টার সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তখন আমাদের আপন-আপন কর্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ

ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম—এবং নিজ নিজ কর্মোদ্‌যোগের আকর্ষণই জগতের আর সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দপদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্যপ্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে—তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য, তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব—দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে, অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জিনিস আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে,—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল, প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালোবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে, আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম;—প্রেমহীন যে বিরাম, তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ মিলন। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়—তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়—আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে, তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি।

দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইজন্য রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোক-নির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্‌যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্লান্তি সুপ্তিসুধার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তব্ধ মহান্ধকারগর্ভ হইতে এক-একটি উজ্জ্বল দিবস নীলসমুদ্র হইতে এক-একটি ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় একবার আকাশে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গন-পাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না—শোনে না, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অনুভব করে—সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক—স্তব্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব নিজের শক্তি নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক-পৃথক করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের

নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিদ্রাভ্যাগত নিখিলজননীর অনিমেষদৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রকাশমান হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃতনিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ভিখারি হইয়া দাঁড়াই—বলি, জননী, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, কর্মের শক্তি, পথের পাথেয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না—কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ করো, মার্জনা করো, গ্রহণ করো। তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্বজগৎ যখন কাল উজ্জ্বল বেশে নির্মলললাটে প্রভাত-আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি—তখন যেন আমার গ্লানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়—তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি—সকলের কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক, যেন বলিতে পারি—সকলে মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতেছি,—তাঁহার যাহা প্রসাদ, তিনি অদ্য সমস্তদিন আমাকে যাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে-রাত্রে এই যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে—একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন, একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অখিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যচ্ছবি আলোক-অন্ধকারের তুলিকাপাতে প্রতিদিন বিচিত্র হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি—কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ংগম করি না, আমরা কেবল অবসানেরই দিকটা দেখিয়া বিষাদের নিঃশ্বাস ফেলি, পরিপূরণের দিকটা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত বড়ো যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্যয়দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে

তো কিছুই বিস্রিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া তো হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশ্বাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে। দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজ্জল্যমান করিয়া তুলে, আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দিকে তেমনি একটি বেষ্টন রচনা করে,—সেইজন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু, তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড়ো যে আর-কিছু আছে, তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও তো আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই? যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য-সমস্তকে বিশুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ময় বিচিত্ররহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই? যে চেতনা যে বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকট অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্তা, যখন সংসারই সর্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখদুঃখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য অস্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে, মৃত্যু আমাদিগকে অকূলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলই অভাব, কেবলই শূন্যতা? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক করিয়া পৃথক করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা আমাদের

জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, নিজের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ, পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে, লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে। তাই আমরা কিছুই জানি না কোথা হইতে এই নিঃশেষ-বিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্যসঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ-জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত-করস্পর্শে মুছিয়া গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য লাভ করে, জানি না, কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতের এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্‌যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চলশক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতিমুহূর্তে বলপ্রেরণ প্রতিমুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড়ভাবে নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্বপ্রয়োগের অহংকারসুখকে খর্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান করুক।

হে বিরাম-বিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে

জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জন দিব; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব; কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব; কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমারি সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব, যে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।

ওই দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতীরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎরূপে দেখা দেয়।—কিন্তু আকাশের ওই যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়,—তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন তো কিছুই নহে, তোমার অন্ধকার বসনাঞ্চলতলে তোমার অবনত স্থিরদৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপাননিরত সুপ্তশিশুর মতো নিশ্চল নিস্তব্ধ। তোমার বিরাট ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের দুঃসহ তীব্রতেজ মাধুর্যরূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না,—তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, সমস্ত শান্ত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ করো—আমাকে রক্ষা করো,

যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও; আমি সংসারে জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই; আমি সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, সুখদুঃখকে তোমার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে চাই। মৃত্যু যখন আমার কর্মশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া নীরবসংকেতে আহ্বান করিবে, তখন যেন তাহার অনুসরণ করিয়া, জননী, তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্কহৃদয়ের মধ্যে আমি ক্ষমা লইয়া যাই, প্রীতি লইয়া যাই, কল্যাণ লইয়া যাই—বিরোধের সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যাস্নানে জুড়াইয়া যায়, সমস্ত বাসনার পঙ্ক যেন ধৌত হয়, সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি। যদি সে অবকাশ না ঘটে, যদি ক্ষুদ্রবল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবু তোমার বিশ্ববিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া যেন দিন হইতে রাত্রে, জীবন হইতে মৃত্যুতে, আমার অক্ষমতা হইতে তোমার

করুণার মধ্যে একান্তভাবে আত্মবিসর্জন করিতে পারি। ইহা যেন মনে রাখি—জীবনকে তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও তুমিই আমার প্রিয় করিবে,—তোমার দক্ষিণহস্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলে, তোমার বামহস্তে তুমি আমাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইবে,—তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার অন্ধকার আমাকে শান্তি দিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৩১০

মনুষ্যত্ব

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" উত্থান করো, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না—কিন্তু "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই বাক্য বারবার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা প্রত্যেক দুঃখ প্রত্যেক বিচ্ছেদ কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে-ঝংকার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,"—উত্থান করো, জাগ্রত হও। অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নবজাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল—তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠো!' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধস্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্য কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোনো অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ-সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে, আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না? সে তাহার সমস্ত দলগুলি সংকুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কী আঁকড়িয়া রাখিতেছে? প্রভাতে তরুণ সূর্য আসিয়া অরুণকরে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পক-কিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া

দিয়াছি, তুমি তেমন সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবারিত করিয়া দাও।' রজনী নিঃশব্দপদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীর-তলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও—আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন করো।' নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো, এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো।'

কিন্তু বাধার অন্ত নাই—প্রভাতে ফুলের মতো করিয়া এমন সহজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারিদিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, ব্যর্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুষ্পের মতো আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কত পর্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘযাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না,—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে, নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা দ্বারা আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত, তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না—বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে—সংসারে দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে, সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা। মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং

ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্‌ অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সংকীর্ণ—মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্বচনীয়—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্বসম্বন্ধে জাগ্রত-সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ,

ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে আমাদের আনন্দ নাই।

যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরমদুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না—যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের ঊর্ধ্বে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজন্য উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই আত্মা (জীবাত্মাই বল, পরমাত্মাই বল) ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন।

সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ্য ঘটে, ততই আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

এইজন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে।

মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এইজন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে,

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধলাভ করো।
সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।

অতএব প্রভাতে যখন বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন দুঃসহ দুঃখ আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখির গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার -তাহার সংগ্রামক্ষেত্র—সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মানুষ মহৎ, কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি, তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্যদিকে সুদীর্ঘতটনিরুদ্ধ অবিরাম-যুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে একদিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্যদিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
যে-যে কর্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি

একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কী? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে,—যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের—সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মুক্তিলাভ করিতেছে—এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানাদুঃখের এক আনন্দ-অবসান,—ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝংকার একটি আনন্দসংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ—প্রীতিমাত্রই কষ্টদ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে, তখন আমাদের সংসারধর্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংকৃত করিবে; ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই—বল রক্ষা হয় না, আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব, তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অমৃতসমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করো।

১৩১০

ধর্মের সরল আদর্শ

আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জ্বালিতে হয়, তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়—সেটুকুর জন্য কতলোকের উপর আমার নির্ভর। কোথায় সর্ষপ-বপন হইতেছে, কোথায় তৈল-নিষ্কাশন চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয়-বিক্রয়—তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত উদ্‌যোগ—এত জটিলতায় যে আলোকটুকু পাওয়া যায় তাহা কত অল্প। তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না,—তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না, কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

যদি কেহ বলে প্রভাতের আলোককে দর্শন করিবার জন্য একটি অত্যন্ত নিগূঢ় কৌশল কোথাও গুপ্ত আছে, তবে তৎক্ষণাৎ এই কথা মনে হয়, নিশ্চয় তাহা প্রভাতের আলোক নহে—নিশ্চয় তাহা কোনো কৃত্রিম আলোক -সংসারের কোনো বিশেষ-ব্যবহারযোগ্য কোনো ক্ষুদ্র আলোক। কারণ, বৃহৎ আলোক আমাদের মস্তকের উপরে আপনি বর্ষিত হইয়া থাকে—ক্ষুদ্র আলোকের জন্যই অনেক কলকারখানা প্রস্তুত করিতে হয়।

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র, তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান,—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা, তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আমাদের অন্তরবাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্‌যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে যাহা রচনা করিতে যাই, তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা অনেক সময় বিপুলতা ও প্রবলতার ভান করিয়া আমাদের মূঢ়চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো, আমাদের অজ্ঞবুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে।

যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কলকারখানা আয়োজন-উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা,—পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক-এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন-আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই—কিন্তু সেইজন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে তো। ধারণা করিতে হইলে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। অথচ মানবপ্রকৃতি বিচিত্র,—সুতরাং সেই বৈচিত্র্য অনুসারে যাহা এক, তাহা অনেক হইয়া উঠে। যেখানে অনেক, সেখানে জটিলতা অনিবার্য—যেখানে জটিলতা, সেখানে বিরোধ আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না। ধর্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত। যাহা ধারণা করি, তাহা তিনি নহেন, তাহা আর-কিছু, তাহা ধর্ম নহে, তাহা সংসার।

সুতরাং তাহাতে সংসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। সংসারের লক্ষণ বৈচিত্র্য, সংসারের লক্ষণ বিরোধ।

যাহা ধারণা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি, তাহাতে প্রতিক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্তকিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি, তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে—

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই।

সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখসৃষ্টি করিবে,—দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত-জড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাসযোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে, কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মুক্ত আকাশের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাখিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার, আমাদের পক্ষে কবরস্বরূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি, আকাশকে গৃহেরই মতো আমার আপনার করিয়া লইব—যদি আকাশের মধ্যে কেবলই প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে সুদূরে চলিয়া যায়। আমরা যদি বৃহৎ ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়া লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অনন্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি,--কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতিদ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না। বস্তুত যেখানে আমরা না পাইবার আনন্দের অধিকারী, সেখানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্য ঋষি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেরই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জালদ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎসংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য, এই কথা নির্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে দুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা সুগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা স্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দেয়। আমাদের স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র প্রাচীর দুর্গম, কিন্তু অনন্ত আকাশ দুর্গম নহে। প্রাচীরকে লঙ্ঘন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লঙ্ঘন করিবার কোনো অর্থই নাই। প্রভাতের অরুণালোক স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে, সেই কারণেই কি অরুণালোককে দুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমুষ্টি স্বর্ণই কি দুর্লভ নহে, আর আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের আলোককে মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না—তাহা দুর্মূল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিষদের ব্রহ্ম সেইরূপ। তিনি অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র—তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন।

মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতিমুহূর্তে প্রাণধারণ করিতেছি—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবসকল উপভোগ করিতেছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না,—হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয় উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি একমুহূর্তেই পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারিদিকের মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল।[১] আমার স্বহস্তজ্বালিত একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশপরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃসম্পদ লাভ করিবার জন্য আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কী পাইলাম। বাতির মতো কোনো নাড়িবার জিনিস পাই নাই, সিন্দুকে ভরিবার জিনিস পাই নাই—পাইয়াছিলাম আলোক আনন্দ সৌন্দর্য শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক বেশি পাইয়াছিলাম—অথচ উভয়কে পাইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধ-

১ তুলনীয় "পূর্ণিমা", 'চিত্রা,' রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড পৃ. ৭৮; 'ছিন্নপত্র' হইতে উদ্ধৃত পত্র (শিলাইদহ. ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৫), রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড. পৃ. ৫৪৮।

বিদ্বেষ-বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর, আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা একনিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়—তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতিশব্দের অর্থ—চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয় মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোনো বিশেষ-প্রদেশবাসী নহি—আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন—স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃ-স্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।

এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতিমুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—যে শক্তি

থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের, এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার-কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্তশক্তি দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন গভীরভাবে সমগ্রভাবে একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।

আমাদের এই ব্রহ্মের ধ্যান যেরূপ সরল অথচ বিরাট, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়।—বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাজে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না—কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালোবাসো, তবে দ্বিতীয় কোনো কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল

হইয়া আসে। ফলত সেই ভালোবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপসম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে যদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া, দাহন করিয়া, নির্মূল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না—সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়—কিন্তু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়াছে।

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব—আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ পাপ নিরানন্দ কেবল এইজন্যই। সত্যের, জ্যোতির, অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি কিছু পাইয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলচ্ছেদ করিয়া দেয়। যে-সকল ব্যাঘাতে তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়। সেইজন্যেই আমাদের মন অসত্য, অন্ধকার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে আমার দুঃখ দূর করো তখন সে শেষ পর্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে—যখন সে বলে আমার দৈন্যমোচন করো, তখন সে যথার্থ কী চাহিতেছে, তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করো, তখনও এই কথা। সে না বুঝিয়াও বলে—

আবিরাবীর্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তরবাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য যে জ্যোতি যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি, তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা, সেই অসত্য সেই অন্ধকার সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়। যাহা নাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়,- যাহা দূরে তাহাকে

সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।

জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলে—

সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন।

সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ-কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে—তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। উপকরণসঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই, বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায়, সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিতশিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মতো নিষ্ঠুরবেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারির উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এইরূপ উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটিতে থাকি, তখন আমাদের আগ্রহের অসহ্যবেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের চারিদিকে পদে পদে যে-সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্যের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাই। জগতের অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডারকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্যই ভারতবর্ষ বলিতেছেন—

সংযতো ভবেৎ।

প্রবৃত্তিবেগ সংযত করো

চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমত্ততাবশতই আমরা সংসারের যে-সকল স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যকে, প্রতিদিনের শতশত মঙ্গলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ করিতে পারি নাই, সংযত হইয়া স্থির হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য অতি সহজেই অবারিত হইয়া যায়।

যাহা নাই, তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—

ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ-কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়,—কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা—আমরা যে অমৃতলোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা—চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে; জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া,—যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম, সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ন্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য, তাহা আমাদের স্বরচিত নহে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে সুগম, তাহা আমাদের সম্যক্-ধারণার অতীত বলিয়াই তাহা আমাদের চিরজীবনের আশ্রয়,—তাহার প্রতিনিধিমাত্রই তাহা অপেক্ষা সুদূর—তাহাকে আমাদের কোনো আবশ্যক-বিশেষের উপযোগিরূপে, বিশেষ আয়ত্তিগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই তাহাকে কঠিন করা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করা হয়,—অধীর হইয়া তাহাকে বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে নিজের সৃষ্টিকেই খুঁজিয়া ফিরিতে হয়—এইরূপে চেষ্টার উপস্থিত উত্তেজনামাত্র লাভ করি, কিন্তু চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হই না। আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম বিরাটতম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধাবিভক্ত খর্বতা-খণ্ডতার দুর্গম গহনমধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি।

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল করো। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারই পথ—আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না

করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অত্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়-গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্কমৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিক্‌বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়-তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা ক্ষমতার মত্ততা স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনও ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মা ভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—

একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না।

ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

১৩০৯

প্রাচীন ভারতের "একঃ"

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবৃক্ষে আসিয়া স্থির হয়, তেমনি এই যাহা কিছু, সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নদী যেমন নানা বক্রপথে সরলপথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ডখণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যুবিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া, পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল—পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনের গম্ভীর মন্ত্রে এই বার্তা উদ্‌গীত হইতেছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্য-কারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল—

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে।

সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতা-সন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল—

এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্তা—এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন।

বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট-বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ

প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় অন্য সকল হইতেই প্রিয়।

মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল,—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগতকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল।

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যূষে পূর্বদিক যখন অরুণবর্ণ, লঘুবাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখণ্ড শান্তি বিরাজমান,—যখন মনে হয়, যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনও সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুল গৃহের অসংখ্যজীবপালনকার্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন, দিবসারম্ভে ওংকারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্‌ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন—তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে, সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিযোজন-আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তিসৌন্দর্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড-শক্তি প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটিমাত্র কহিতেছে না, শব্দটিমাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষ-লক্ষ তরঙ্গ সগর্জন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যে-অরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে-পল্লবে যে মর্মরধ্বনি, আমরা তাহার কী জানিতেছি। বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্মশালায় দিবারাত্রি লক্ষকোটি জ্যোতিষ্কদীপের নির্বাণ নাই, তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে,—তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্‌ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত অক্লিষ্ট প্রশান্ত সুন্দর—এত কর্মে এত চেষ্টায় এত জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিন্তিত চিহ্নিত ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যসুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কী শান্ত গম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কী করুণ-কোমল, তাহার রাত্রি কী উদার-উদাসীন। এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সংগীত কী করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই এক।

সেইজন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতিহীন মহাসূর্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে—একান্ত নির্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কী করিয়া? ইহার কারণ—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর। বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বসংসার কী অনির্বচনীয় বিভীষিকা। তবে আমরা দুর্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মতো অনুভব করিতেছি। এই যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজনবিযোজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথক্‌কৃত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না—সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ করিতেছি—এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন করিলে এ কোনোই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে-দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে—এই মূক মূঢ় মহাবহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয়, পরিচিত, আত্মীয়সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন? তিনি—যিনি,

বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

এই এককে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি, তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কী? সেই ভাবটি মঙ্গল। এখানে আঘাতপ্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ বিরহমিলন

বিপৎসম্পদ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যে নানা বিরোধবিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খণ্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত—তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলসূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেইজন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না। ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গলসংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে—কেননা,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে খণ্ডখণ্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে, সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কর্মচেষ্টাকে তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ ক্ষমতায় আমার অহংকার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্মের মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল হৃদ্‌বৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়, দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র সেই স্তব্ধ একের মঙ্গলবন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না—দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি—যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত জগৎসংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য অখণ্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, যে ইহাকে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের

মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে ; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্বরথ-ইষ্টককাষ্ঠ মর্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকি, এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারদ্বার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই শেষ মুহূর্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইঁহাতে 'নানা' কিছুই নাই।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন,—মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত-ভ্রমণের অবসান নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খণ্ডখণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিকধর্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায়, তখন একমুহূর্তেই বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে পাইয়াছি—বলিয়া উঠে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পরে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ ?

যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব ?

যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়— কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই এককে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন ; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন ; বিপদসম্পদ্ মুহূর্তে-মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ,

এষোঽস্য পরমো লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।

রেশম-পশম আসন-বসন কাষ্ঠ-লোষ্ট্র স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে ? তাহারা আমার কে ? তাহারা আমাকে কী দিতে পারে ? তাহারা আমার পরমসম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জিকৃত সঞ্চয়ে গর্ববোধ করিতেছি। হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই, শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই। সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা, তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত শ্রীহীন মলিন, কেবল বসনে-ভূষণে উপকরণে-আয়োজনে আমি স্ফীত। জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না ; কেননা শয্যা-আসন-বেশভূষার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি, সেই সকল ধূলিময় পদার্থের ধুলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টাপর্যঙ্ক-অশ্বরথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত। সমস্ত মঙ্গলকর্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। শতছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে ; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-ধর্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না— এতবড়ো অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্, যে আনন্দের কণামাত্র

আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা মনের চেষ্টা প্রীতির চেষ্টা পুণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই, আমার আনন্দ আমার গর্ব কেবল উপকরণ-সামগ্রীতে,—এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত ; যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দেশে জীবপ্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্তিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্‌, যিনি দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ, সর্বকালে সর্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না, তাঁহার কর্মে আমার কোনো আস্থা নাই, কেবল জীবনের কয়েকদিনমাত্র যে-কয়েকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি, তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য—এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন। আমি জানি না, আমি দেখিতে পাই না—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্‌।

আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত বিদীর্ণ।

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্‌, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে, অন্তরে-বাহিরে, জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ করো, তুমি আহ্বান করো, তোমার প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণবাহুদ্বারা আমাকে বল দান করো। অবসাদের দুর্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে, আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত-ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না ; আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না ; আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়। এক-তুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্মকে একাকী অধিকার করো, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখো। হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয় ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে

আর-একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই—কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মৎ হইয়া উঠে। আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শানিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে। হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্‌?

যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব?

কামান-ধূম্র এবং স্বর্ণধূলির দ্বারা সমাচ্ছন্ন তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না; তোমার সেই অনন্ধকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উত্থিত করো।

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয়, তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ। শিব এব কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার; হে শংকর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার; হে শিব, হে শিবতর তোমাকে নমস্কার।

প্রার্থনা

সকলেই জানেন একটা গল্প আছে—দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এত বড়ো সুযোগটাতে হতভাগ্য কী যে চাহিবে, ভাবিয়া বিহ্বল হইল—শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে-তিনটে প্রার্থনা জানাইল, তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, আমরা মনে করি পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না-জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব-চেয়ে জাজ্বল্যমান—আমি সব-চেয়ে কী চাই, তাহাই বুঝি সব-চেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট—কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে—সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী, সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে,—যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে সর্বাংশে তাহার অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব-চেয়ে সত্য ইচ্ছা নিত্য ইচ্ছা কোন্‌টা? যে-ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যন্ত রহস্য, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয়—কিন্তু কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব, তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? আমি কী আমার মধ্যে যে-একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিণাম কী, তাহার গতি কোন্ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাইবার *জন্য*ও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কী, তাহা জানিবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও। নহিলে উপস্থিতমতো হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয়তো ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি—আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কী প্রার্থনা করিব, তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি,—আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কী চাই, তাহারই

সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি, তাহাই নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—আমার প্রার্থনা কী, তাহাই জানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন,—শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন, একটিমাত্র প্রার্থনা আছে তাহা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরও বৃথা। আমরা যখন সত্যকে আলোককে অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনই এ-প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল—কিন্তু তবু এখনও প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে আলোকে মাথা না তুলিয়াছে, ততক্ষণ তাহা না থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না, যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কী, তাহা অনেক সময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে জানিতে হয়। জগতের মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই—কিন্তু যখন দেখি, কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন,

তখন হঠাৎ একরকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি—কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কী আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

তখন আরও একটা কথা বোঝা যায়। ইহা বুঝিতে পারি যে, যে-সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার সুগোচর, যাহারা কেবলই আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, স্ফূর্তি দিতেছে না, তাহাকে কেবলই আমার চেতনার অন্তরালবর্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে।

আর, যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ, যাহা মানবসমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়—এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, আর-সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মতো তাহার পশ্চাদ্বর্তী, তাহার পদতলগত। তিনি জানেন—সত্য, আলোক, অমৃতই চাই, মানুষের ইহা না হইলেই নয় অন্নবস্ত্র-ধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলিয়াই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া জগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর আমরা খাই পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—মানবের চিরন্তন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে-জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে-জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য প্রতিভাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য, আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। ইহা আর কিছু নয়—যাহা কাছেই আছে, তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার

বহুপূর্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা—তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সফলতা, ইহাই লাভ,—পাওয়াটা সকল সময়ে লাভ নহে—তাহা অধিকাংশস্থলেই পাইয়াও না-পাওয়া, এবং অবশিষ্টস্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমার্থিক সকল বিষয়েই এ-কথা খাটে।

ঋষি বলিয়াছেন—

আবিরাবীর্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন, আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ প্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন, এখন আমারই কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়, আমরা চোখ খুলি, তখন সূর্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই আমরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে—আমরা যে কী চাই, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম, তখন সিদ্ধির আর বড়ো বিলম্ব থাকে না, তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে—এই সুমহৎ-আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সফলতা অতি সুন্দরভাবে, অতি সহজভাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ-যে কেবল আমাদের খাওয়া-পরা, আমাদের ধনমান-অর্জন সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে—আমাদের বড়ো বড়ো চেষ্টাসম্বন্ধে আরও বেশি করিয়াই খাটে।

যেমন দেশহিতৈষা। এ-প্রবৃত্তি যদিও আমাদের আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের

দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর-অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য পরম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে আলোককে অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে সার্থকতালাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে—এমন লোলুপভাবে এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে, সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ—পথ নহে,—ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী বিষয়ানুরাগই হউক আর দেশানুরাগই হউক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানেই এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে, সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে—"বিনিপাত"! বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

১৩১১

ধর্মপ্রচার

'এস আমরা ফললাভ করি' বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তখনই পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপায়, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সদুৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা যায় না বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে-নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যদি অন্য উপায়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে সেই ঘরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে গৃহসজ্জার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে—কিন্তু তাহা আমাদের যথার্থ ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা

মনে করি, দল বাঁধিলেই বুঝি ফল পাওয়া যায়। শেষকালে মনে করি দল বাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করিতে হইবে। হঠাৎ অনুতাপ হয়, কিছু করিতেছি না। যেন করাটাই সব-চেয়ে প্রধান—কী করিব, কে করিবে, সেটা বড়ো-একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ-কথাটা সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্মপ্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা পুরাণতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে—তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।

নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না—সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারের যাহা-কিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই; যাঁহাদের অভ্যুদয় বসন্তের ন্যায় অনির্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণসমীরণ মহাসমুদ্রবক্ষ হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পুরাতনকে অপূর্ব করিয়া তোলেন—অতিপরিচিতকে নিজ জীবনের নব নব বর্ণে গন্ধে রূপে সজীব সরস প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্তবাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা, তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি—কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।

১৩।২৫

এইরূপে ধর্মও যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্ত অসাড়তায়, নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের বিশেষ স্থানের বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না, ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নূতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে-তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডির সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কিনা; যদি করে, তবে ধর্ম গেল বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্মের বৃন্তটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে তাহারা শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্মকে তাহারা সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপিত করে—পাছে ধর্ম-সীমানার মধ্যে মানুষ আপন হাস্য, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়—বাকি সমস্ত দেশকালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্রোহভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোটো-বড়ো, অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে

মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জার গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্য যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শদ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এ-আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম আমোদ হইতে কাব্য-কলা হইতে জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে, যাহা অধর্ম, তাহাই অনুপযোগী ছিল—ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।

এইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্বলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থতনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরমসাধনা, তখন ব্রহ্মচর্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে যাহা যথার্থভাবে চায়, সে তাহার উপায় সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে। য়ুরোপ যাহা কামনা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে, তাহার সমাজে তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সে ধরিয়া রাখে। এই কারণেই য়ুরোপ দেশজয় করে, ঐশ্বর্য লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবা-কার্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই সে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয়েরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পাবলিক-স্কুলে, তাহাদের ক্রিকেটক্ষেত্রে তাহারা রণজয়ের চর্চা করিয়া লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এককালে আমরা সেইরূপ যথার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে যখন চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান

করিয়াছিলাম, তখন সমাজের সর্বত্রই তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় রিলিজন-চর্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কখনোই ধর্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ধর্মপালন তখন সংকুচিত হইয়া বিশেষভাবে রবিবার বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্য তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অনুকূল ছিল—এবং যে ঋষিরা লব্ধকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা বলিয়াছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

তাঁহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ধর্মকে যে আমরা শৌখিনের ধর্ম করিয়া তুলিব; আমরা যে মনে করিব, অজস্র ভোগবিলাসের একপার্শ্বে ধর্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্মের সংস্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না; আমরা যে মনে করিব, আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্রপরিবারেরা ধর্মকে যেটুকুপরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও সর্ববিষয়ে তাঁহাদের অনুবর্তন করিয়া অগত্যা সেইটুকুপরিমাণ ধর্মের ব্যবস্থা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে; তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আসবাবের সঙ্গে ভারতের সুমহৎ ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

বিশ্বজগতে যাহা কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে—অন্যের ধনে লোভ করিবে না।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ—সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্"—ইহা কাজের কথা—ইহা কাল্পনিক কিছু নহে—ইহা

কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণদ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি—তাঁহারা বলিয়াছেন—

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

এই যে ব্রহ্মলোক—অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে—ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের, ব্রহ্মচর্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্যা একটা কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপনরহস্য নহে—

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃস্বর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ।

ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা এবং ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকব্যাপী এই যে ব্রহ্ম, ইঁহার উপাসনাই তপস্যা।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি

সর্বমেবাবিবেশ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করিলাম কি না, অভয়লাভ করিলাম কি না, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিস্মৃত মঙ্গলভাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না, পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না, বৈষয়িকতার বন্ধন ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের প্রলোভন-পাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না, এবং সর্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুরূহ সেই উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরববিমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত করিতেছে

কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, ব্রহ্মের দ্বারা নিখিলজগৎকে কতদূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি।

আমরা বিশ্বের অন্যসর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। "সর্বভূতান্তরাত্মা" ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ মানবসমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি কর্মবৃত্তি আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি প্রীতি ও কর্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্য মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক কেবল জ্ঞানের

উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা,—সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

এ-কথা সকলেই জানেন, অনেক সময়ে মানুষ যাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে, তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয়, সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজরচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর-কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে, সে-কথা স্বীকার করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহা হইতে ধর্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুব্ধগণ যে-ভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয়, আমরা সেই ভাবেই ধর্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অন্যান্য দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দিরসংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গল-সাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই। ব্রহ্ম ধন্য—তিনি সর্বদেশে, সর্ব-কালে, সর্বজীবে ধন্য—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্মের বিষয়কর্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি"—"হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?" ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন—"স্বে মহিম্নি"—"আপন মহিমাতে।" তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে—আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

১৩১০

বর্ষশেষ

পুরাতন বর্ষের সূর্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে নিঃশব্দে অস্তমিত হইল। যে কয়-বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অদ্য তাহারই বিদায়যাত্রার নিঃশব্দ পক্ষধ্বনি এই নির্বাণালোক নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি। সে অজ্ঞাত সমুদ্র-পারগামী পক্ষীর মতো কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোনো চিহ্ন নাই।

হে চিরদিনের চিরন্তন, অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি এই বিদায়কে তুমি সার্থক করো—আশ্বাস দাও যে, যাহা নষ্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলই যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে। আজি যে প্রশান্ত বিষাদ সমস্ত সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিতেছে, তাহা সুন্দর হউক, মধুময় হউক, তাহার মধ্যে অবসাদের ছায়ামাত্র না পড়ুক। আজ বর্ষাবসানের অবসানদিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঋষি পিতামহদিগের আনন্দময় মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করি।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

বায়ু মধু বহন করিতেছে। নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরন করিতেছে। ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হউক। রাত্রি মধু হউক, ঊষা মধু হউক. পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক। সূর্য মধুমান হউক।

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লি-ঝংকারস্নুপ্ত অন্ধকারের মতো হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।

যে বিষাদ ধ্যানের পূর্বাভাস, যে শান্তি মঙ্গল কর্মনিষ্ঠার জননী, যে বৈরাগ্য উদার প্রেমের অবলম্বন, যে নির্মল শোক তোমার নিকটে আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুরু তাহাই

আজিকার আসন্ন রজনীর অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে সন্ধ্যাদীপোজ্জ্বল গৃহপ্রত্যাগত শ্রান্ত বালকের মতো অঞ্চলের মধ্যে আবৃত করিয়া লউক।

পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে এবং যাইতেছে—কিছুই স্থির নহে; সকলই চঞ্চল—বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহা আছে, যাহা চিরকাল স্থির থাকে, যাহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজমান—গত বর্ষে সেই ধ্রুবের কি কোনো পরিচয় পাই নাই—জীবনে কি তাহার কোনো লক্ষণ চিহ্নিত হয় নাই? সকলই কি কেবল আসিয়াছে এবং গিয়াছে? আজ স্তব্ধভাবে ধ্যান করিয়া বলিতেছি তাহা নহে—যাহা আসিয়াছে এবং যাহা গিয়াছে তাহার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই, হে নিস্তব্ধ, তাহা তোমার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। যে তারা নিবিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে নিবে নাই, যে পুষ্প ঝরিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে বিকশিত—আমি যাহার লয় দেখিতেছি, তোমার নিকট হইতে তাহা কোনোকালেই চ্যুত হইতে পারে না। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে শান্ত হইয়া তোমার মধ্যে নিখিলের সেই স্থিরত্ব অনুভব করি। বিশ্বের প্রতীয়মান চঞ্চলতাকে অবসানকে বিচ্ছেদকে আজ একেবারে ভুলিয়া যাই। গত বৎসর যদি তাহার উড্ডীন পক্ষপুটে আমাদের কোনো প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায় তবে হে পরিণামের আশ্রয়, করজোড়ে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমারই প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও সে তোমারই। আমি তাহার সহিত আমার বলিয়া যে-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের—তাহা ছিন্ন হইয়াছে। আজ তোমারই মধ্যে তাহার সহিত যে-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি তাহার আর বিচ্ছেদ নাই। সেও তোমার ক্রোড়ে আছে আমিও তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছি। অসীম জগদরণ্যের মধ্যে আমিও হারাই নাই, সেও হারায় নাই,—তোমার মধ্যে অতি নিকটে অতি নিকটতম স্থানে তাহার সাড়া পাইতেছি।

বিগত বৎসর যদি আমার কোনো চিরপালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাচ্ছিন্ন করিয়া থাকে তবে, হে পরিপূর্ণস্বরূপ, অদ্য নতমস্তকে একান্ত ধৈর্যের সহিত তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পণ করিয়া ক্ষত উদ্যমে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তুমি আমাকে পরাভূত হইতে দিয়ো না। একদিন তোমার অভাবনীয় কৃপাবলে আমার অসিদ্ধ সাধনগুলিকে অপূর্বভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে সহসা আমার ললাটে স্থাপনপূর্বক আমাকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিবে এই আশাই আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

যে-কোনো ক্ষতি যে-কোনো অন্যায় যে-কোনো অবমাননা বিগত বৎসর আমার

মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক, কার্যে যে-কোনো বাধা, প্রণয়ে যে-কোনো আঘাত, লোকের নিকট হইতে যে-কোনো প্রতিকূলতা দ্বারা আমাকে পীড়ন করিয়া থাক—তবু তাহাকে আমার মস্তকের উপরে তোমারই আশিস-হস্তস্পর্শ বলিয়া অদ্য তাহাকে প্রণাম করিতেছি। গত বৎসরের প্রথম দিন নীরব স্মিতমুখে তাহার বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমার জন্য কী লইয়া আসিয়াছিল সেদিন তাহা আমাকে জানায় নাই—আমাকে কী যে দান করিল আজ তাহাও আমাকে বলিয়া গেল না, মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। দিনে রাত্রিতে আলোকে অন্ধকারে তাহার সুখদুঃখের দূতগুলি আমার হৃদয়গুহাতলে কী সঞ্চিত করিয়া গেল সে-সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রম আছে, আমি নিশ্চয় কিছুই জানি না,—একদিন তোমার আদেশে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে যাহা দেখিব তাহার জন্য আগে হইতেই অদ্য সন্ধ্যায় বর্ষাবসানকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া কৃতজ্ঞতার বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেছি।

এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি। আগামী বর্ষে যেন ধৈর্যের সহিত সহ্য করি, বীর্যের সহিত কর্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বদা সর্বত্র সঞ্চরণ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

১৩০৮

নববর্ষ

যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া

অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি,

দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে,

তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনই কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণ-ধান্যশ্যামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম—তুমি আনন্দিত হও, তুমি বললাভ করো।

প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ

সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান দিয়াছেন তাহা আজ আমরা নব-গৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য! এই যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য। এই যে গীতগন্ধবর্ণস্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিঃপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য। অদ্যকার প্রভাতে এই যে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব; এই যে বৃষ্টিধৌত বিশাল পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ইহার মধ্যে তোমার অমৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব। এই যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মস্তকের উপর তাহার স্থির হস্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহিমান্বিত জগতের অদ্যকার নববর্ষদিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। তবে সেই ঋষিবাক্য বুঝিতে পারি—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন।

আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত তাই সূর্যলোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত তাই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে; তিনি আনন্দিত তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি—তাই আমি গ্রহতারকার সহিত লোকলোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তাঁহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্যাদা।

তাঁহার প্রতিনিমেষের ইচ্ছাই আমাদের প্রতিমুহূর্তের অস্তিত্ব, আজ নববর্ষের দিনে এই কথা যদি উপলব্ধি করি—আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীরভাবে অন্তরে উপভোগ করি—তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর

মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য। এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি নাই পারিলাম—আমাদের বোধ-শক্তিতে এই শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত বিবিধভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম—কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি এক মুহূর্ত সর্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়—যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি।

তবে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

স্বার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত ব্রহ্মের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তখন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণে উদ্যত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান করে। তখন যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড়ো হইয়া উঠে—তখন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে—সকলকেই চূড়ান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিষয় উপস্থিত হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চরম সার্থকতা। ক্ষুদ্রতার এই সকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিয়া যায়।

সেইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও;—প্রতি নিমেষের খণ্ডতা হইতে তোমার অনন্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত করো;—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও;—অহংকারের যে অন্তরাল, বিশ্বজগৎ আমার সম্মুখে যে স্বাতন্ত্র্য লইয়া দাঁড়ায়, আমাকে এবং জগৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার তাহা

হইতে আমাকে মুক্ত করো ; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও,—আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলায় চড়াইয়া দোল দিতেছে, মুহূর্তকাল অবসর দিতেছে না ; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে খর্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান করো, সেই আনন্দই অমৃতলোক।

আজিকার নববর্ষদিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলিতেছি—

আবিরাবীর্মএধি।

হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও।

অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব জগতের দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়—তখন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিয়া সুগভীর শান্তির মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই। তখন, যে চেষ্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিধৃত তাহা আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যে নিখিল ভুবন পরস্পর গ্রথিত তাহা আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। তখন আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি এ-কথা মনে থাকে না—তোমার সমস্ত জগতের এক সঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ এই কথাই আমার মনে হয়।

সেই স্বপ্রকাশ যতদিন না আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন ততদিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনের একটা দিনের সহিত আর-একটা দিনের যে বন্ধন সে যেন শুধু স্বার্থের বন্ধন না হয়, জড় অভ্যাস-সূত্রের বন্ধন না হয় —একটা বৎসরের সহিত আর-একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের দ্বারা তাঁরই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। এমন কোনো সূত্রে যেন মানবজীবনের দুর্লভ মুহূর্তগুলিকে না বাঁধিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবনের যে বৎসরটা গেছে তাহা পূজার পদ্মের ন্যায় তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই—তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি দল দিনে দিনে ছিন্ন করিয়া লইয়া পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি। অদ্য বৎসরের অনুদ্‌ঘাটিত প্রথম মুকুল সূর্যের আলোকে মাথা তুলিয়াছে ইহাকে আমরা খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্যে সৌগন্ধ্যে শুভ্রতায় ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব। তাহা কখনোই অসাধ্য নহে—সে-শক্তি আমাদের মধ্যে আছে—

নাত্মানমবমন্যেত।

নিজেকে অপমান অবজ্ঞা করিয়ো না।

ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা।

আপনাকে যে ব্যক্তি দীন বলিয়া অবমান করে তাহার কখনোই শোভন ঐশ্বর্য লাভ হয় না।

ধর্মের যে আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আদর্শে ব্রহ্মের জ্যোতি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা কল্পনাগম্য অসাধ্য নহে, তাহা রক্ষা করিবার তেজ আমাদের মধ্যে আছে ;—নিজেকে জাগ্রত রাখিবার শক্তি আমাদের আছে ;—এবং জাগ্রত থাকিলে অন্যায় অসত্য হিংসা ঈর্ষা প্রলোভন দ্বারের নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া যায়। আমরা ভয় ত্যাগ করিতে পারি, হীনতা পরিহার করিতে পারি, আমরা প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি—এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। কেবল দীনতায় সেই শক্তিকে অবিশ্বাস করি বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করিতে পারি না। সেই শক্তি আমাদিগকে কী ভূমানন্দে কী চরম সার্থকতায় লইয়া যাইতে পারে তাহা জানি না বলিয়াই আত্মার সেই শক্তিকে আমরা স্বার্থে এবং ব্যর্থ চেষ্টায় এবং পাপের আয়োজনে নিযুক্ত করি। মনে করি অর্থলাভেই আমাদের চরম সুখ, বাসনা তৃপ্তিতেই আমাদের পরমানন্দ, ইচ্ছার বাধা মোচনেই আমাদের পরম মুক্তি। আমাদের যে-শক্তি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একাগ্রধারায় ব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জীবনের কর্ম সহজ হয়, সুখদুঃখ সহজ হয়, মৃত্যু সহজ হয়। সেই শক্তি আমাদিগকে বর্ষার স্রোতের মতো অনায়াসেই বহন করিয়া লইয়া যায় ; দুঃখশোক বিপদ-আপদ বাধাবিঘ্ন, তাহার পথের সম্মুখে শরবনের মতো মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পুনর্বার বলিতেছি, এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। কেবল, চারিদিকে ছড়াইয়া আছে বলিয়াই তাহার উপর নিজের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গতিলাভ করিতে পারি না। নিজেকে প্রত্যহ নিজেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক কাজ আমাদের স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়ে ; প্রত্যেক কাজের আশানৈরাশ্য-লাভক্ষতির সমস্ত ঋণ নিজেকে শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিতে হয়। স্রোতের উপর যেমন মাঝির নৌকা থাকে এবং নৌকার উপরেই তাহার সমস্ত বোঝা থাকে তেমনি ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার চিত্ত একাগ্রভাবে ধাবমান, তাঁহার সমস্ত সংসার এই পরিপূর্ণ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায় এবং কোনো বোঝা তাঁহার স্কন্ধকে পীড়িত করে না।

নববর্ষের প্রাতঃসূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অদ্য আমাদের হৃদয়কে চারিদিক হইতে আহ্বান করি। ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গলশঙ্খ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে সমস্ত প্রাণের নিশ্বাস তাহাতে পরিপূর্ণ করি—সেই মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনি শুনিলে

আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহংকার হইতে স্বার্থ হইতে বিলাস হইতে প্রলোভন হইতে ছুটিয়া আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে—তাহা হইলে মুহূর্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বার তীর্থ হইয়া উঠিবে।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অদ্য নববর্ষের প্রভাতে তোমার জ্যোতিঃস্নাত তরুণ সূর্য পুরোহিত হইয়া নিঃশব্দে আমাদের আলোকের অভিষেক সম্পন্ন করিল। আমাদের ললাটে আলোক স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের দুই চক্ষু আলোকে ধৌত হইয়াছে। আমাদের পথ আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। আমাদের সদ্যোজাগ্রত হৃদয় ব্রতগ্রহণের জন্য তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে-শরীরকে অদ্য তোমার সমীরণ স্পর্শ করিল তাহাকে যেন প্রতিদিন পবিত্র রাখিয়া তোমার কর্মে নিযুক্ত করি। যে-মস্তকে তোমার প্রভাতকিরণ বর্ষিত হইল সে-মস্তককে ভয় লজ্জা ও হীনতার অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া তোমারই পূজায় প্রণত করি। তোমার নামগানধারা আজ প্রত্যূষে যে-হৃদয়কে পুণ্যবারিতে স্নান করাইল, সে যেন আনন্দে পাপকে পরিহার করিতে পারে, আনন্দে তোমার কল্যাণকর্মে জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারে, আনন্দে দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারে, আনন্দে দুঃখকে মহীয়ান্ করিতে পারে, এবং আনন্দে মৃত্যুকে অমৃতরূপে বরণ করিতে পারে। আজিকার প্রভাতকে কালি যেন বিস্মৃত না হই। প্রতিদিনের প্রাতঃসূর্য যেন আমাদিগকে লজ্জিত না দেখে; তাহার নির্মল আলোক আমাদের নির্মলতার, তাহার তেজ আমাদের তেজের সাক্ষী হইয়া যায়—এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে আমাদের প্রত্যেক দিনটিকে নির্মল অর্ঘ্যের ন্যায় তাহার রক্তিম স্বর্ণথালিতে বহন করিয়া তোমার সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারে। হে পিতা, আমার মধ্যে নিয়তকাল তোমার যে আনন্দ স্তব্ধ হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে জগতে রক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে সূর্যোদয় প্রতিদিনই আমার নিকটে অপূর্ব, সূর্যাস্ত প্রতিসন্ধ্যায় আমার নিকট রমণীয়, যে আনন্দে অজ্ঞাত ভুবন আমার আত্মীয়, অগণ্য নক্ষত্র আমার সুপ্তরাত্রির মণিমাল্য, যে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বহুলোকের প্রিয় পরিচিত, সমস্ত অতীত মানবের মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারী, যে আনন্দে দুঃখ নৈরাশ্য বিপদ মৃত্যু কিছুই লেশমাত্র নিরর্থক নহে,—আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে পাপের লজ্জায় আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের দ্বার নিজের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া পথের পঙ্কে যদৃচ্ছা লুণ্ঠিত হওয়াকেই আমার সুখ আমার স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম না করি। জগৎ তোমার জগৎ, আলোক তোমার আলোক, প্রাণ তোমার নিশ্বাস, এই কথা স্মরণে রাখিয়া জীবনধারণের যে পরম পবিত্র গৌরব তাহার অধিকারী হই, অস্তিত্বের যে অপার

অজ্ঞেয় রহস্য তাহা বহন করিবার উপযুক্ত হই—এবং প্রতিদিন তোমাকে এই বলিয়া ধ্যান করি—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

বিশ্বসবিতা এই সমস্ত-ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন—তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন—তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি—তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

১৩০৯

উৎসবের দিন

সকালবেলায় অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে-উপবনে পাখিদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে-উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখিরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্যসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে—আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান গতিবান চেতনাবান পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সংগীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্তিমান উৎসব। সেইজন্য হেমন্তের সূর্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্কশস্যসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে—সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই।

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না—যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না—যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলির মতো ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের

উৎসবের দিন নহে; সেদিন তো আমরা জড়ের মতো উদ্ভিদের মতো সাধারণ জন্তুর মতো—সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না—সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

হে ভ্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি—আজ, আলোক জলিয়াছে, সংগীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে—আজ মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে—আজ আমরা কেহ একাকী নহি—আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক—আজ অতীত সহস্রবৎসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—আজ অনাগত সহস্রবৎসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ আমাদের কিসের উৎসব? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্যশক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্ধ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্মী কর্মের কোন্ অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে? জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সেই শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়। প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি মানুষের উদ্যম মানুষের উদ্‌যোগ রহিয়াছে—আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে—গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই,

আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে—কোমল ত্বক্ এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র হইতে এ কী জোয়ার আসিয়াছে—সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া সমস্ত প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করিয়া অহর্নিশি অক্লান্ত উদ্যমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্যে কোন্ অনির্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। যাহাকে জানিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাকে জানিবার ইহার কী প্রয়োজন। যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়। যাহার কর্ম করিবার জন্য এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন কি, প্রাণকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনাপাওনার হিসাব লেখা থাকিতেছে কই। আশ্চর্য। ইহাই আশ্চর্য। আনন্দ। ইহাই আনন্দ। যেখানটা মানুষের সমস্ত আবশ্যকসীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দসংগীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের সুমহান মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত সহস্র-বৎসর পূর্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী।

এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য, কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত—কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে। মানুষ এই যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান

পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সংকীর্ণতা কোনো নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়, যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর—মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত-সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে মস্তক তুলিয়া এ কী কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই—অদ্য আপনাকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব।

বহুসহস্রবৎসর পূর্বের উচ্চারিত এই বাণী আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।
অন্তরতর এই যে আত্মা, ইনি এই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়।

সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূর-নিকটের অন্তরতর, তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে একমুহূর্তে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক

জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি—স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি—পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো-শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

> মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
> এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
> মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
> উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
> তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো।
> এতং সতিং অধিট্ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাবে জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে—আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না—এই শক্তি

মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য—ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্মৃত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই সকল মহত্ত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজ আমরা মানুষের এই সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি—আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখরমালায় জাগ্রত-বিরাজিত সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসংঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই এই মহান ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ-কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের

ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা বিসর্জন দিই—সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মতো দীনহীন জগতে আর কে থাকিত। সমস্ত মানুষ যে তাহার জন্য অন্ন বস্ত্র আবাস ভাষা জ্ঞান ধর্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের অন্তরস্থিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে একমুহূর্তে ধন্য হইয়াছে। তাহার জন্ম উপলক্ষ্যে একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া যদি সমস্ত মানুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব। অন্য সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে, ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে; এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মঙ্গলবিবাহকে মানবসমাজের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে—এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মনুষ্যকে অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে—তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়—শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা এক-একদিন গৃহকে ভুলিয়া সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এতকালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারও স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড়ো হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর খাদ্য প্রচুরতর আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে—কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা আমাদের দীনতা আমাদের

নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে যতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে এই গৃহসজ্জায় এই রসলেশশূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে সেই শান্তমঙ্গলস্বরূপের প্রশান্ত-প্রসন্নমুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো। বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করো। আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্বোধিত করো প্রতিদিনের নির্বীর্য নিশ্চেষ্টতা হইতে আরাম-আবেশ হইতে উদ্ধার করো। যে কঠোরতায় যে উদ্যমে যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো। আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি। আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব যে প্রেমের গৌরব যে মঙ্গলের গৌরব যে কঠিনবীর্য নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল—যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে-সকল অভয়বাণী-অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খনির্ঘোষের মতো আজ না শুনিতে পাই—শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্‌-বিন্যাস—তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও—যেখানে ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন যেখানে তোমার সর্বত্যাগী সেবক কর্তব্যের কঠিনপথে রিক্তহস্তে ধাবমান হইয়াছেন—যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত। হায় দেব, সেখানে কোথায় দীপচ্ছটা, কোথায় বাদ্যোদ্যম, কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমাল্য। কিন্তু সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিব্যৈশ্বর্য, সেইখানেই তুমি। দূর করো, দূর করো এই সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, এই সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদিচূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড়-করাইয়া দাও। সেখানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব প্রভু।

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

১৩১১

দুঃখ

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনই আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই তখনই, এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহ বা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি—কেহবা তাহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া জানি—কিন্তু তাহাতে দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর-একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না ;—এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলই ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়।

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায় ?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া ? আমাদের চিত্ত সংসারে আপনপরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে ; সেই ভেদের মধেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন ?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ-কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা ; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধে নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয় ? রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ-জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল

আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কী বলিব, এ কী হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না—এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"—কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী। তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে কশাহত কালোঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পর সেই জলস্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তো রস। ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয় সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকাশের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন—সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্র রূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

এমন নহিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন করিয়া। এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এতবড়ো রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; না, পরিবেষণের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব হ'ক হ'ক কঠিন হ'ক কিন্তু ইহাকে ভরপুর করিয়া দাও, আনন্দ ইহাকে ছাপাইয়া উঠুক?

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ-কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই—হঠাৎ কি কখনোই বলিয়া উঠে নাই—বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি, আর কখনো সংশয় করিব না? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই, সেইদিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই

যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব।

ইহা কি তর্কের বিষয়, ইহা কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ; দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া

পায়। আর যত কিছু ধন সে তো তাহার নহে—সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের—কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনই পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ; সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ মুক্তি ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন—নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্‌খানে? আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন কী করিয়া। এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতা। হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার বর্ষণ করিবার প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড়ো অভিমান; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্যে আমার ঐশ্বর্যে যোগ—এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্যনক্ষত্র খচিত মহাসিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি;—সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়তো অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ তো কেবলই নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে বজ্রের আঘাতে কত জাতি কত রাজ্য কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষমারী অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়; যেখানে রক্তসরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরমূর্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানব-হৃদয়কে বারংবার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু—সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব-সংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহ-গুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা—যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ

যাহা কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন, তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্যাদা একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জিত বলিতে পারি না, সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই ;—ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎসংসারে আমাদের সমস্ত দাবি চলিয়া যায়, আমাদের নিজের কোনো দলিল থাকে না ;—আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব—মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মতো এতবড়ো অভাব আর কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—

> স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।
>
> তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম

করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-একদিক দিয়া বলা হইয়াছে

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এতবড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যতবড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

খ্রীস্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন—দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খ্রীস্টানধর্মের মর্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে-মূর্তিকে বাহ্যত কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সংহার-রূপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরের মূর্তি, সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই সকরুণ বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজন্যই এই সকল দুর্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের, মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে

হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।

তুমিই

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ।

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎবদনের দ্বারা গ্রাস করিতে-করিতে লেহন করিতেছ, সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, হে বিষ্ণু, তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মতো সংকুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না। তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি—তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি—তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বলভাবে নিজের আরামের নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না;—তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ, সেই যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে

আবিরাবীর্ম এধি।
হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও।

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—এ প্রকাশ তো সহজ নহে। এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে মানুষের কর্মে মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। তোমাকে বলিয়াছেন,

রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে,—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ কখন দেখি, যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে, নহে, কদাচ নহে। যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়া মান্য না করি—তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্যোগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ করো। জাগাও হে জাগাও—যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন একমুহূর্তে জাগাইয়া তুলিবে তখন, হে রুদ্র, সেই উদ্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি—এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ

ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে ; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা ; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

১৩১৪

শান্তং শিবমদ্বৈতম্

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশদিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠাপড়া কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানাহানি কত বিপ্লব, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাতচিহ্ন বিশ্বের চিরনূতন মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল অনন্ত কোলাহলের মর্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই শান্তং যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে কী উপায়ে ? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া ? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে ?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতিক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই ? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজনমাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটিমাত্র অতিক্ষুদ্র ব্যক্তির অতিক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে

পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎচরাচর বিভীষিকাময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কী করিয়া, যদি আমি শান্ত না হই? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গগুলাকেই বড়ো করিয়া দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানাদিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে, আমাদের মনকে তাহারা একবার এ-পথে একবার ও-পথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়া সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে কর্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি।। জীবনহীন শান্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি তো লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচল-প্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সংগীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ি চালায়, তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সে-ই গাড়ি চালায়। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্টপরিমাণ চলাকে যথেষ্টপরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে স্থির-ভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞ লোক যদি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন, বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়—সে জানে ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্মের মধ্যে পরিণামটা কী। সে জানে এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে, তাহা শান্তি, সে জানে যেখানে এই শক্তির

সার্থক পরিণাম, সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবং। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দামশক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিখিল-জগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষযোজনদূরবর্তী সূর্যচন্দ্রগ্রহতারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার এক বিরাট কলেবর রূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি সেই পালনী শক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু, ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ লাভক্ষতি সকলেরই মধ্যেই শিবং শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ-সকল ভার এক মুহূর্ত বহন করিত কে। নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধবন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। যাহা আলিঙ্গন, তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল-স্থল-আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না, তাহারই বিরাট প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মতো নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেমনি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণ সকল সম্বন্ধ সকল কর্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে

না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্মসমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গল-নিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি—শুভকর্মসাধনদ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ ক্ষোভবিক্ষোভের ঊর্ধ্বে নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব, তখনই জগতের সকল কর্মের সকল উত্থানপতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, যিনি শান্তং যিনি শিবম্। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, যিনি শিবম্।

তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক করিয়া বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু তো সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা তো চিন্তা করিতে পারিতেছি; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে তো একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে তো প্রতিমুহূর্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে তো আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে তো কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম, কত মানুষ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে-বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন তো একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন, যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকে, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদানপ্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিষয়ে ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেইজন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথকরূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক

খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়—খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে ; কারণ মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয়, তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না ; যে বন্ধু, সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করে না ; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জানি, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই, হয় অভাবের, নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে।

কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্য তাহাতে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই ; নিজের স্বার্থের দিকে যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেইজন্যে স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শান্তকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখো।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্রশক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্যাপ্তি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত কত ভয় কত সংশয় কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং, তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে ; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না করিতে পারে, ততক্ষণ পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে-স্থলে-আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব, যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে

নিয়মিত করিয়া অনাদি-অনন্তকাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের জীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য—শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম যখন আরম্ভ করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালোমন্দ যত পাপপুণ্য যত আঘাত প্রতিঘাত। শান্তি যেমন শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়, তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎপ্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসংকুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসংকুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য,—প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তার পরে অদ্বৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাদ্বারা ক্ষমার দ্বারা করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত পরিপূর্ণ;—কোথাও সে আর অসংগত অসমাপ্ত অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন্, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুদ্ধিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও আমাদের দুঃখের মধ্যেও আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া, হে অন্তর্যামিন্,

আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ করো যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে কর্মে প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি, যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৩১৬

স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম

মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়; তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল,—দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নাই।

স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা যে মানুষের পক্ষে বহুমূল্য, তাহা মানুষের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কিনা লড়াই করিয়া থাকে।

নিজের বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে কোথাও কোনো বাধা মানিতে চায় না। ইহাতে যেখানে বাধা পায় সেইখানেই তাহার বেদনা লাগে। সেইখানেই সে ক্রুদ্ধ হয়, লুব্ধ হয়, হনন করে, হরণ করে।

কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য তো অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে যে-সকল মালমসলা যে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে; আমাদের ইচ্ছামতো কেবল গায়ের জোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি না। তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। সেখানে বুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা আপস করিয়া লই। সেখানে পরের স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুপরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিষ্ফল হইতে হয়। তখন কেবলই স্বাতন্ত্র্য মানিয়া নয়, নিয়ম মানিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা হয়।

কিন্তু এটা দায়ে পড়িয়া করা—ইহাতে সুখ নাই। একেবারে যে সুখ নাই, তাহা নহে। বাধাকে যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনের অনুগত করিয়া আনিতে যে বুদ্ধি ও যে শক্তি খাটে, তাহাতেই সুখ আছে। অর্থাৎ কেবল পাইবার সুখ নয়, খাটাইবার সুখ। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্যের জোর স্বাতন্ত্র্যের গৌরব অনুভব করা যায়—বাধা না পাইলে তাহা করা যাইত না। এইরূপে যে অহংকারের উত্তেজনা জন্মে, তাহাতে আমাদের জিতিবার ইচ্ছা প্রতিযোগিতার চেষ্টা বাড়িয়া উঠে। পাথরের বাধা পাইলে ঝরনার জল

যেমন ফেনাইয়া ভিঙাইয়া উঠিতে চায়, তেমনি পরস্পরের বাধায় আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে।

যাই হ'ক, ইহা লড়াই। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে শক্তিতে শক্তিতে চেষ্টায় চেষ্টায় লড়াই। প্রথমে এই লড়াই বেশির ভাগ গায়ের জোরই খাটাইত, ভাঙিয়া-চুরিয়া কাজ-উদ্ধারের চেষ্টা করিত। ইহাতে যাহাকে চাই, তাহাকেও ছারখার করা হইত; যে চায়, সেও ছারখার হইত, অপব্যয়ের সীমা থাকিত না। তাহার পরে বুদ্ধি আসিয়া কর্মকৌশলের অবতারণা করিল। সে গ্রন্থি ছেদন করিতে চাহিল না, গ্রন্থি মোচন করিতে বসিল। এ কাজটা ইচ্ছার অন্ধতা বা অধৈর্যের দ্বারা হইবার জো নাই; শান্ত হইয়া সংযত হইয়া শিক্ষিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এখানে জিতিবার চেষ্টা নিজের সমস্ত অপব্যয় বন্ধ করিয়া নিজের বলকে গোপন করিয়া বলী হইয়াছে। ঝরনা যেমন উপত্যকায় পড়িয়া কতকটা বেগ সংবরণ করিয়া প্রশস্ত হইয়া উঠে, আমাদের স্বাতন্ত্র্যের বেগ তেমনি বাহুবল ছাড়িয়া বিজ্ঞানে আসিয়া আপনার উগ্রতা ছাড়িয়া উদারতা লাভ করে।

ইহা আপনিই হয়। জোর কেবল নিজেকেই জানে, অন্যকে মানিতে চায় না। কিন্তু বুদ্ধি কেবল নিজের স্বাতন্ত্র্য লইয়া কাজ করিতে পারে না। অন্যের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করিতে হয়—অন্যকে সে যতই বেশি করিয়া বুঝিতে পারিবে, ততই নিজের কাজ উদ্ধার করিতে পারিবে, অন্যকে বুঝিতে গেলে, অন্যের দরজায় ঢুকিতে গেলে নিজেকে অন্যের নিয়মের অনুগত করিতেই হয়। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা জয়ী হইতে গিয়াই নিজেকে পরাধীন না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-পর্যন্ত কেবল প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের জয়ী হইবার চেষ্টাই দেখা গেল। ডারউয়িনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব এই রণভূমিতে লড়াইয়ের তত্ত্ব—এখানে কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না, সকলেই সকলের চেয়ে বড়ো হইতে চায়।

কিন্তু ক্রপট্‌কিন প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিৎরা দেখাইতেছেন যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা নিজেকে টেঁকাইয়া রাখিবার চেষ্টাই প্রাণিসমাজের একমাত্র চেষ্টা নয়। দল বাঁধিবার, পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা, ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টার চেয়ে অল্প প্রবল নহে; বস্তুত নিজের বাসনাকে খর্ব করিয়াও পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই প্রাণীদের মধ্যে উন্নতির প্রধান উপায় হইয়াছে।

তবেই দেখিতেছি একদিকে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তি এবং অন্যদিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য, এই দুই নীতিই একসঙ্গে কাজ করিতেছে। অহংকার এবং প্রেম, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকে একসঙ্গে গড়িয়া তুলিতেছে।

স্বাতন্ত্র্যেও পূর্ণতালাভ করিব এবং মিলনেও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিব, ইহা হইলেই মানুষের সার্থকতা ঘটে। অর্জন করিয়া আমার পুষ্টি হইবে এবং বর্জন করিয়া আমার আনন্দ হইবে, জগতের মধ্যে এই দুই বিপরীত নীতির মিলন দেখা যাইতেছে। ফলত, নিজেকে যদি পূর্ণ করিয়া না সঞ্চিত করি, তবে নিজেকে পূর্ণরূপে দান করিব কী করিয়া। সে কতটুকু দান হইবে। যতবড়ো অহংকার তাহা বিসর্জন করিয়া ততবড়ো প্রেম।

এই যে আমি, অতিক্ষুদ্র আমি, এতবড়ো জগতের মাঝখানেও সেই আমি স্বতন্ত্র। চারিদিকে কত তেজ কত বেগ কত বস্তু কত ভার, তাহার আর সীমা নাই, কিন্তু আমার অহংকারকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারে নাই, আমি এতটুকু হইলেও স্বতন্ত্র। আমার যে অহংকার সকলের মধ্যেও ক্ষুদ্র আমাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, এই অহংকার যে ঈশ্বরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকে দিয়া ফেলিলে তবেই যে আনন্দের চূড়ান্ত। ইহাকে জাগাইবার সমস্ত দুঃসহ দুঃখের তবেই যে অবসান। ভগবানের এই ভোগের সামগ্রীটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে কে।

আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার পূর্ববর্তী অবস্থায় যত-কিছু দ্বন্দ্ব। তখনই একদিকে স্বার্থ, আর একদিকে প্রেম ; একদিকে প্রবৃত্তি, আর একদিকে নিবৃত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায়, এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করে, তাহাকেই বলি মঙ্গল। যাহা একদিকে আমার স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও পরস্পরের আঘাতে বেসুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা দুই অহংকারকে এক সৌন্দর্যের পরিণয়সূত্রে বাঁধিয়া দেয়, তাহাই মঙ্গল। শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াইয়া তোলে, মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যকে সুন্দর করে, প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়। মঙ্গল সেই শক্তি ও প্রেমের মাঝখানে থাকিয়া প্রবল অর্জনকে একান্ত বিসর্জনের দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবস্থাতেই মঙ্গলের রশ্মি লাগিয়া মানবসংসারে সৌন্দর্য প্রাতঃসন্ধ্যার মেঘের মতো বিচিত্র হইয়া উঠে।

নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের যেখানে সংঘাত, সেখানে মঙ্গলকে রক্ষা করা বড়ো সুন্দর এবং বড়ো কঠিন। কবিত্ব যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর, এবং কবিত্ব যেমন কঠিন তেমনি কঠিন।

কবি যে-ভাষায় কবিত্বপ্রকাশ করিতে চায়, সে-ভাষা তো তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে-ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবি যে-ভাবটি যেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে চায়, ভাষা ঠিক তেমনটি করিয়া রাশ মানে

না। তখন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবপ্রকাশের উপায়ের স্বাতন্ত্র্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়। যদি সেই দ্বন্দ্বটা কেবল দ্বন্দ্ব-আকারেই পাঠকের চোখে পড়িতে থাকে, তবে পাঠক কাব্যের নিন্দা করে, বলে, ভাষার সঙ্গে ভাবের মিল হয় নাই। এমন স্থলে কথাটার অর্থগ্রহ হইলেও তাহা হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না। যে-কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া সৌন্দর্যরক্ষা করিতে পারেন, তিনি ধন্য হন। যেটা বলিবার কথা তাহা পুরা বলা কঠিন, ভাষার বাধাবশত কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না—কিন্তু তবু সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কবির এই কাজ। ভাবের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে সৌন্দর্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়।

তেমনি আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করিতেছি; সে সংসার তো আমার নিজের হাতে গড়া নয়; সে আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। যেমনটি হইলে সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত, তেমন আয়োজনটি চারিদিকে নাই; সুতরাং সংসারে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব আছেই। কাহারও জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবলই চোখে পড়িতে থাকে; সে কেবলই বেসুরই বাজাইয়া তোলে। আর কোনো কোনো গুণী সংসারে এই অনিবার্য দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংগীত সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের উপরেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য। সংসারের প্রতিঘাতে তাঁহাদের অবাধ স্বাতন্ত্র্যবিকাশের যে ক্ষতি হয়, মঙ্গল তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। বস্তুত দ্বন্দ্বের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্যকে প্রকাশিত হইয়া উঠিবার অবকাশ দেয়; স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতিপূরণের প্রধান উপায় হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া দেখা যাইতেছে, স্বাতন্ত্র্য আপনাকে সফলতা দিবার জন্যই আপনারই খর্বতা স্বীকার করিতে থাকে; নহিলে তাহা বিকৃতিতে গিয়া পৌঁছে এবং বিকৃতি বিনাশে গিয়া উপনীত হইবেই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে, সেখানে সে বিনাশের দিকেই চলিতেছে। অতিবৃদ্ধিদ্বারা সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; কিছুদিনের মতো উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।

অতএব মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে, তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়। বস্তুত আমাদের দুর্দান্ত স্বাতন্ত্র্য মঙ্গলসোপান হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া তবেই সম্পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়।

১৩১৩

ততঃ কিম

আহারসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিখিলেই পশুপাখির শেখা সম্পূর্ণ হয়; সে জীবলীলা সম্পন্ন করিবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া, এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হইতে হয়।

কিন্তু সামাজিক জীব বলিলেই মানুষের সব কথা ফুরায় না। মানুষকে আত্মারূপে দেখিলে সমাজে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। যাহারা মানুষকে সেইভাবে দেখিয়াছে, তাহারা বলিয়াছে,

আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জানো।

আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাহারা মানুষের চরমসিদ্ধি বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

নিচের ধাপ বরাবর উপরের ধাপেরই অনুগত। সামাজিক জীবের পক্ষে শুদ্ধমাত্র জীবলীলা সমাজধর্মের অনুবর্তী। ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি—কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিমপ্রবৃত্তি খর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমন কি, সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।

কিন্তু মানুষের সত্যকে যাহারা এইখানেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অনুগত করিবার সাধনাকেই শিক্ষা বলিয়া জানে। এক কথায় মানবাত্মার মুক্তিই তাহাদের কাছে মানবজীবনের চরমলক্ষ্য—জীবনধারণ ও সমাজরক্ষার সমস্ত লক্ষ্যই ইহার অনুবর্তী।

তবেই দেখা যাইতেছে, মানুষ বলিতে যে যেমন বুঝিয়াছে, সে সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে—কারণ, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।

আমরা প্রাচীন সংহিতায় ছাত্রশিক্ষার যে আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা কবে হইতে এবং কতদূর পর্যন্ত দেশে চলিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক বিচার করিতে আমি অক্ষম। অন্তত এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন তাঁহাদের মনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল; তাঁহারা মানুষকে কী বলিয়া জানিতেন এবং সেই মানুষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কোন্ উপায়কে সকলের চেয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

সংসারে কিছুই নিত্য নয়, অতএব সংসার অসার অপবিত্র এবং তাহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়, এইরূপ বৈরাগ্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা য়ুরোপে সাধুগণ মধ্যযুগে প্রচার করিতেন। তখন সন্ন্যাসিদলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। য়ুরোপের এখনকার ভাবখানা এই যে, সংসারটা কিছুই নয় বলিয়া মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দেবাসুরের ঝগড়া বাধাইয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয়। সংসারের হিতসাধন করাই সংসারীর জীবনের শেষ লক্ষ্য—ইহাই ধর্মনীতি। এই ধর্মনীতিকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিতে গেলে সংসারকে মায়া-ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। এই সংসারক্ষেত্রে জীবনের শেষদণ্ড পর্যন্ত পুরাদমে কাজ করিতে পারাই বীরত্ব—লাগামজোতা অবস্থাতেই মরা অর্থাৎ কাজে বিশ্রাম না দিয়াই জীবন শেষ করা ইংরেজের কাছে গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

সংসার যে অনিত্য এ-কথা ভুলিয়া, মৃত্যু যে নিশ্চিত এ-কথা মনের মধ্যে পোষণ না করিয়া, সংসারের সঙ্গে চিরন্তন-সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করায় য়ুরোপীয়জাতি একটা বিশেষ বললাভ করিয়াছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ইহারা morbid অর্থাৎ রুগ্‌ণ অবস্থা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্ররা এমন করিয়া মানুষ হইবে, যাহাতে তাহারা শেষ পর্যন্ত প্রাণপণবলে সংসারের কর্মক্ষেত্রে লড়াই করিতে পারে। জীবনকে ইহারা সংগ্রাম বলিয়া জানে; বিজ্ঞানও ইহাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, জীবিকার লড়াইয়ে যাহারা জেতে, তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া যায়। একদিকে "চাইই চাই, নহিলেই নয়" মনের এই গৃধ্নুভাবকে খুব সতেজ রাখিবার জন্য ইহাদের চেষ্টা, অপর দিকে মুঠাটাও ইহারা খুব শক্ত করিতে থাকে। আটঘাট বাঁধিয়া রশারশি কষিয়া দশ আঙুল দিয়া ইহারা আঁটিয়া ধরিতে জানে। পৃথিবীকে কোনো অংশেই এবং কোনোমতেই ছাড়িব না, ইহাই সবলে বলিতে বলিতে মাটি কামড়াইয়া মরিয়া যাওয়া ইহাদের পক্ষে বীরের মৃত্যু। সব জানিব, সব কাড়িব, সব রাখিব, এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সাধন করিবার শিক্ষাই ইহাদের শিক্ষা।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি,

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।

মৃত্যু যেন চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আছে, এই মনে করিয়া ধর্মাচরণ করিবে।

য়ুরোপের সন্ন্যাসীরাও যে এ-কথা বলে নাই, তাহা নহে এবং সংসারীকে ভয় দেখাইবার জন্য মৃত্যুর বিভীষিকাকে তাহারা সাহিত্যে, চিত্রে এবং নানাস্থানে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংহিতার মধ্যে যে ভাবটা দেখা যায়, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে।

সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের অন্ত নাই, এমন মনে করিয়া কাজ করিলে কাজ ভালো হয় কি মন্দ হয়, সে পরের কথা—কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সে-কথা মিথ্যা। সংসারে আমাদের সমুদয় সম্বন্ধেরই যে অবসান আছে, এতবড়ো সত্য কথা আর কিছুই নাই। প্রয়োজনের খাতিরে গালি দিয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইলেও সে সমানে আপনার কাজ করিয়া যায়;—সোনার রাজদণ্ডকেই যে রাজা চরম বলিয়া জানে, তাহারও হাত হইতে চরমে সেই রাজদণ্ড ধুলায় খসিয়া পড়ে; লোকালয়ে প্রতিষ্ঠা-লাভকেই যে-ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানে, সমস্ত জীবনের সমস্ত চেষ্টার শেষে তাহাকে সেই লোকালয় একলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড়ো বড়ো কীর্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং বড়ো বড়ো জাতিকেও উন্নতির নাট্যমঞ্চ হইতে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রঙ্গলীলা সমাধা করিতে হয়। এ-সব অত্যন্ত পুরাতন কথা, তবু ইহা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে।

সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে তো চলে না। অবসানের পরে যাহা অসত্য, অবসানের পূর্বে তো তাহা সত্য। যাহা যে-পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে, হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয় তো কোনোদিন কোনোদিক দিয়া সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে।

ছাত্র বিদ্যালয়ে চিরদিন পড়ে না, পড়ার একদিন অবসান হয়ই। কিন্তু যতদিন বিদ্যালয়ে আছে, ততদিন সে যদি পড়াটাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লয়, তবেই পড়ার অবসানটা প্রকৃত হয়—তবেই বিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। যদি সে জোর করিয়া বিদ্যালয় হইতে অবসর লয়, তবে চিরদিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ বিদ্যার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। পথ গম্যস্থান নয়, এ-কথা ঠিক;—পথের সমাপ্তিই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আগে পথটাকে ভোগ না করিলে তাহার সমাপ্তিটাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে পৌঁছিতে পারি। অতএব, ঠিকভাবে এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা—কোনো সম্বন্ধকে নাই বলিয়া বিমুখ হওয়াই সাধনা নহে। পথকে যদি বৈরাগ্যের জোরে ছাড়িয়া দাও, অপথে তবে সাতগুণ বেশি ঘুর খাইয়া মরিতে হইবে।

জর্মান মহাকবি গ্যয়টে তাঁহার ফাউস্ট নাটকে দেখাইয়াছেন, যে-ব্যক্তি মানব-

প্রবৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া সংসারের লীলাভূমি হইতে উচ্চে নিভৃতে বসিয়া জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, সংসারের ধুলার উপরে বহুজোরে আছাড় খাইয়া তাহাকে কেমনতরো শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল। মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ করিয়া যেটুকু ফাঁকি দিতে যাইব, সেটুকু তো শোধ করিতেই হইবে, তাহার উপরে আবার ফাঁকির চেষ্টার জন্য দণ্ড আছে। বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

বস্তুত গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই দুটাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। দুইকে যথার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি—উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন ও মুক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, যেখানেই অনুরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটিয়াছে সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ। সেইখানেই আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না; সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অন্যের দিকে তাকাই না; সেইখানেই আমরা যাহাকে ভোগ করি, তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না—অন্ত দেখিলে বিধাতাকে ধিক্‌কার দিয়া হাহাকার করিতে থাকি; সেখানেই কর্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্মেও আমাদের বিদ্বেষ; সেখানেই কোনোকিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, অপঘাতমৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাৎ বিলোপ।

জীবনটাকে না হয় যুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধ ব্যাপারে যদি কেবল ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিদ্যা আমাদের শেখা থাকে, ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল আমরা না জানি, তবে সপ্তরথী ঘিরিয়া যে আমাদিগকে মারিবে। সেরূপ মরিয়াও আমরা বীরত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে জয় তো তাহাকে বলে না। অপর পক্ষে, যাহারা ব্যূহের মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতেই বিরত, সেই কাপুরুষদের বীরের সদ্‌গতি নাই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া, এই দুয়ের দ্বারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন—বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়ত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল, এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

এই সামঞ্জস্যকে আশ্রয় করিতে হইলে প্রথমে মানুষকে সত্যভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে চলিবে না। আমরা যদি আম্রকে অম্বল খাওয়ার দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখি না ; এইজন্য তাহার স্বাভাবিক পরিণামে বাধা ঘটাই ; তাহাকে কাঁচা পাড়িয়া আনিয়া তাহার কষিটাকে মাটি করিয়া দিই। গাছকে যদি জ্বালানি কাঠ বলিয়াই দেখি, তবে তাহার ফলফুলপাতার কোনো তাৎপর্যই দেখিতে পাই না। তেমনি মানুষকে যদি রাজ্যরক্ষার উপায় মনে করি, তবে তাহাকে সৈনিক করিয়া তুলিব, তাহাকে যদি জাতীয়সমৃদ্ধিবৃদ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাকে বণিক করিবার একান্ত চেষ্টা করিব—এমনি করিয়া আমাদের আবহমান সংস্কার অনুসারে যেটাকেই আমরা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অভিলষিত বলিয়া জানি, মানুষকে তাহারই উপকরণ-মাত্র বলিয়া দেখিব ও সেই প্রয়োজনসাধনকেই মানুষের সার্থকতা বলিয়া মনে করিব। এমন করিয়া দেখাতে কোনো হিত হয় না, তাহা নহে—কিন্তু সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া শেষকালে অহিত আসিয়া পড়ে—এবং যাহাকে তারা মনে করিয়া আকাশে উড়াই তাহা খানিকক্ষণ ঠিক তারার মতোই ভঙ্গি করে, তাহার পরে পুড়িয়া ছাই হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশে একদিন মানুষকে সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে কিরূপ বড়ো করিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহা সাধারণে প্রচলিত একটি চাণক্যশ্লোকেই দেখা যায়—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।

মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো। অন্তত কাহারও চেয়ে ছোটো নয়। প্রথমে মানুষের আত্মাকে এইরূপে সমস্ত দেশিক ও ক্ষণিক প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ও বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার সত্যসম্বন্ধ, জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান, নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে তাই করা হইয়াছিল ; শাস্ত্রকারগণ মানুষের আত্মাকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রহ্মের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি। আর যাহাতেই মানুষকে শেষ করিয়া দেখ, তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেখা হয়—তাহাকে citizen করিয়া দেখো, কিন্তু কোথায় আছে city আর কোথায় আছে সে, cityতে তাহার পর্যাপ্তি নহে ; তাহাকে patriot করিয়া দেখো, কিন্তু দেশেই তাহার শেষ পাওয়া যায় না, দেশ তো জলবিম্ব ; সমস্ত পৃথিবীই বা কী।

ভর্তৃহরি, যিনি এক সময়ে রাজা ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্॥

সকলকাম্যফলপ্রদ লক্ষ্মীকেই না হয় লাভ করিলে, তাহাতেই বা কী; শত্রুদের মাথার উপরেই না হয় পা রাখিলে, তাহাতেই বা কী; না হয় বিভবের বলে বহু সুহৃদ সংগ্রহ করিলে, তাহাতেই বা কী; দেহধারীদের দেহগুলিকে না হয় কল্পকাল বাঁচাইয়া রাখিলে তাহাতেই বা কী।

অর্থাৎ এই সমস্ত কামনার বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়ো। মানুষের সেই যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞান-ভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া ছোটো করিয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া লই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা মানুষের আত্মাকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ য়ুরোপের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে—তাঁহারা জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত খাটিয়া মরাকে গৌরবের বিষয় মনে করেন নাই—কর্মকেই তাঁহারা শেষলক্ষ্য না করিয়া কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করাই চরম সাধনার বিষয় বলিয়া জানিয়াছিলেন। আত্মার মুক্তিই যে প্রত্যেক মানুষের একমাত্র শ্রেয়, এবিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না।

য়ুরোপে স্বাধীনতার গৌরব সকল সময়েই গাওয়া হইয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করিবার স্বাধীনতা, ভোগ করিবার স্বাধীনতা, কাজ করিবার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বড়ো কম জিনিস নয়—এ সংসারে ইহাকে রক্ষা করিতে অনেক শক্তি এবং আয়োজন আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ ইহার প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল—ততঃ কিম্। এ স্বাধীনতাকে সে স্বাধীনতা বলিয়াই স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষ কামনার উপরে, কর্মের উপরেও স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু স্বাধীন হইলাম মনে করিলেই তো স্বাধীন হওয়া যায় না।—নিয়ম অর্থাৎ অধীনতার ভিতর দিয়া না গেলে স্বাধীন হওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যদি বড়ো

১৩।২৮

মনে কর, তবে সৈনিকরূপে অধীন হইতে হইবে, বণিকরূপে অধীন হইতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কত লক্ষ সৈনিক আছে, তাহারা কি স্বাধীন? মনুষ্যত্বকে যে তাহারা মানুষমারা কলে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সজীব বন্দুকমাত্র। কত লক্ষ মজুর খনির অন্ধ রসাতলে, কারখানার অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যশ্রীর পায়ের তলায় বুকের রক্ত দিয়া আলতা পরাইতেছে। তাহারা কি স্বাধীন? তাহারা তো নির্জীব কলের সজীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। য়ুরোপে স্বাধীনতার ফলভোগ করিতেছে কয়জন? তবে স্বাধীনতা কাহাকে বলে? Individualism অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেশি কি অন্যত্র দেখা গিয়াছে?

ইহার উত্তরে একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিতে হয়। পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়াই স্বাতন্ত্র্যে যাইবার পথ। বাণিজ্যে তুমি যতবড়ো লাভের টাকা আনিতে চাও, ততবড়ো মূলধনের টাকা ফেলিতে হইবে। টাকা কিছুই খাটিতেছে না, কেবলই লাভ করিতেছে, ইহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য তেমনি সুদের মতো, বিপুল পরতন্ত্রতা খাটাইয়া তবে সেইটুকু লাভ হইতেছে—আগাগোড়া সমস্তটাই লাভ, আগাগোড়া সমস্তই স্বাধীনতা, এ কখনো সম্ভবপর নহে।

আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল Individualism—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সে তো কোনো ছোটোখাটো স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একেবারে মুক্তিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতিদিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সেই মুক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেমনি নিয়মসংযমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তির পরিণামকে লক্ষ্য হইতে বাদ দিয়া যদি কেবল নিয়ম-সংযমকেই একান্ত করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়, আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা বড়ো বেশি।

আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে, তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখি উড়িয়া পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনও নানাবিধ বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মুক্তির আদর্শ, তাহা তো নষ্ট হইতেছেই; য়ুরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ, তাহার পথেও পদে

পদে বাধা পড়িতেছে। সাত্বিকতার যে পূর্ণতা তাহা ভুলিয়াছি, রাজসিকতার যে ঐশ্বর্য তাহাও দুর্লভ হইয়াছে, কেবল তামসিকতার যে নিরর্থক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। অতএব এখনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে-বিচারে আটেঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ, তবে মনে রাগ হইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন। পুকুর যখন শুকাইয়া গেছে, তখন তাহাকে যদি কেহ গর্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃকসম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এককালে যতই সুগভীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্তটাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেও মুক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধাবাঁধি, অনাবশ্যক আচারবিচারের দ্বারাই বুঝা যায়। য়ুরোপেও কালক্রমে যখন শক্তির হ্রাস হইবে, তখন বাঁধনের অসহ্য ভারের দ্বারাই তাহার পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার পরিমাপ হইবে। এখনই কি ভার অনুভব করিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে না? এখনই কি তাহার উপায় ক্রমশ উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে না?

কিন্তু সে তর্ক থাক্; আসল কথা এই, যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে, তবে নিয়মসংযমের বন্ধনই মুক্তির একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়া বাঁধে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন—ছুটিতে হইবে বলিয়া, দূরের লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষলক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে—সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।

এইরূপে বন্ধন ও মুক্তি, উপায় ও উদ্দেশ্য, উভয়কেই মান্য করিবার কথা প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃতলাভ। সংসারের ভিতর দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তার পরে ব্রহ্মলাভের কথা— সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কর্ম করিয়া শতবৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে,—হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই; কর্মে লিপ্ত হইবে না, এমন পথ নাই।

মানুষকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্মকে ও কর্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে-কথাটি মনে রাখিতে হইবে, তাহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে।

এবং

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন—তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন-নির্বাহের গোড়াকার কথা।

ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই—সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখণ্ড-পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।

য়ুরোপে মানুষের জীবনের দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা—তাহার পরে সংসারের কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্তু কাজ জিনিসটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্যস্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই; সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেসশব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase—শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

যাহা হাতে পাওয়া যায়, তাহাতে সুখ নাই, এ-কথা কি আমরাও বলি না? আমরাও বলি—

> নিঃস্বো ব্যষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং ত্বাশাবধিং কো গতঃ॥

এক কথায়, যে যাহা পায়, তাহাতে তাহার আশা মিটে না—যতই বেশি পাও না কেন, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অন্ত হইবে কেমন করিয়া? পাওয়াতে যখন চাওয়ার শেষ নহে, তখন অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইয়া মরাই মানুষের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়।

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক

জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্যস্থাপন করি, তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এতবড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এতবড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে, আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ-কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ-কথা বলিতে হইবে, তান যতই মনোহর হউক, তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যু দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পুরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইস্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, এ-কথা ঠিক; জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উন্নতি-অবনতির ঢেউখেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সংসারলীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কী হইল?

বাহিরে কিছুর শেষ নাই, কেবলই একটা হইতে আর-একটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই চির-চলমান বহিঃসংসারের দোলায় দুলিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি—আমার পক্ষে একদিন সে-দোলার কাজ ফুরাইলেও কোনোদিন একবারে তাহার কাজ শেষ হইবে না। এই কথা মনে করিয়া, আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরের এই অশেষের মধ্যে আমিসুদ্ধ ভাসিয়া গেলে নষ্ট হইতে হইবে। অন্তরের মধ্যে একটা সমাধার পন্থা আছে। বাহিরে উপকরণের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে সন্তোষ আছে; বাহিরে দুঃখবেদনার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ধৈর্য আছে; বাহিরে প্রতিকূলতার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ক্ষমা আছে; বাহিরে লোকের সহিত সম্বন্ধভাবের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে প্রেম আছে; বাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিন্তু আত্মাতে আত্মা সম্পূর্ণ। একদিকের অশেষের দ্বারাতেই আর-একদিকের অখণ্ডতার উপলব্ধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। গতির দ্বারাতেই স্থিতিকে মাপিয়া লইতে হয়।

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপ বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন,

ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষেরও ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। সেই স্বাভাবিক ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্যন্ত একটি অখণ্ড তাৎপর্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

আধুনিককালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম, তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্বে পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা যৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া আসিলেও আমরা প্রাণপণে কাজ করিতে চেষ্টা করি। মুষ্টি যখন স্বভাবতই শিথিল হইয়া আসে, তখনও আমরা কোনোমতেই কোনো-কিছুর দখল ছাড়িতে চাই না। প্রভাত ও মধ্যাহ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের আর-কোনো অংশকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। অবশেষে যখন আমাদের চেয়ে প্রবলতর শক্তি কানে ধরিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করায়, তখন হয় বিদ্রোহ, নয় বিষাদ উপস্থিত হয়—তখন আমাদের সেই পরাভব কেবল রণে ভঙ্গরূপেই পরিণত হয়, তাহাকে কোনো কাজে লাগাইতেই পারি না। যে পরিণামগুলি নিশ্চয় পরিণাম, তাহাদিগকে সহজে গ্রহণ করিবার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কিছুই নিজে ছাড়িয়া দিই না, সমস্ত নিজের কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিই। সত্যকে অস্বীকার করি বলিয়া পদেপদেই সত্যের নিকটে পরাস্ত হইতে থাকি।

কাঁচা আম শক্ত বোঁটা লইয়া ডালকে খুব জোরে আকর্ষণ করিয়া আছে, তাহার অপরিণত আঁটির গায়ে তাহার অপরিণত শাঁস আঁটিয়া লাগিয়া আছে। কিন্তু প্রত্যহ সে যতটুকু পাকিতেছে, ততটুকু পরিমাণে তাহার বোঁটা ঢিলা হইতেছে, তাহার আঁটি শাঁস হইতে আলগা, সমস্ত ফলটা গাছ হইতে পৃথক হইয়া আসিতেছে। ফল যে একদিন গাছের বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, ইহাই তাহার সফলতা—গাছকে চিরকাল আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলেই সে ব্যর্থ। ফলের মতো আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিও একদিন সংসারের ডাল হইতে সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষকালে এই ডালকে ত্যাগ করিয়া ধূলিসাৎ হয়। ইহা জগতের নিয়মেই হয়, ইহার উপরে

আমাদের হাত নাই। কিন্তু ভিতরে যেখানে আমাদের স্বাধীন মনুষ্যত্ব, যেখানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির লীলা, সেখানকার পরিণতির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিই একটা প্রধান শক্তি। এঞ্জিনের বয়লারের গায়ে যে তাপমান যন্ত্রটা আছে, তাহার পারা স্বভাবের নিয়মেই ওঠে বা নামে, কিন্তু ভিতরের আগুনের আঁচটাকে এই সংকেত বুঝিয়া বাড়াইব কি কমাইব, তাহা এঞ্জিনিয়ারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও কর্মে উৎসাহকে বাড়াইব কি কমাইব, তাহা আমাদের হাতে। সেই যথাসময়ে বাড়ানো-কমানোর দ্বারাতেই আমরা সফলতালাভ করি।

পাকা ফলে একদিকে বোঁটা দুর্বল ও শাঁস আলগা হইতে থাকে বটে, তেমনি অন্যদিকে তাহার আঁটি শক্ত হইয়া নূতন প্রাণের সম্বল লাভ করিতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই হরণ-পূরণ আছে। আমাদেরও বাহিরে হ্রাসের সঙ্গে ভিতরে বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু ভিতরের কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা বলবান বলিয়া এই বৃদ্ধি এই পরিণতি আমাদের সাধনার অপেক্ষা রাখে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, শরীরের তেজ কমিল, মানুষ তাহার আয়ুর শেষপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু কোনোমতেই সহজে সংসার হইতে আপন বোঁটা আলগা হইতে দিল না—প্রাণপণে সমস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, এমন কি, মৃত্যুর পরেও সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার ইচ্ছাই বলবান রহিবে, ইহা লইয়া জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল। আধুনিককাল ইহাকে গর্বের বিষয় মনে করে, কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার আর কোনো কর্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা বাড়ার একটা সীমায় আসিলে তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইখানে পুষ্ট শরীর, শিক্ষিত মন ও সবল প্রবৃত্তি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহার দ্বিতীয় শরীর, তাহার বৃহৎ কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ ও প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা লইয়া আপন ক্ষুদ্রসংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে; তাহার শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধি একদিকে সাধারণমানবের কাজে লাগিতে থাকে, অন্যদিকে সে অবসন্নপ্রায়

মানবজীবনের সঙ্গে নিত্যজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ির বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া দিয়া সে অতিসহজে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও অনন্তলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবজন্মকে শেষপরিণতি দান করে।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অনুকূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়-শিক্ষা কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না, তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য। নিয়মসংযমের অভ্যাসদ্বারা এমন একটি বললাভ হইত, যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি, সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির সহিত নিষ্ঠার সহিত অতিসাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরমসত্য, সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

বাহিরের শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্যক্রিয়া প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গাছপালায় এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মতো ঘটে। আলোকের বাতাসের খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেইরূপ ঘটে। জিহ্বায় খাদ্যসংযোগের উত্তেজনায় আপনি রস ক্ষরিয়া আসে, পাকযন্ত্রেও খাদ্যের সংস্পর্শে সহজেই পাকরসের উদ্রেক হয়। আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বাহিরের বিশ্বশক্তির সহজ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু আমাদের আবার মন বলিয়া ইচ্ছা বলিয়া আর-একটা পদার্থ যোগ হওয়াতে প্রাণের উপর আর একটা উপসর্গ বাড়িয়া গেছে। খাইবার অন্যান্য উত্তেজনার সঙ্গে খাইবার আনন্দ একটা আসিয়াছে। তাহাতে করিয়া আহারের কাজটা শুধু আমাদের আবশ্যকের কাজ নহে, আমাদের খুশির কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ বাড়িয়া গেছে। দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছা-শক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতিযন্ত্রের সাধনা বড়ো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির সুর অনেকদিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সেজন্য বড়ো ভাবিতে হয় না, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সুরবাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্চাট পোহাইতে হয়। খাদ্যসম্বন্ধে প্রাণশক্তির আবশ্যক

হয়তো ফুরাইল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার তাগিদ শেষ হইল না—শরীরের আবশ্যকসাধনে সে যে আনন্দ পাইল, সেই আনন্দকে সে আবশ্যকের বাহিরেও টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল—সে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিমুখ রসনাকে রসসিক্ত করিতে ও শ্রান্ত পাক-যন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এমনি করিয়া বাহিরের সহিত প্রাণের এবং প্রাণের সহিত মনের একতানতা নষ্ট করিয়া সে নানা অনাবশ্যক চেষ্টা, অনাবশ্যক উপকরণ ও শাখাপল্লবায়িত দুঃখের সৃষ্টি করিয়া চলিল। আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহই যথেষ্ট দুরূহ, তাহার উপরে ভূরিপরিমাণ অনাবশ্যকের বোঝা চাপিয়া সেই আবশ্যকের আয়োজনও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়—ইচ্ছা যখন একবার স্বভাবের সীমা লঙ্ঘন করে, তখন কোথাও তাহার আর থামিবার কারণ থাকে না, তখন সে "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে"—কেবল সে চাই চাই করিয়া বাড়িয়াই চলে। পৃথিবীতে নিজের এবং পরের পনেরো আনা দুঃখের কারণ ইহাই। অথচ এই ইচ্ছা-শক্তিকেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এইজন্য ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে একসুরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরমলক্ষ্য। গোড়ায় তাহা যদি না করি, তবে আমাদের চঞ্চল মনে জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট, প্রেম কলুষিত ও কর্ম বৃথা পরিভ্রান্ত হইতে থাকে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম বিশ্বের সহিত সহজ মিলনে মিলিত না হইয়া আমাদের আত্মম্ভরি ইচ্ছার কৃত্রিম সৃষ্টিসকলের মধ্যে মরীচিকা-অনুসরণে নিযুক্ত হইতে থাকে।

এইজন্য আমাদের আয়ুর প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্যপালনদ্বারা ইচ্ছাকে তাহার যথাবিহিত সীমার মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহাতে আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানসপ্রকৃতির সুর বাঁধা হইয়া আসিবে। তাহার পরে সেই সুরে তোমার সাধ্যমতো ও ইচ্ছামতো যে-কোনো রাগিণী বাজাও না কেন, সত্যের সুরকে মঙ্গলের সুরকে আনন্দের সুরকে আঘাত করিবে না।

এইরূপে শিক্ষার কাল যাপন করিয়া সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মনু বলিয়াছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা না করিয়া সেরূপ সংযমন করা যায় না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিত্যশ যেমন করিয়া করা যায়।

অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জ্ঞান পূর্ণতালাভ করে না, এবং যে সংযম জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ নহে, তাহা পূর্ণসংযম নহে—তাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞতার অন্তরাল-মাত্র—তাহা প্রকৃতির মূলগত নহে, তাহা বাহ্যিক।

সংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করিবার শিক্ষা ও সাধনা থাকিলেই কর্ম, বিশেষত মঙ্গলকর্ম করা সহজ ও সুখসাধ্য হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম জগতের কল্যাণের আধার হইয়া উঠে। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম মানুষের মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধা নহে, সহায় হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহস্থ যে-কোনো কর্ম করেন, তাহা সহজে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। গৃহের সমস্ত কর্ম যখন মঙ্গলকর্ম হয়,—তাহা যখন ধর্মকর্ম হইয়া উঠে, তখন, সেই কর্মের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া একেবারে জর্জরীভূত করিয়া দেয় না। যথাসময়ে সে-বন্ধন অনায়াসে স্খলিত হইয়া যায়, যথাসময়ে সে-কর্মের একটা স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি আপনি আসে।

আয়ুর দ্বিতীয় ভাগকে এইরূপে সংসারধর্মে নিযুক্ত করিয়া শরীরের তেজ যখন হ্রাস হইতে থাকিবে, তখন এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রের কাজ শেষ হইল – সেই খবরটা আসিল। শেষ হইল খবর পাইয়া চাকরি-বরখাস্ত হতভাগার মতো নিজেকে দীন বলিয়া দেখিতে হইবে না। আমার সমস্ত গেল, ইহাকেই অনুশোচনার বিষয় করিলে চলিবে না, এখন আরও বড়ো পরিধিবিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া সেইদিকে আশার সহিত বলের সহিত মুখ ফিরাইতে হইবে। যাহা গায়ের জোরের, যাহা ইন্দ্রিয়শক্তির, যাহা প্রবৃত্তিসকলের ক্ষেত্র ছিল, তাহা এবারে পিছনে পড়িয়া রহিল—সেখানে যাহা-কিছু ফসল জন্মাইয়াছি, তাহা কাটিয়া মাড়াই করিয়া গোলা বোঝাই করিয়া দিয়া এ মজুরি শেষ করিয়া চলিলাম—এবার সন্ধ্যা আসিতেছে—আপিসের কুঠরি ছাড়িয়া বড়ো রাস্তা ধরিতে হইবে। ঘরে না পৌঁছিলে তো চরমশান্তি নাই। যেখানে যত-কিছু সহিলাম, কত-কিছু খাটিলাম, সে কিসের জন্য ? ঘরের জন্য তো ? সেই ঘরই ভূমা—সেই ঘরই আনন্দ—যে আনন্দ হইতে আমরা আসিয়াছি, যে আনন্দে আমরা যাইব। তাহা যদি না হয়, তবে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।

তাই গৃহাশ্রমের কাজ সারিয়া সন্তানের হাতে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া এবার বড়ো রাস্তায় বাহির হইবার সময়। এবার বাহিরের খোলা বাতাসে বুক ভরিয়া লইতে হইবে—খোলা আকাশের আলোতে দৃষ্টিকে নিমগ্ন এবং শরীরের সমস্ত রোমকূপকে পুলকিত করিতে হইবে। এবার একদিককার পালা সমাধা হইল। আঁতুড়ঘরে নাড়ি কাটা পড়িল, এখন অন্য জগতে স্বাধীন সঞ্চরণের অধিকার লাভ করিতে হইবে।

শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার পূর্বে কিছুকাল মাতার কাছেকাছেই থাকে। বিযুক্ত হইয়াও যুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বানপ্রস্থ-আশ্রমও সেইরূপ। সংসারের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও বাহিরের দিক

হইতে সংসারের সঙ্গে সেই তৃতীয়-আশ্রমধারীর যোগ থাকে। বাহিরের দিক হইতে সে সংসারকে আপনার জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের ফলদান করে এবং সংসার হইতে সহায়তা গ্রহণ করে। এই দান-গ্রহণ সংসারীর মতো একান্তভাবে করে না, মুক্তভাবে করে।

অবশেষে আয়ুর চতুর্থভাগে এমন দিন আসে, যখন এই বন্ধনটুকুও ফেলিয়া একাকী সেই পরম একের সম্মুখীন হইতে হয়। মঙ্গলকর্মের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধকে পূর্ণপরিণতি দান করিয়া আনন্দস্বরূপের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সমস্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া নানা কর্ম সমাধা করিয়া স্বামীরই কর্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থভাবে স্বীকার করেন; অবশেষে দিন-অবসান হইলে একে একে কাজের জিনিসগুলি তুলিয়া রাখিয়া, কাজের কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া, কর্মস্থানের চিহ্ন মুছিয়া নির্মল মিলনবেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণসম্বন্ধের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য নির্জনগৃহে প্রবেশ করেন, সমাপ্তকর্ম পুরুষ সেইরূপ একে একে কাজের জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচাইয়া দিয়া অসীমের সহিত সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবশেষে একাকী সেই একের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পূর্ণ জীবনকে এই পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড সার্থকতা দান করেন। এইরূপেই মানবজীবন আদ্যোপান্ত সত্য হয়, জীবন মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে বৃথা চেষ্টা করে না ও মৃত্যু শত্রুপক্ষের ন্যায় জীবনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক পরাস্ত করে না। জীবনকে আর আমরা যেমন করিয়াই খণ্ডবিখণ্ড-বিক্ষিপ্ত করি, অন্য যে-কোনো অভিপ্রায়কেই আমরা চরম বলিয়া জ্ঞান করি এবং তাহাকে আমরা দেশ-উদ্ধার, লোকহিত বা যে-কোনো বড়ো নাম দিই না কেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণতা থাকে না—তাহা আমাদিগকে মাঝপথে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে, তাহার মধ্য হইতে এই প্রশ্নই কেবলই বাজিতে থাকে—ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্। আর ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়বয়স ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসংগীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয়। বিদ্রোহ-বিরোধ থাকে না; অশিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে-সকল গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিখিলের সহিত সহজ-সত্যসম্বন্ধ-ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠিতে হয় না।

আমি জানি, এইখানে একটা প্রশ্ন উদয় হইবে যে, একটা দেশের সকল লোককেই কি এই আদর্শে গড়িয়া তোলা যায়? তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, যখন

ঘরে আলো জলে, তখন কি পিলসুজ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্যন্ত প্রদীপের সমস্তটাই জলে ? জীবনযাপনসম্বন্ধে ধর্মসম্বন্ধে যে-দেশের যে-কোনো আদর্শই থাক্ না কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উজ্জলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিতার ডগাটামাত্র জলাকেই সমস্ত দীপের জলা বলে। তেমনি দেশের এক অংশমাত্র যে ভাবকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন, সমস্ত দেশেরই তাহা লাভ। বস্তুত সেই অংশটুকুমাত্রকে পূর্ণতা দিবার জন্য সমস্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে হয়, সমস্ত সমাজকে অনুকূল হইতে হয়—ডালের আগায় ফল ধরাইতে গাছের শিকড় এবং গুঁড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে, আমাদের দেশের মান্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ সত্য এবং সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর-সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের উর্ধ্বে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিবেই। একদিন ভারতবর্ষে ঋষিরা যখন ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন, তখন সমস্ত আর্যসমাজের মধ্যেই—রাজকার্যে যুদ্ধে বাণিজ্যে সাহিত্যে শিল্পে ধর্মার্চনায়—সর্বত্রই সেই ব্রহ্মের সুর বাজিয়াছিল, কর্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিয়াছিল—ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজস্থিতি মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতেছিল, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।" সে বাণী চিরদিনের মতোই নীরব হইয়া গেছে এমনিই যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে আমাদের এই মৃতসমাজকে এত উপকরণ জোগাইয়া বৃথা সেবা করিয়া মরিতেছি কেন ? তবে তো এই মুহূর্তেই আপাদমস্তকে পরজাতির অনুকরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়—কারণ, পরিণামহীন ব্যর্থতার বোঝা অকারণে বহিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সজীবভাবে কিছু-একটা হইয়া উঠার চেষ্টা করা ভালো। কিন্তু এ-কথা কখনোই মানিব না। আমাদের প্রকৃতি মানিবে না। যতই দুর্গতি হউক, আমাদের অন্তরতম স্থান এমনভাবে তৈরি হইয়া আছে যে, কোনো অসম্পূর্ণ অধিকারকে আমাদের মন পরমলাভ বলিয়া সায় দিতে পারিবে না। এখনও যদি কোনো সাধক তাঁহার জীবনের যন্ত্রে সংসারের সকল চাওয়া সকল পাওয়ার চেয়ে উচ্চতম সপ্তকে একটা বড়ো সুর বাজাইয়া তোলেন, সেটা আমাদের হৃদয়ের তারে তখনই প্রতিঝংকৃত হইতে থাকে—তাহাকে আমরা ঠেকাইতে পারি না। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতাকে আমরা যতবড়ো কণ্ঠে যতবড়ো করিয়াই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহা আমাদের মনের বহির্দ্বারে একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে মাত্র। আমাদের সমাজে আজকাল বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে দেশী রোশনচৌকির সঙ্গে সঙ্গে একইকালে গড়ের বাদ্য বাজানো হয় দেখিতে পাই। ইহাতে

সংগীত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল একটা সুরের গণ্ডগোল হইতে থাকে। এই বিষম গণ্ডগোলের ঝঞ্চনার মধ্যে মনোযোগ দিলেই বুঝা যায় যে, রোশনচৌকির বৈরাগ্যগাম্ভীর্য মিশ্রিত করুণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে, আর গড়ের বাদ্য তাহার প্রচণ্ড কাংস্যকণ্ঠ ও স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে অভ্রভেদী করিয়া সমস্ত গভীরতর অন্তরতর সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের মঙ্গল-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্বপরিপূর্ণ অসামঞ্জস্যকেই অত্যুৎকট করিয়া তুলিতেছে—তাহা আমাদের উৎসবের চিরদিনের বেদনার সঙ্গে আপনার সুর মিলাইতেছে না। আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতরো একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে; তাহার অসংগত ক্ষীণ অনুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর-আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড়ো জয়ঢাকটা কাঠি পিটাইয়া খুবই শব্দ করিতেছে, কিন্তু যে আমাদের অন্তঃপুরের খবর রাখে, সে জানে, সেখানকার মঙ্গলশঙ্খ এই বাহ্যাড়ম্বরের ধমকে নীরব হইয়া যায় নাই, ভাড়া-করা গড়ের বাদ্য একসময় যখন গড়ের মধ্যে ফিরিয়া যায়, তখনও ঘরের এই শঙ্খ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধ্বনি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না। আমরা সকলের চেয়ে বড়ো সুর যাহা শুনিয়াছি, এ সুর যে তাহাকে আঘাত করিতেছে—আমাদের অন্তরাত্মা এক জায়গায় ইহাকে কেবলই অস্বীকার করিতেছে।

আমরা কোনোদিন এমনতরো হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর পাঁচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য নাই, শিষ্টতাশীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্যাদা ছিল যে, দারিদ্র্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আমাদের গৌরব নষ্ট করিতে পারিত না। কর্ণ যেমন তাঁহার কবচকুণ্ডল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে আমরা সেইরূপ একটা স্বাভাবিক আভিজাত্যের কবচ লইয়াই

জন্মিতাম। সেই কবচেই আমাদিগকে বহুদিনের অধীনতা ও দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—আমাদের সম্মান নষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, আমাদের সে সম্মান বাহিরের আহরণ-করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজাত কবচখানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইয়া লইল। ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপায় চলিয়া গেছে। এখন আমরা বিশ্বের মধ্যে লজ্জিত। এখন আমাদের বেশে-ভূষায় আয়োজনে-উপকরণে একটু কোথাও কিছু খাটো পড়িয়া গেলেই আমরা আর মাথা তুলতে পারি না। সম্মান এখন বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে, তাই উপাধির জন্য খ্যাতির জন্য আমরা বাহিরের দিকে ছুটিয়াছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছি, এবং কোথাও একটু-কিছু ছিদ্র বাহির হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে মিথ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহার অন্ত কোথায়? যে ভদ্রতা আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল, তাহাকে আজ যদি বাহিরে টানিয়া জুতার দোকান, কাপড়ের দোকান, ঘোড়ার হাট এবং গাড়ির কারখানায় ঘোরাইতে আরম্ভ করি, তবে কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে বলিব, বস্, হইয়াছে, এখন বিশ্রাম করো। আমরা সন্তোষকেই সুখের পূর্ণতা বলিয়া জানিতাম; কারণ, সন্তোষ অন্তরের সামগ্রী—এখন সেই সুখকে যদি হাটে-হাটে ঘাটে-ঘাটে খুঁজিয়া ফিরিতে হয়, তবে কবে বলিতে পারিব, সুখ পাইয়াছি। এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে, বিলাতি গৃহসজ্জার অভাবে উপহাস করে, চেকবহির অঙ্কপাতের ন্যূনতায় তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে—এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর, তাহাই আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আর যে-সকল পরিণামহীন উত্তেজনা উন্মাদনাকে আমরা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের মতো বহির্বিষয়ে পরাধীন জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসানুদাস করিয়াছে।

কিন্তু তবু বলিতেছি, এই উপসর্গ এখনও আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এখনও ইহা বাহিরেই পড়িয়া আছে; এবং বাহিরে আছে বলিয়াই ইহার কলরব এত বেশি—সেইজন্যই ইহার এত আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির প্রয়োজন হয়। এখনও এ আমাদের গভীরতর স্বভাবের অনুগত হয় নাই বলিয়াই সন্তরণ-মূঢ়ের সাঁতারকাটার মতো ইহাকে লইয়া আমাদিগকে এমন উন্মত্তের ন্যায় আস্ফালন করিতে হয়।

কিন্তু একবার কেহ যদি আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত এ-কথা বলেন যে, "অসম্পূর্ণ প্রয়াসে, উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়, অনিত্য ঐশ্বর্যে আমাদের শ্রেয় নহে—জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে, সকল কর্ম সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ

পরিসমাপ্তি আছে, এবং সেই পরিণাম সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা ;—তাহার নিকটে আর সমস্তই তুচ্ছ”—তবে আজও এই হাট-বাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদয় সায় দিয়া উঠে, বলে, “সত্য, ইহাই সত্য, ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই।” তখন, ইস্কুলে যে-সকল ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিয়াছিলাম ; কাড়াকাড়ি-মারামারির কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানকেই সর্বোচ্চ সিংহাসনে নররক্ত দিয়া অভিষেক করিবার কথা অত্যন্ত ক্ষীণ-খর্ব হইয়া আসে ; তখন লালকুর্তিপরা অক্ষৌহিণী সেনার দম্ভ, উদ্যতমাস্তুল বৃহদাকার যুদ্ধ-জাহাজের ঔদ্ধত্য আমাদের চিত্তকে আর অভিভূত করে না ;—আমাদের মর্মস্থলে ভারতবর্ষের বহুযুগের একটি সজলজলদগম্ভীর ওংকারধ্বনি নিত্যজীবনের আদিসুরটিকে জগতের সমস্ত কোলাহলের উর্ধ্বে জাগাইয়া তুলে। ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না ; যদি করি, তবে ইহার পরিবর্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না, যাহার দ্বারা আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। আমরা কেবলই তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কলকারখানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণস্তূপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভান করিতেছে, তাহার উৎকটমূর্তি দেখিয়া সমস্ত মনেপ্রাণে কেবলই পরাস্তপরাভূত হইতে থাকিব, কেবলই সংকুচিতশঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মতো ফিরিয়া বেড়াইব।

অথচ এ-কথাও আমি কোনোমতেই স্বীকার করি না যে, আমরা যাহাকে শ্রেয় বলিতেছি, তাহা কেবল আমাদের পক্ষেই শ্রেয়। আমরা অক্ষম বলিয়া ধর্মকে দায়ে পড়িয়া বরণ করিতে হইবে, তাহাকে দারিদ্র্য গোপন করিবার একটা কৌশলস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এ-কথা কখনোই সত্য নহে। প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কোনো-একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে ; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসংগত পূর্ণতাৎপর্য পাওয়া যায়। তবেই সমুদ্র হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া পর্বতের রহস্যগূঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমস্ত যাত্রাশেষে আবার তাহাকে সেই সমুদ্রের মধ্যেই পূর্ণতররূপে সম্মিলিত হইতে

দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। মাঝপথে যেখানেই হউক, তাহার অকস্মাৎ অবসান অসংগত অসমাপ্ত। এ-কথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি, তবে বলিতেই হইবে, এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ ; মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে—নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।

১৩১৩

আনন্দরূপ

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব। সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে।

কিন্তু উপনিষদ্ এ-কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন। কিন্তু তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন। কোথায় ?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোথায় প্রকাশমান ?—এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? যাহা অপ্রকাশিত, তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত, তাহাকে "কোথায়" বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায় ?

প্রকাশ কোন্খানে ? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই যে অধোতে, এই যে উর্ধ্বে—এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই তো প্রকাশ, এ-ছাড়া আর প্রকাশ কোথায় ?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল ? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর তো কোনো কারণ থাকিতেই পারে

১৩।২৯

না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে, এ-সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকেও ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার। এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কই? এই যে দশদিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য, কী সৌন্দর্য। সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন—লোকে-লোকান্তরে সে-দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না—যুগে-যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না। কে বলে, তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে, তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে, তিনি ধরা দেন না। তিনিই যে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে। যদি ধরিতেই চাও, তবে বাহু কতদূর বিস্তার করিলে সে-ধরার অন্ত হইবে। এ যে আশ্চর্য। মানুষজন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কী চোখই মেলিয়াছি। এ কী দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্যলীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে বায়ুর স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎ-তন্ত্রীখচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত-ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম—পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমেয় প্রাচুর্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীটপতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারা-সূর্যচন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।

ধূলিকে আজ ধূলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃণকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ো না,—তোমার ইচ্ছায় এ ধূলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পার না, এ ধূলি তাঁহার ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ শ্যামল তৃণ তাঁহারই আনন্দ মূর্তিমান। তাঁহার আনন্দপ্রবাহ আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বহুলক্ষক্রোশ দূর হইতে নব-

জাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করো, ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দাও।

আজ প্রভাতের এই মুহূর্তে পৃথিবীর অর্ধভূখণ্ডে নবজাগ্রত সংসারে কর্মের কী তরঙ্গই জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত প্রবল প্রয়াস এই সমস্ত বিপুল উদ্‌যোগে যত পুঞ্জ-পুঞ্জ সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদ্‌ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে দূরে-দূরান্তরে হিল্লোলিত-ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে, সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আনন্দ, ইহাই জানিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়ের কর্মকলরবের সংগীতকে একবার স্তব্ধ হইয়া অধ্যাত্মকর্ণে শ্রবণ করো—তার পরে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বলো—সুখে-দুঃখে তাঁহারই আনন্দ, লাভে-ক্ষতিতে তাঁহারই আনন্দ, জন্মে-মরণে তাঁহারই আনন্দ,—সেই "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না।

ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করিয়া তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগাইয়া তোলো—তবেই আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি চতুর্দিকেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। কোনো ভয় কোনো সংশয় কোনো দীনতা মনের মধ্যে রাখিয়ো না; আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম করো, দিবাবসানে নিঃশব্দ স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া দাও, কোথাও যাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না, সর্বত্রই যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করিতে শিক্ষা করো—যাহা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দের সহিত তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার সাধনা করো—

সম্পদে সংকটে থাকো কল্যাণে
থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে।

নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি, তবে আকাশভরা আলো তো আর দেখিতে পাই না; তেমনি আমাদের ছোটো মনের ছোটো ছোটো বিষাদ-অবসাদ-নৈরাশ্য-নিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়—আনন্দরূপমমৃতং আমরা আর দেখিতে পাই না—নিজের কালিমাদ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা কেবল অসম্পূর্ণতা কেবল অভাব দেখি;—কানা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ

যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে-সপ্তকে বাজিয়া উঠে, যে-আনন্দে জগদ্ব্যাপী আনন্দের সমস্ত স্বর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে সেখানে তাঁহাকেই দেখি,—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বধে-বন্ধনে দুঃখে-দারিদ্র্যে অপকারে-অপমানেও তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্তেই বুঝিতে পারি, প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ—এবং প্রকাশমাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে-আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ—সেই আনন্দে আমি কাহারও চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই ক্ষতি নাই অসম্মান নাই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন, কে তাহার কণামাত্রও অপলাপ করিতে পারে? এমন কী ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে তাহার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণতা হইবে? তাই আজ আনন্দের দিনে, আজ উৎসবের প্রভাতে আমরা যেন সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারি—এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই আনন্দের এমন একটু অংশ লাভ করিতে পারি, যাহাতে সমস্ত জীবনের প্রত্যেক দিনে সর্বত্র তাঁহাকেই স্বীকার করি, ভয়কে নয়, দ্বিধাকে নয়, শোককে নয়—তাঁহাকেই স্বীকার করি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি প্রচুররূপে আপনাকে দান করিতেছেন, আমরা প্রচুররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না কেন? তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যে এই যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সংকুচিত হইয়া দীন হইয়া অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই অবারিত ঐশ্বর্যের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? হাত বাড়াও। বক্ষকে বিস্তৃত করিয়া দাও। দুই হাত ভরিয়া চোখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া অবাধ আনন্দে সমস্ত গ্রহণ করো। তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি যে সর্বত্র হইতেই তোমাকে দেখিতেছে—তুমি একবার তোমার দুই চোখের সমস্ত জড়তা সমস্ত বিষাদ মুছিয়া ফেলো—তোমার দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করিয়া চাহিয়া দেখো, তখনই দেখিবে, তাঁহারই প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে—সে কী প্রকাশ, সে কী সৌন্দর্য, সে কী প্রেম, সে কী আনন্দরূপমমৃতম্। যেখানে দানের লেশমাত্র কৃপণতা নাই সেখানে গ্রহণে এমন কৃপণতা কেন? ওরে মূঢ়, ওরে অবিশ্বাসী, তোর সম্মুখেই সেই আনন্দমুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করিয়া পাতিয়া ধর্—বলের সহিত বল্—'অল্প নহে, আমার সবই চাই। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। তুমি যতটা দিতেছ, আমি সমস্তটাই লইব। আমি ছোটোটার জন্য বড়োটাকে বাদ দিব না, আমি একটার জন্য অন্যটা হইতে বঞ্চিত হইব না, আমি এমন সহজ ধন

লইব, যাহা দশদিক ছাপাইয়া আছে, যাহার অর্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্য জগতে কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় না। তোমার যে প্রেম নানা দেশে, নানা কালে, নানা রসে, নানা ঘটনায় অবিশ্রাম আনন্দে-অমৃতে বিকাশিত, কোথাও যাহার প্রকাশের অন্ত নাই, তাহাকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন প্রেম তোমার প্রসাদে আমার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠুক।

যেখানে সমস্তই দেওয়া হইতেছে, সেখানে কেবল পাওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া যেন কাঙালের মতো না ঘুরিয়া বেড়াই। যেখানে আনন্দরূপমমৃতং তুমি আপনাকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছ, সেখানে চিরজীবন আমার এমন বিভ্রান্তি না ঘটে যে, সর্বদাই সর্বত্রই তোমাকে দেখিয়াও না দেখি এবং কেবল শোকদুঃখ শ্রান্তিজরা বিচ্ছেদক্ষতি লইয়া হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৩১৩

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

১

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকাল বেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা একমুহূর্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে। সমস্ত দীর্ঘদিনের চিন্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মতো জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানাদিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে—চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে—এই সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুলব কী করে! ওরে, "উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত।"

দিন যখন নানা কর্ম নানা চিন্তা নানা প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে একটি একটি পাক আমাদের চারদিকে জড়াতে থাকে, বিশ্ব এবং আমার আত্মার মাঝখানে একটা আবরণ গড়ে তুলতে থাকে, সেই সময়েই যদি মাঝে মাঝে আমাদের চেতনাকে সতর্ক করতে না থাকি—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই জাগরণের মন্ত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে দিনের সমস্ত বিচিত্রব্যাপারের মাঝখানেই আমাদের অন্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হয়ে না উঠতে থাকে তাহলে পাকের পর পাক পড়ে ফাঁসের পর ফাঁস লেগে শেষ কালে আমাদের অসাড় করে ফেলে; তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের আর ইচ্ছাও থাকে না, নিজের চারিদিকের বেষ্টনকেই অত্যন্ত সত্য বলে জানি—তার অতীত যে উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্য তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসই থাকে না, এমন কি তার প্রতি সংশয় অনুভব করবারও সচেষ্টতা আমাদের চলে যায়। অতএব সমস্ত দিন যখন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যন্ত্রে যেন বাজতে থাকে ওরে, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

সংশয়

সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভালো। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে—তার হাত থেকে যেন মুক্তিলাভ করি। নিজের অজ্ঞতাসম্বন্ধে অজ্ঞানতার মতো অজ্ঞান আর তো কিছু নেই। ঈশ্বরকে যে জানি নে,

তাঁকে যে পাই নি এইটে যখন অনুভবমাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদনা জেগে উঠুক। আমি বুঝছি নে আমি পাচ্ছি নে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি এই বলে যেন কেঁদে উঠতে পারে। মনের সমস্ত তারে এই গান বেজে উঠুক "সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।"

আমরা মনে করি যে ব্যক্তি নাস্তিক সেই সংশয়ী কিন্তু আমরা যেহেতু ঈশ্বরকে স্বীকার করি অতএব আমরা আর সংশয়ী নই। বাস্, এই বলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি—এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে আমাদের মতে না মেলে তাদেরই আমরা পাষণ্ড বলি, নাস্তিক বলি, সংশয়াত্মা বলি। এই নিয়ে সংসারে কত দলাদলি, কত বিবাদ বিরোধ, কত শাসন পীড়ন তার আর অন্ত নাই। আমাদের দল এবং আমাদের দলের বাহির এই দুইভাগে মানুষকে বিভক্ত করে আমরা ঈশ্বরের অধিকারকে নিজের দলের বিশেষ সম্পত্তি বলে গণ্য করে আরামে বসে আছি। এসম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই সন্দেহ নেই।

এই ব'লে কেবল কথাটুকুর মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করে আমরা সমস্ত সংসার থেকে তাঁকে নির্বাসিত করে দেখছি। আমরা এমন ভাবে গৃহে এবং সমাজে বাস করছি যেন সে গৃহে সে সমাজে ঈশ্বর নেই। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিশ্বজগতের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে চলে যাই যেন এ জগতে সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের কোনো স্থান নেই। আমরা সকাল বেলায় আশ্চর্য আলোকের অভ্যুদয়ের মধ্যে জাগ্রত হয়ে সেই অদ্ভুত আবির্ভাবের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই নে এবং রাত্রিকালে যখন অনিমেষজাগ্রত নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের মাঝখানে আমরা নিদ্রার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাই তখন এই আশ্চর্য শয়নাগারের বিপুলমহিমান্বিত অন্ধকার শয্যাতলের কোনো এক প্রান্তেও সেই বিশ্বজননীর নিস্তব্ধগম্ভীর স্নিগ্ধমূর্তি অনুভব করি নে। এই অনির্বচনীয় অদ্ভুত জগৎকে আমরা নিজের জমিজমা ঘরবাড়ির মধ্যেই সংকীর্ণ করে দেখতে সংকোচ-বোধ করি নে। আমরা যেন ঈশ্বরের জগতে জন্মাই নি—নিজের ঘরেই জন্মেছি—এখানে আমি আমি আমি ছাড়া আর কোনো কথাই নেই—তবু আমরা বলি আমরা ঈশ্বরকে মানি, তাঁর সম্বন্ধে আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই।

আমার গৃহের মধ্যে সংসারের মধ্যে আমরা কোনো দিন এমন করে চলি নে যাতে প্রকাশ পায় যে এই গৃহের গৃহদেবতা তিনি, এই সংসার-রথকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই মহাসারথি। আমিই ঘরের কর্তা, আমিই সংসারের সংসারী। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙবামাত্রই সেই চিন্তাই শুরু হয় এবং রাত্রে ঘুম এসে সেই চিন্তাকেই ক্ষণকালের

জন্য আবৃত করে। "আমির" দ্বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রয়েছে—কত দলিল, কত দস্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসংবাদ! কিন্তু ঈশ্বর কোথায়। কেবল মুখের কথায়! আর কোথাও যে তিলধারণের স্থান নেই।

এই মুখের কথায় ঈশ্বরকে স্বীকার করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে। আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই কথা বলি—ঈশ্বরকে এইটুকুমাত্র ফাঁকির জায়গা ছেড়ে দিয়ে তার পরে বাকি সমস্ত জায়গাটা অসংকোচে নিজে জুড়ে বসবার যে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা আপনাকে আপনি জানে না বলেই এত ভয়ানক। এই স্পর্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে। আমরা যে জানি নে এটাও জানতে দেয় না।

সংশয়ের বেদনা তখনই জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিকে স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কান্না থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে দুই বাহু প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল পাই নে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয় যে, যা পেয়েছি তাতে কোনোমতেই আমার চলবে না এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্ছি নে। এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই।

যখন প্রসবের সময় আসন্ন তখন গর্ভের শিশুকে একদিকে নাড়ি সম্পূর্ণ ছাড়ছে না অন্যদিকে ভূমিষ্ঠ হবার বেগ তাকে আকর্ষণ করছে। মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির তখনও কোনো মীমাংসা হয় নি। এই সময়ের বেদনাই জন্মদানের পূর্বসূচনা, এই বেদনার অভাবকেই চিকিৎসক ভয় করেন।

যথার্থ সংশয়ের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। সংসার একদিকে তাকে আপনার মধ্যে আবৃত আচ্ছন্ন করে রেখেছে বিমুক্ত সত্য অন্যদিকে তার অলক্ষ্যে তাকে আহ্বান করছে—সে অন্ধকারের মধ্যেই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আকর্ষণ অনুভব করছে। সে মনে করছে বুঝি তার এই ব্যাকুলতার কোনো পরিণাম নেই, কেননা সে তো সম্মুখে পরিণামকে দেখতে পাচ্ছে না, সে গর্ভস্থ শিশুর মতো নিজের আবরণকেই চার দিকে অনুভব করছে।

আসুক সেই অসহ্য বেদনা—সমস্ত প্রকৃতি কাঁদতে থাক্—সে কান্নার অবসান হবে। কিন্তু যে-কান্না বেদনায় জেগে ওঠে নি, ফুটে ওঠে নি, জড়তার শত বেষ্টনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—তার যে কোনো পরিণাম নেই। সে যে রক্তেমাংসে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েই গেল—তার ভার যে চব্বিশঘণ্টা নাড়িতে নাড়িতে বহন করে বেড়াতে হবে।

যেদিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা সম্প্রদায়ের

মত, দর্শনের তর্ক ও শাস্ত্রের বাক্য নিয়ে আরাম পাই নে; সেদিন আমরা একমুহূর্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই—সেদিন আমাদের প্রার্থনা এই হয় যে, "প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে।"

জ্ঞানের প্রকাশে আমাদের সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না। আমরা জেনেও জানি নে কখন? যখন আমাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হয় না। একবার ভেবে দেখো না এই পৃথিবীতে কত শত সহস্র লোক আমাকে বেষ্টন করে আছে। তাদের যে জানি নে তা নয়, কিন্তু তারা আমার পক্ষে কিছুই নয়। সংসারে আমি এমন ভাবে চলি যেন এই অগণ্য লোক তাদের সুখদুঃখ নিয়ে নেই। তবে কারা আছে? যারা আমার আত্মীয়স্বজন, আমার প্রিয়ব্যক্তি, তারাই অগণ্য জীবকে ছাড়িয়ে আছে। এই কয়েকটি লোকই আমার সংসার। কেননা এদেরই আমি প্রেমের আলোতে দেখেছি। এদেরই আমি কমবেশি পরিমাণে আমার আত্মারই সমান করে দেখেছি। আমার আত্মা যে সত্য, আত্মপ্রেমে সেটা আমার কাছে একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই প্রেম যাদের মধ্যে প্রসারিত হতে পেরেছে তাদেরই আমি আত্মীয় বলে জানি—তাই তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, তারা আমার পক্ষে অনেকটা আমারই মতো সত্য।

ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন এ-কথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয় কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কী? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ চায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এইজন্যেই যিনি সকলের চেয়ে আছেন তাঁকেই সকলের চেয়ে পাই নে—তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোরাতে পারে না। ঈশ্বর থেকেও থাকেন না—এতবড়ো প্রকাণ্ড না-থাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে। এই না-থাকার ভারে আমরা প্রতিমুহূর্তেই মরছি। এই না-থাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না-থাকারই শুষ্কতায় জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হল। যিনি আছেন তিনি নেই এতবড়ো ক্ষতি কী দিয়ে পূরণ হবে! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনে রাত্রে এইজন্যেই যে গেলুম। সব জানি সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ—

প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

অভাব

ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি সিকি পয়সাও হত তাহলে তখনই সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই; সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে, পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ি দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেছে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জিত করে আমাদের কী অভাব হচ্ছে। হায়, যে অভাব হচ্ছে তা যতক্ষণ না জানতে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে মনে করি আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু ক্ষতিটা কী হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন "তুমি এসেছ!"

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম—মায়ের বাড়িতেই বাস করছি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি—তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই কিন্তু যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কী হচ্ছে। তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেষণ করছেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল ওইটুকু হচ্ছে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না, তুমি এসেছ! অন্ন জল ধন জন সমস্তই আছে কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায় তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জগতে কোনো জিনিসের কাছে কোনো মানুষের

কাছে যাওয়া আমাদের জীবনে অল্পই ঘটে। পরম আত্মীয়ের নিকট দিয়েও আমরা প্রত্যহ আনাগোনা করি বটে কিন্তু দৈবাৎ একমুহূর্ত তার কাছে গিয়ে পৌঁছোই। কত দিন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছি এবং সকাল সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িয়েছি কিন্তু এর মধ্যে হয়তো সকলের চেয়ে কেবল একদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিসের কোনো মানুষের কাছে আসে নি। জগতে জন্মেছে কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে, এও তারা একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসছে খেলছে গল্পগুজব করছে, নানা লোকের সঙ্গে দেনা পাওনা আনাগোনা চলছে তারা ভাবছে এই তো আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্য সে তার বোধের অতীত।

আত্মার দৃষ্টি

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি তা জানতুম না। আমি ভাবতুম দেখা বুঝি এই রকমই—সকলে বুঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন দৈবাৎ লীলাচ্ছলে আমার কোনো সঙ্গীর চশমা নিয়ে চোখে পরেই দেখি, সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তখন মনে হল আমি যেন হঠাৎ সকলের কাছে এসে পড়েছি, সমস্তকে এই যে স্পষ্ট দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দ্বারা বিশ্বভুবনকে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ করে লাভ করলাম—অথচ এতদিন যে আমি এত লোকসান বহন করে বেড়াচ্ছি তা জানতুমই না।

এ যেমন চোখ দিয়ে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিয়ে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে যারই কাছে আসি সেই আমার হাত তুলে ধরে বলে, তুমি এসেছ! এই যে জল বায়ু চন্দ্র সূর্য, আমাদের পরমবন্ধু, এরা আমাদের নানা কাজ করছে, কিন্তু আমাদের হাত ধরছে না, আনন্দিত হয়ে বলছে না, তুমি এসেছ! যদি তাদের তেমনি কাছে যেতে পারতুম, যদি তাদের সেই স্পর্শ সেই সম্ভাষণ লাভ করতুম তাহলে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারতুম, তাদের কৃত সমস্ত উপকারের চেয়ে এইটুকু কত বড়ো। মানুষের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম কিন্তু মানুষ আমাকে স্পর্শ করে বলছে না, তুমি এসেছ! আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করছি। ডিমের মধ্যে পক্ষিশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না এও সেই রকম।

এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনই পক্ষিশিশু পক্ষিমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে—তখনই মানুষ সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কী আশ্চর্য সার্থকতা কী অনির্বচনীয় আনন্দ তা আমরা জানি নে কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাই নে!

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি নে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখি নে—ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে সংসার দিয়ে সংস্কার দিয়ে দেখি—তাকে পরিবারের মানুষ, বা প্রয়োজনের মানুষ, বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলেই দেখি—সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়—সেই খানেই দরজা রুদ্ধ—তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারি নে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষ ভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বলত, তুমি এসেছ!

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

এই যে সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত

হয়ে আমাদের আত্মা সর্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে—সেই আত্মায় গিয়ে না পৌঁছোলে সে দ্বারে এসে ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়, অমৃতং যদ্বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছোতে পারে না—সে আর সমস্তই দেখে কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতন ভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছে আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছি নে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।

পাপ

এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায় আর কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না তখনই পাপ জিনিসটা কী তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আমাদের চৈতন্য যখন বরফগলা ঝরনার মতো ছুটে বেরোতে চায় তখনই পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—এক মুহূর্ত আর তাকে ভুলে থাকতে পারে না—তাকে ক্ষয় করবার জন্যে তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমাদের পীড়িত চৈতন্য পাপের চারিদিকে ফেনিল হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুত আমাদের চিত্ত যখন চলতে থাকে তখন সে তার গতির সংঘাতেই ছোটো নুড়িটিকেও অনুভব করে, কিছুই তার আর অগোচর থাকে না।

তার পূর্বে পাপ পুণ্যকে আমরা সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুবিধার জিনিস বলেই জানি। চরিত্রকে এমন করে গড়ি যাতে লোকসমাজের উপযুক্ত হই, যাতে ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা হয়। সেইটুকুতে কৃতকার্য হলেই আমাদের মনে আর কোনো সংকোচ থাকে না; আমরা মনে করি চরিত্রনীতির যে উপযোগিতা তা আমার দ্বারা সিদ্ধ হল।

এমন সময় একদিন যখন আত্মা জেগে ওঠে, জগতের মধ্যে সে আত্মাকে খোঁজে তখন সে দেখতে পায় যে শুধু ভদ্রতার কাজ নয়, শুধু সমাজ রক্ষা করা নয়—প্রয়োজন আরও বড়ো, বাধা আরও গভীর। উপর থেকে কেটে কুটে রাস্তা সাফ করে দিয়েছি, সংসারের পথে কোনো বাধা দিচ্ছে না, কারও চোখে পড়ছে না; কিন্তু শিকড়গুলো সমস্তই ভিতরে রয়ে গেছে—তারা পরস্পরে ভিতরে ভিতরে জড়াজড়ি করে একেবারে জাল বুনে রেখেছে, আধ্যাত্মিক চাষ-আবাদে সেখানে পদে পদে ঠেকে যেতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অতি সূক্ষ্ম শিকড়টিও জড়িয়ে ধরে, আবরণ রচনা করে। তখন পূর্বে যে পাপটি চোখে পড়ে নি তাকেও দেখতে পাই এবং পাপ জিনিসটা আমাদের পরম সার্থকতার পথে যে কী রকম বাধা তাও বুঝতে পারি। তখন মানুষের দিকে না তাকিয়ে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি—তাকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠে। সে যে চরম মিলনের, পরম প্রেমের পথ দলবল নিয়ে জুড়ে বসে আছে—তার সম্বন্ধে অন্যকে বা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর চলবে না—লোকের কাছে ভালো হয়ে আর কোনো সুখ নেই—তখন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সেই নির্মল স্বরূপকে বলতে হবে, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—সমস্ত পাপ দূর করো—একেবারে বিশ্বদুরিত সমস্ত পাপ—একটুও বাকি থাকলে চলবে না—কেননা তুমি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, আত্মা তোমাকেই চায়—সেই তার একমাত্র যথার্থ চাওয়া, সেই তার শেষ চাওয়া। হে সর্বগ, তোমাকে, সর্বতঃ প্রাপ্য, সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হব, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করব সেই আশ্চর্য সৌভাগ্যের ধারণাও এখন আমার মনে হয় না কিন্তু এই অনুগ্রহটুকু করতে হবে, যে, তোমার পরিপূর্ণ প্রকাশের অধিকারী নাই হই তবু আমার রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র দিয়ে তোমার সেইটুকু আলোক আসুক যে আলোকে ঘরের আবদ্ধ অন্ধকারকে আমি অন্ধকার বলে জানতে পারি। রাত্রে দ্বার জানালা বন্ধ করে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে ছিলুম। সকাল বেলায় দ্বারের ফাঁক দিয়ে যখন আলো ঢুকল তখন জড়শয্যায় পড়ে থেকে হঠাৎ বাইরের সুনির্মল প্রভাতের আবির্ভাব আমার তন্দ্রালস চিত্তকে আঘাত করল। তখন তপ্ত-শয্যার তাপ অসহ্য বোধ হল, তখন নিজের নিঃশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ ঘরের বাতাস আমার নিঃশ্বাস রোধ করতে লাগল; তখন তো আর থাকতে পারা গেল না; তখন উন্মুক্ত নিখিলের স্নিগ্ধতা নির্মলতা পবিত্রতা, সমস্ত সৌন্দর্য সৌগন্ধ্য সংগীতের আভাস আমাকে আহ্বান করে বাইরে নিয়ে এল। তুমি তেমনি করে আমার আবরণের কোনো দুই একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তোমার আলোকের দূতকে তোমার মুক্তির বার্তাবহকে প্রেরণ করো—তাহলেই নিজের আবদ্ধতার তাপ এবং কলুষ এবং অন্ধকার আমাকে

আর সুস্থির হতে দেবে না, আরামের শয্যা আমাকে দগ্ধ করতে থাকবে, তখন বলতেই হবে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

২৫ অগ্রহায়ণ

দুঃখ

আমাদের উপাসনার মন্ত্রে আছে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সুখকরকে নমস্কার করি, কল্যাণকরকে নমস্কার। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমস্কার করতে পারি নে। কল্যাণকর যে শুধু সুখকর নন, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি আর দুঃখকে কোনো দুর্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি।

এই জন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলই লুকিয়ে থাকতে চাই। তাতে কী হয়? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাসী সমস্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আরামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কী হয়? তাতে সে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলে; নিজের হাত-পায়ের উপর তার অধিকার থাকে না, যে সমস্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছিল সেগুলি কর্ম অভাবে পরিণত হতে পারে না, মুষড়ে যায়, বিগড়ে যায়। স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে। কৃত্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিকে কখনোই তার সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্য জোগাতে পারে না, এইজন্যে সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি ঘরগড়া পুতুলের মতো হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয় সুতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

যাদের স্বভাব অতিবেদনাশীল, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে;—সে ছোটোকে বড়ো করে তোলে বলেই লোকে কেবলই বলে কাজ নেই—তার সম্বন্ধে লোকের কথাবার্তা ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক হয় না। সে সব কথা শোনে না কিংবা ঠিক কথা শোনে না—তার যা উপযুক্ত পাওনা তা সে সবটা পায় না কিংবা

ঠিক মতো পায় না। এতে তার মঙ্গল হতেই পারে না। যে ব্যক্তি বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আঘাত পায় না কেবলই প্রশ্রয় পায় সে হতভাগ্য বন্ধুত্বের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়—বন্ধুরা তার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে বন্ধু হয়ে উঠতে পারে না।

জগতে এই যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত হবেই তা নয়। যাকে আমরা অন্যায় বলি অবিচার বলি তাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে—অত্যন্ত সাবধানে সূক্ষ্মহিসাবের খাতা খুলে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকুর ভিতর দিয়েই নিজেকে মানুষ করে তোলা—সে তো হয়েও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। অন্যায় এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে সুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাবমতো পড়ে, অনেক সময়েই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে ফেলি নে? কিন্তু কখনো তো মনে করি নে আমি তার অযোগ্য। সবটুকুই তো দিব্য অসংকোচে দখল করি। দুঃখের বেলাতেই কি কেবল ন্যায় অন্যায়ের হিসাব মেলাতে হবে? ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিস যে আমরা পাই নে।

তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চলতে থাকে—কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের—আমাদের প্রাণের আমাদের বুদ্ধির আমাদের সৌন্দর্যবোধের আমাদের মঙ্গল প্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্মই এই যে সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয় সে ত্যাগও করবে।

এইজন্যই আমাদের আহার্য পদার্থে ঠিক হিসাবমতো আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ থাকে না তাতে যেমন খাদ্য অংশ আছে তেমনি অখাদ্য অংশও আছে। এই অখাদ্য অংশ শরীর পরিত্যাগ করে। যদি ঠিক ওজনমতো নিছক খাদ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করি তাহাতে আমাদের চলে না, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কারণ কেবল কি আমাদের পাকশক্তি ও পাকযন্ত্র আছে?—আমাদের ত্যাগশক্তি ও ত্যাগযন্ত্র আছে—সেই শক্তি সেই যন্ত্রকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণ বর্জনের সামঞ্জস্যে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা যে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবে না এও বিধান নয়। সংসারে এই ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মতো আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহজ ক্ষমতা থাকা চাই যাতে আমাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনায়াসে গ্রহণ করি এবং যেটুকু ত্যাজ্য সেটুকু বিনাক্ষোভে ত্যাগ করতে পারি।

অতএব দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হ'ক বা অন্যায্য হ'ক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে।

এই ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জন্মে তা নয় যে-সমস্ত অতিবেদনাশীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে আবৃত করে তাদের শুচিতা নষ্ট হয়—আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনতা জমতে থাকে;—যতই লোকের ভয়ে তারা সেগুলো লোকচক্ষুর সামনে বের করতে না চায় ততই সেগুলো দূষিত হয়ে উঠে স্বাস্থ্যকে বিকৃত করতে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখকষ্টকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয় তারা নির্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।

অতএব সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে প্রস্তুত হও—যিনি সুখকর তাঁকে প্রণাম করো এবং যিনি দুঃখকর তাঁকেও প্রণাম করো—তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে শক্তিলাভ করবে—যিনি শিব যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ত্যাগ

প্রতিদিন প্রাতে আমরা যে এই উপাসনা করছি যদি তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অল্পে অল্পে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। নিতান্তই প্রস্তুত হওয়া চাই, কারণ, সংসারের মধ্যে একটি ত্যাগের ধর্ম্ আছে, তার বিধান অমোঘ। সে আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দিতে চায় না; সে বলে কেবলই ছাড়তে হবে এবং এগোতে হবে। এমন কোথাও কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে যেখানে পৌঁছে বলতে পারি এইখানেই সমস্ত সমাপ্ত হল, পরিপূর্ণ হল, অতএব এখান থেকে আর কোনোকালেই নড়ব না।

সংসারের ধর্মই যখন কেবল ধরে রাখা নয়, সরিয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া—তখন তারই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন না করলে দুটোতে কেবলই ঠোকাঠুকি হতে থাকে। আমরা যদি কেবলই বলি আমরা থাকব আমরা রাখব আর সংসার বলে তোমাকে ছাড়তে হবে চলতে হবে তাহলে বিষম কষ্ট উৎপন্ন হতে থাকে।

আমাদের ইচ্ছাকে পরাস্ত হতে হয়—যা আমরা ছাড়তে চাই নে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব আমাদের ইচ্ছাকেও এই বিশ্বধর্মের সুরে বাঁধতে হবে।

বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তাহলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে—তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাকবে না তখন দাসের মতো সংসারের কানমলা খাব।

অতএব একদিন এ কথা যেন সংসার না বললে পারে যে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব, আমিই যেন বলতে পারি আমি ত্যাগ করব। কিন্তু প্রতিদিনই যদি ইচ্ছাকে এই ত্যাগের অভিমুখে প্রস্তুত না করি তবে মৃত্যু ও ক্ষতি যখন তার বড়ো বড়ো দাবি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে তখন তাকে কোনোমতে ফাঁকি দিতে ইচ্ছা হবে অথচ সেখানে একেবারেই ফাঁকি চলবে না—সে বড়ো দুঃখের দিন উপস্থিত হবে।

এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।

আমরা যেটা থেকে বেরিয়ে না আসব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্যে আবৃত শিশু তার মাকে পায় না—সে যখন নাড়ির বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনই সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

এই জগতের গর্ভাবরণের মধ্যে থেকে আমাদের সেই রকম করে মুক্ত হতে হবে—তাহলেই যথার্থভাবে আমরা জগৎকে পাব—কারণ, স্বাধীনভাবে পাব। আমরা জগতের মধ্যে বদ্ধ হয়ে ভ্রূণের মতো জগৎকে দেখতেই পাই নে—যিনি মুক্ত হয়েছেন, তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।

এইজন্যই বলছি, যে লোক সংসারের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে সেই যে আসল সংসারী তা নয়—যে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই সংসারী—কারণ, সে তখন সংসারের থাকে না সংসার তারই হয়—সেই সত্য করে বলতে পারে আমার সংসার।

ঘোড়া গাড়ির সঙ্গে লাগামে বদ্ধ হয়ে গাড়ি চালায়—কিন্তু ঘোড়া কি বলতে পারে গাড়িটা আমার? বস্তুত গাড়ির চাকার সঙ্গে তার বেশি তফাত কী? যে সারথি মুক্ত থেকে গাড়ি চালায় গাড়ির উপরে কর্তৃত্ব তারই।

যদি কর্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে। এইজন্য গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ

বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে—নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে।

অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে, এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।

তার মানেই হল এই যে, সংসারে নেওয়া এবং দেওয়া এই যে দুটো বিপরীত ধর্ম আছে এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য করতে হবে—এর মধ্যে একটা একান্ত হয়ে উঠলেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তাহলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি দেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তাহলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্মটা মুক্তিবিবর্জিত হয় তাহলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্মবিহীন হয় তাহলে আমরা বিলুপ্ত হই।

বস্তুত ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যখন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রয় করতে পারে না—তখন তার কেবল ভোগের ক্ষুদ্র অধিকার থাকে ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জমাতে পারি কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারি নে সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না।

এইজন্যে খ্রীস্ট বলে গিয়েছেন, যে লোক ধনী তার পক্ষে মুক্তি বড়ো কঠিন। কেননা যেটুকু ধন সে ছাড়তে না পারে সেইটুকু ধনই যে তাকে বাঁধে এই বন্ধনটাকে যে যতই বড়ো করে তুলেছে সে যে ততই বিপদে পড়েছে।

এই সমস্ত বন্ধন প্রত্যহ শিথিল হয়ে আসছে প্রত্যহ ত্যাগ আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আসছে আমাদের উপাসনা থেকে এই ফলটি যেন লাভ করি। নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে আমাদের প্রকৃতি একেবারে পাথরের মতো আঁট হয়ে আছে। উপাসনার সময় অমৃতের ঝরনা ঝরতে থাক্—আমাদের অণুপরমাণুর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে থাক্—এই পাষাণটাকে দিনে দিনে বিশ্লিষ্ট করতে থাক্, আর্দ্র করতে থাক্, তার পরে ক্রমে এটা খইয়ে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জীবনের মাঝখানে একটি বৃহৎ অবকাশ রচনা করে সেই অবকাশটিকে পূর্ণ করে দিক। দেখো, একবার ভিতরের দিকে চেয়ে দেখো—অন্তরের সংকোচনগুলি তাঁর নামের আঘাতে প্রতিদিন প্রসারিত হয়ে আসছে, সমস্ত প্রসন্ন হচ্ছে, শান্ত হচ্ছে, কর্ম সহজ হচ্ছে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও সরল হচ্ছে, এবং ঈশ্বরের মহিমা এই মানবজীবনের মধ্যে ধন্য হয়ে উঠছে।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ত্যাগের ফল

কিন্তু ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনও মনের মধ্যে এসে পৌঁছোল না। শাস্ত্রে উত্তর দেয় ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বদ্ধ করে রাখবে—ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব।

মুক্তিলাভ করব এ কথাটার জোর যে আমাদের কাছে নেই। আমরা তো মুক্তি চাচ্ছি নে; আমাদের ভিতরে যে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে—আমরা যে ইচ্ছা করে খুশি হয়ে সংসারের অধীন হয়েছি—আমরা ঘটিবাটি থালার অধীন, আমরা ভৃত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন—এতবড়ো জন্ম-অধীন দাসানুদাসকে এ কথা বলাই মিথ্যা যে, মুক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে; যে ব্যক্তি স্বভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বদ্ধ তাকে মুক্তির প্রলোভন দেখানো মিথ্যা।

বস্তুত মুক্তি তার কাছে শূন্যতা, নির্বাণ, মরুভূমি। যে মুক্তির মধ্যে তার ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, যা কিছুকে সে একমাত্র আশ্রয় বলে জানত তার সমস্তই বিলুপ্ত—সে মুক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ।

আমরা যে ত্যাগ করব তা যদি শূন্যতার মধ্যেই ত্যাগ হয় তবে সে তো একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িকেও সেইরকম শূন্যের মধ্যে বিসর্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসহ্য।

কিন্তু ত্যাগ তো শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যাকিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও—এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন।

পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা শেষ হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথায় কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না—লাভ করে কী হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েই বা কী হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কী হবে?

যখন কোনো ছেলেকে পয়সা দিই সে জিজ্ঞাসা করতে পারে পয়সা নিয়ে কী হবে? উত্তর যদি দিই বাজারে যাবে তাহলেও প্রশ্ন এই যে বাজারে গিয়ে কী হবে? পুতুল কিনবে। পুতুল কিনে কী হবে? খেলা করবে। খেলা করে কী হবে? তখন একটি উত্তরে সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যায়—খুশি হবে। খুশি হয়ে কী হবে এ প্রশ্ন কেউ

কখনো অন্তরের থেকে বলে না। ইচ্ছার পূর্ণ চরিতার্থতা হয়ে যে আনন্দ ঘটে সেই আনন্দের মধ্যেই সকল প্রশ্ন সকল সন্ধান নিঃশেষিত হয়ে যায়।

কেমন করে সংগ্রহ করব যার দ্বারা ত্যাগের শক্তি জন্মাবে? আমাদের এই প্রতিদিনের উপাসনার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করছি। এই প্রাতঃকালে সেই চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে নিজের চৈতন্যকে নিবিড় ভাবে পরিবেষ্টিত করে দেখবার জন্যে আমাকে যে ক্ষণকালের জন্যেও সমস্ত আবরণ ত্যাগ করতে হচ্ছে অনাবৃত হয়ে সদ্যোজাত শিশুর মতো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে এতেই আমার দিনে দিনে কিছু কিছু করে জমে উঠবে। আনন্দের সঙ্গে আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন নিশ্চয় ক্রমশই কিছু না কিছু সহজ হয়ে আসছে।

কেমন করে ত্যাগ করব? সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও। সেই মঙ্গল-যজ্ঞের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোটো দরজাও যদি খুলে রাখ তাহলে দেখবে আজ যে অনভ্যাসের দ্বারে একটু টান দিতে গেলেই আর্তনাদ করে উঠছে, যার মরচে-পড়া তালায় চাবি ঘুরছে না—ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মতো হয়ে উঠবে—একটি শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকবে। সংসারকে তো আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও—প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টিভিক্ষা দাও—সেই নিস্পৃহ ভিখারি তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না, ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তাঁর জন্যে কোনো মানুষের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চলবে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া সেটুকু এক রকম করে দিয়ে অন্যরকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুকে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখলে হবে না, তার রসিদ চাইলে চলবে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোনো দান যেন এইরূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে—সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

প্রেম

বেদমন্ত্রে আছে মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া—উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।

সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোল না তার জন্যে আর একটা সত্যকে মানতে হয়, এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তাহলেই অমৃতের জন্যে ঈশ্বরকে এবং মৃত্যুর জন্যে শয়তানকে মানতে হয়।

কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো শরিককে মানি নে—আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে ; আমরা জানি তিনিই এক ; খণ্ড সত্তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।

কিন্তু এ তো হল তত্ত্ব কথা। তিনি সত্য একথা জানলে কেবল জ্ঞানে জানা হয়—এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ কোথায়। এই সত্যের কি কোনো রসই নেই।

তা বললে চলবে কী করে। সমস্ত সত্য যেমন তাঁতে মিলেছে তেমনি সমস্ত রসও তাঁতে মিলে গেছে। সেইজন্যে উপনিষৎ তাঁকে শুধু সত্য বলেন নি, তাঁকে রসস্বরূপ বলেছেন—তাঁকে সেই পরিপূর্ণ রসরূপে জানলে জানার সার্থকতা হয়।

তাহলে দাঁড়ায় এই যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ। নইলে তাঁর মধ্যে কিছুরই সমাধান হতে পারতই না—ভেদ ভেদই থাকত, বিরোধ কেবলই আঘাত করত এবং মৃত্যু কেবলই হরণ করে নিত। তাঁর মধ্যে যে সমস্তই মেলে—সেটা একটা জ্ঞানতত্ত্বের মিলন নয়—তাঁর মধ্যে একটি প্রেমতত্ত্ব আছে—সেইজন্য সমস্তকে মিলতেই হয়—সেইজন্যই বিচ্ছেদ বিরোধ কখনোই চিরন্তন সত্য বস্তু হয়ে উঠতে পারে না।

ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে—কেন, কী হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না—প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার লক্ষ্য।

যদি বল ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তু থেকে মুক্তিলাভ করবে তাতে আমাদের মন সায় দেয় না, যদি বল ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তুকে পূর্ণতররূপে লাভ করবে তাহলেও আমাদের মনের সম্পূর্ণরূপে সাড়া পাওয়া যায় না। যদি বল ত্যাগের দ্বারা প্রেমকে পাওয়া যাবে,

তাহলে মন আর কথাটি কইতে পারে না—এ কথাটাকে যদি সে ঠিকমতো অবধান করে শোনে তবে তাকে বলে উঠতেই হবে "তাহলে যে বাঁচি।"

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে—এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নয়—আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখি নে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না—প্রেমের সূর্য একবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহংকারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্যেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে—ত্যাগটা যেন ক্রমশই সহজ হয়ে আসে, নিজের দিকের টানটা যেন প্রত্যহই আলগা হয়ে আসে। তাহলেই কি যাকে মুক্তি বলে তাই পাব। হাঁ মুক্তি পাবে। মুক্তি পেয়ে কী পাব। মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করছেন, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জন করছেন—সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না—সেই স্বয়ম্ভূ সেই স্বতউৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।

কিন্তু প্রেম যে মুক্ত, সে যে স্বাধীন। দাসত্বের সঙ্গে প্রেমের আর কোনো তফাতই নেই—কেবল দাসত্ব বদ্ধ আর প্রেম মুক্ত। প্রেম নিজের নিয়মেই নিজে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের চেয়ে উপরের আর কারও কাছে কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত দেয় না।

সুতরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চলতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই

কথাবার্তা হয়ে গেছে, তিনি আমাদের বলে রেখেছেন তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে এস—যে ব্যক্তি দাস তার জন্য আমার আম দরবার খোলা আছে বটে কিন্তু সে আমার খাস দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

এক এক সময় মনের আগ্রহে আমরা তাঁর সেই খাস দরবারের দরজার কাছে ছুটে যাই—কিন্তু দ্বারী বারবার আমাদের ফিরিয়ে দেয়। বলে, তোমার নিমন্ত্রণ-পত্র কই। খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে-কটা নিমন্ত্রণ আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। বারবার ফিরে আসতে হল—বারবার!

টিকিট-পরীক্ষককে ফাঁকি দেবার জো নেই। আমরা দাম দিয়ে যে ইস্টেশনের টিকিট কিনেছি সেই ইস্টেশনেই আমাদের নামতে হবে। আমরা বহুকালের সাধনা এবং বহুদুঃখের সঞ্চয় দিয়ে এই সংসার লাইনেরই নানা গম্যস্থানের টিকিট কিনেছি অন্য লাইনে তা চলবে না। এবার থেকে প্রতিদিন আবার অন্য লাইনের টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এবার থেকে যা কিছু সংগ্রহ এবং যা কিছু ত্যাগ করতে হবে সে কেবল সেই প্রেমের জন্যে।

সামঞ্জস্য

আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী; হাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হাঁ-কে কাটে তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না—আবার তাদের বিরুদ্ধরূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যই কেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারি নে—কিন্তু স্বার্থ জিনিসটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি দুই যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না এ যে প্রেমের কাণ্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজনসকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে যান। তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্যগাৎ শুক্রং আবার তিনিই ব্যদধাৎশাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অনন্তদেশে তিনি শুদ্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায় দেখতে পাই; সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি—আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতিগতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত—তারা বিপরীতপর্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালোবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়—সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওয়াপাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে, ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিক বলে আমি আছি আর একদিক বলে আমি নেই। "আমি" না হলেও প্রেম নেই

"আমি" না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে—সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বে বলে আমাদের অনন্ত উন্নতি—আমরা ক্রমাগতই তাঁর দিকে যাই কোনো কালে তাঁর কাছে যাই নে। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারি নে আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও। যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায় নি। শুধু বাক্য ফেরে না মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে—এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারেই জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জানতে পারে কিন্তু প্রেমের জানায় আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে, যেখানে একদিকে কিছুই জানি নে সেখানে অন্যদিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে—তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায় মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াত করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাশ করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিসটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিস পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে একথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চুলও মাথা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন তাহলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তাহলে সৃষ্টিই হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ,

যে-রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তাহলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা, তিনিই বন্ধু তিনিই পিতা তিনিই বিধাতা। এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড়ো কথা? ঈশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোটো করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্কার আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটোকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ—যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি। যেন, সীমা জিনিসটা যে কী তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়। এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ। এক রূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরই বা নাশ কোথায়। এরই বা সীমা কোনখানে। সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্তনপরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এতবড়ো সাধ্য আছে কার। বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে একথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় সেই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই আবার প্রেমের যে অধীনতা এতবড়ো অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে।

অধীনতা জিনিসটা যে কতো বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্মে সেইটে আমাদের

দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন—সেই পরম গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি তিনি মেনেছেন—নইলে আমরা আছি কী করে।

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজছে। সেইখানে কত দুঃখ যে জাগছে তার সীমা নেই—চোখের জল বয়ে যাচ্ছে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—তাই তো, সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হল না।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

কী চাই?

আমরা এতদিন প্রত্যহ আমাদের উপাসনা থেকে কী ফল চেয়েছিলুম। আমরা চেয়েছিলুম শান্তি। ভেবেছিলুম এই উপাসনা বনস্পতির মতো আমাদের ছায়া দেবে, প্রতিদিন সংসারের তাপ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু শান্তিকে চাইলে শান্তি পাওয়া যায় না। তার চেয়ে আরও অনেক বেশি না চাইলে শান্তির প্রার্থনাও বিফল হয়।

জ্বরের রোগী কাতর হয়ে বলে আমার এই জ্বালাটা জুড়োক; হয়তো জলে ঝাঁপ

দিয়ে পড়ে। তাতে যেটুকু শান্তি হয় সেটা তো স্থায়ী হয় না—এমন কি তাতে তাপ বেড়ে যেতে পারে। রোগী যদি শান্তি চায়, স্বাস্থ্য না চায় তবে সে শান্তিও পায় না স্বাস্থ্যও পায় না।

আমাদেরও শান্তিতে চলবে না, প্রেম দরকার। বরঞ্চ মনে ওই যে একটুকু শান্তি পাওয়া যায়, কিছুক্ষণের জন্য একটা স্নিগ্ধতার আবরণ আমাদের উপরে এসে পড়ে সেটাতে আমাদের ভুলায়,—আমরা মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসি আমাদের উপাসনা সার্থক হল—কিন্তু ভিতরের দিকে সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কেননা, দেখতে পাই, ব্যাধি যে যায় না। সমস্ত দিন নানা ঘটনায় দেখতে পাই সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সহজ হয় নি। রোগীর সঙ্গে তার বাহিরের প্রকৃতির সম্বন্ধ যে রকম সেইরকম হয়ে আছে। বাহিরে যেখানে সামান্য ঠাণ্ডা রোগীর দেহে সেখানে অসহ্য শীত; বাহিরের স্পর্শ যেখানে অতি মৃদু রোগীর দেহে সেখানে দুঃসহ বেদনা। আমাদেরও সেই দশা, বাহিরের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের ওজন ঠিক থাকছে না। ছোটো কথা অত্যন্ত বড়ো করে শুনছি, ছোটো ব্যাপার অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠছে।

ভার বাড়ে কখন; না, কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যখন বেশি হয়। পৃথিবীতে যে হালকা জিনিস আমরা সহজেই তুলছি, যদি বৃহস্পতিগ্রহে যাই তবে সেখানে সেটুকু আমাদের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কেননা সেখানে এই কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। আমরাও তাই দেখছি আমাদের নিজের কেন্দ্রের দিকের টানটা অত্যন্ত বেশি—আমাদের স্বার্থ ভিতরের দিকেই টানছে, অহংকার ভিতরের দিকেই টানছে, এইজন্যেই সব জিনিসই অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠছে—যা তুচ্ছ তা কেবলমাত্র আমার ওই ভিতরের টানের জোরেই আমাকে কেবলই চাপছে—সব জিনিসই আমাকে ঠেসে ধরেছে—সব কথাই আমাকে ঠেলে দিচ্ছে—ক্ষণকালের শান্তির দ্বারা এটাকে ভুলে থেকে আমাদের লাভটা কী।

এই চাপটা হালকা হয় কখন? প্রেমে। তখন যে ওই টানটা বাহিরের দিকে যায়। আমাদের জীবনে অনেকবার তার পরিচয় পেয়েছি। যেদিন প্রণয়ীর সঙ্গে আমাদের প্রণয় বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে সেদিন কেবল যে আকাশের আলো উজ্জ্বলতর, বনের শ্যামলতা শ্যামলতর হয়েছে তা নয় সেদিন আমাদের সংসারের ভারাকর্ষণের টান একেবারে আলগা হয়ে গেছে। অন্যদিন ভিক্ষুককে যখন একপয়সামাত্র দিই সেদিন তাকে আধুলি দিয়ে ফেলি; অর্থাৎ অন্যদিন এক পয়সার যে ভার ছিল আজ বত্রিশ পয়সার সেই ভার। অন্য দিন যে-কাজে হয়রান

হয়ে পড়তুম আজ সে-কাজে ক্লান্তি নেই—হঠাৎ কাজ হালকা হয়ে গেছে। পয়সা সেই পয়সাই আছে, কাজ সেই কাজই আছে, কেবল তার ওজন কমে গেছে কেননা টান যে আজ আমার নিজের কেন্দ্রের দিকে নয়; প্রেমে যে আমাকে বাইরে টান দিয়ে একেবারে এক মুহূর্তে সমস্ত জগতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেছে।

আমাদের সাধনা যেমনই হ'ক আমাদের সংসার সেই সঙ্গে যদি হালকা হতে না থাকে তবে বুঝব যে হল না। যদি বুঝি টাকার ওজন তেমনি ভয়ানক আছে, উপকরণের বোঝা তেমনিই আমাকে চেপে আছে, তার মধ্যে অতি ছোটো টুকুকেও ফেলে দিতে পারি এমন বল আমার নেই; যদি দেখি কাজ যত বড়ো তার ভার যেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাহলে বুঝতে হবে প্রেম জোটে নি—আমাদের বরণসভায় বর আসে নি।

তবে আর ওই শান্তিটুকু নিয়ে কী হবে? ওতে আমাদের আসল জিনিসটা ফাঁকি দিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট করে রাখবে। প্রেমের মধ্যে শুধু শান্তি নেই তাতে অশান্তিও আছে; জোয়ারের জলের মতো কেবল যে তার পূর্ণতা তা নয় তারই মতো তার গতিবেগও আছে;—সে আমাদের ভরিয়ে দিয়ে বসিয়ে রাখবে না, সে আমাদের ভাঁটার মুখের থেকে ফিরিয়ে উলটো টানে টেনে নিয়ে যাবে—তখন এই অচল সংসারটাকে নিয়ে কেবলই গুণ-টানাটানি লগি-ঠেলাঠেলি করে মরতে হবে না—সে হুহু করে ভেসে চলবে।

যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই—ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকাল বেলায় জেগে উঠি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকতে দিয়ো না।

প্রতিদিন প্রাতে যখন অন্ধকারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন যেন দেখতে পাই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছ, সুখের দিন হ'ক, দুঃখের দিন হ'ক, বিপদের দিন হ'ক, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, আজ আমার আর ভাবনা নেই, আমার আজ সমস্তই সহ্য হবে। যখন প্রেম না থাকে, হে সখা, তখনই শান্তির জন্যে দরবার করি। তখন অল্প পুঁজিতে যে কোনো আঘাত সইতে পারি নে—কিন্তু যখন প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন যে-দুঃখ যে-অশান্তিতে সেই প্রেমের পরীক্ষা হবে সেই দুঃখ সেই অশান্তিকেও মাথায় তুলে নিতে পারি। হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না—আমি কেবল প্রেম চাইব। প্রেম শান্তিরূপেও আসবে অশান্তিরূপেও আসবে, সুখ হয়েও আসবে দুঃখ হয়েও আসবে—সে যে-কোনো

বেশেই আসুক তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বলতে পারি তোমাকে চিনেছি, বন্ধু তোমাকে চিনেছি।

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

প্রার্থনা

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয় এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নী দুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো এ-সব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তা হবে না, তবে কি না উপকরণবস্তের যেমনতরো জীবন তোমার জীবন সেই রকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘরদুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্তে বলে উঠলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।" যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব। এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি তো চিন্তার দ্বারা ধ্যানের দ্বারা কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেকলাভ করে এ-কথা বলেন নি—তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন "আমি যা চাই এ তো তা নয়।"

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি—সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানাদিকে নানাভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি এই নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কতদিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বলছে এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এ সবে আমার কোনো ফল হবে না, সে মনে করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে— টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরও-র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে—একদিন একমুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ওই যে বলেছিলেন, আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব, তার মানেটা কী। অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্তকাল বহন করে চলা। অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে জন্মান্তরে বা অবস্থান্তরে টিঁকে থাকা? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না এ কথা নিশ্চিত। তবে তিনি কীভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন।

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি—কিছুতেই তো স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায় আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই।

অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না—যেটা পেলে সে বলতে পারে এ-ছাড়া আমি আর বেশি চাইনে—যাকে পেলে আর ছাড়া-ছাড়ির কোনো কথাই উঠবে না। তাহলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্‌ মানুষ এমন কোন্‌ উপকরণ আছে যাকে

নিয়ে বলতে পারি এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্যেই তো স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, এসব নিয়ে আমি কী করব। আমি যে অমৃতকে চাই।

আচ্ছা, বেশ, উপকরণ তো অমৃত নয়, তাহলে অমৃত কী! আমরা জানি অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাইনি তা নয়। যদি না পেতুম তাহলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌।"

এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার করে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাই নে আমি প্রেম চাই—এ কী কান্না।

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকণ্ঠে চিরন্তনকালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌ এই কথাটি সবেগে বলেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তখনই জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং-গময়—অবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণংমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌?

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণীহৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে।—হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে, হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে, হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্নরাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তাহলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম এধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি তো চিরপ্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হ'ক। হে রুদ্র হে ভয়ানক—তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণংমুখং, তোমার যে প্রসন্নসুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্—তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মতো বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ।

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এস সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ দুটি আজ স্থাপন করো—তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও—নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

২ পৌষ ১৩১৫

বিকার-শঙ্কা

প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।

এমনি করে বস্তুত আমরা গাছকে কেটে ফেলে ফুলকে নেবার চেষ্টা করি, ফুলের সৌন্দর্যে যতই মুগ্ধ হই না, গাছকে যদি তার সঙ্গে তুলনায় নিন্দিত করে, তাকে কঠোর বলে, তাকে দুরারোহ বলে উৎপাটন করে ফুলটি তুলে নেবার চেষ্টা করি তাহলে তখনকার মতো ফুলকে পাওয়া যায় কিন্তু চিরদিন সেই ফুল নূতন নূতন করে ফোটবার মূল আশ্রয়কেই নষ্ট করা হয়। এমনি করে ফুলটির প্রতিই একান্ত লক্ষ্য করে তার প্রতি অবিচার এবং অত্যাচারই করে থাকি।

কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে? তার তিনটি আশ্রয় আছে। একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর—ছন্দ এবং ভাষা; তা ছাড়া ভাবকে যেটির পরে যেটিকে যেরূপে সাজালে তার প্রকাশটি সুন্দর হয় সেই বিন্যাসনৈপুণ্য। এই কলেবর রচনার কাজ যেমন-তেমন করে চলে না—কঠিন নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়—তার একটু ব্যাঘাত হলেই যতিঃপতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছন্দ, ভাষা এবং ভাববিন্যাসে কবিকে নিয়মের বন্ধন স্বীকার করতেই হয়, এতে যথেচ্ছাচার খাটে না। তার পরে আর-একটা বড়ো আশ্রয় আছে সেটা হচ্ছে জ্ঞানের আশ্রয়। সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতরে এমন একটা কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উদ্বোধিত করে তোলে। কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে-কাব্যে রসের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়—সে-কাব্য স্থায়িভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। তার তৃতীয় আশ্রয় এবং শেষ আশ্রয়

হচ্ছে ভাবের আশ্রয়—এই ভাবের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অতএব শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের যে-রস তাই আমাদের স্থায়ীরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।

চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে ম'দো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে! মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বরবিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মত্ততার মধ্যে যে একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বস্তুত লাভ নয়—সেটাতে নিজের স্বভাবের অন্য সবদিক থেকেই হরণ করে কেবল একটিমাত্র দিককে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা হয়। তাতে যে কেবল যে-সকল অংশের থেকে হরণ করা হয় তাদেরই ক্ষতি ও কৃশতা ঘটে তা নয়, যে অংশকে ফাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলা হয় তারও ভাল হয় না। কারণ, স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যখন সহজভাবে সক্রিয় থাকে তখনই প্রত্যেকটির যোগে প্রত্যেকটি সার্থক হয়ে থাকে—একটির থেকে আর-একটি যদি চুরি করে তবে যার চুরি যায় তারও ক্ষতি হয় এবং চোরও নষ্ট হতে থাকে।

তাই বলছিলুম, প্রেম যদি সত্য থেকে জ্ঞান থেকে চুরি করে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে—নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে।

আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে—তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। তাতে সংযম থাকবে, সুবিবেচনা থাকবে এবং সৌন্দর্য থাকবে।[১] এই প্রেম সংসারের মধ্যে চলায় ফেরায়, কথায় বার্তায়, কাজে কর্মে, দেনায় পাওনায়, ছোটোয় বড়োয়, সুখে দুঃখে, ব্যাপ্তভাবে সুতরাং সংযতভাবে নির্মলভাবে মধুরভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক হ্রী আছে সেই লজ্জার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎভাবে পরিব্যাপ্ত

১ স্ত্রীলোকের কোন্ গুণগুলি শ্রেষ্ঠ তাহার উত্তরে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রজ মহাশয় কোনো একটি খাতায় লিখিয়াছিলেন—শ্রী, হ্রী ও ধী।

হতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই সে জলে উঠে হয়তো কর্মকে নষ্ট করে, জ্ঞানকে বিকৃত করে, সংসারকে আঘাত করে, নিজেকে একদমে খরচ করে ফেলে। হ্রী দ্বারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়—এইরূপে সে-প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে। আমাদের পৃথিবীর এই রকমের একটি আবরণ আছে—সেটি হচ্ছে বাতাসের আবরণ। এই আবরণটির দ্বারাই ধরণী সূর্যের আলোককে পরিমিত এবং ব্যাপকভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করে দেয়। এই আবরণটি না থাকলে রৌদ্র যেখানটিতে পড়ত সেখানটিকে দগ্ধ এবং রুদ্ররূপে উজ্জ্বল করত এবং ঠিক তার পাশেই যেখানে ছায়া সেখানে হিমশীতল মৃত্যু ও নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করত। অসতীর যে প্রেমে হ্রী নেই, সংযম নেই, সে প্রেম নিজেকে পরিমিতভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করতে পারে না, সে প্রেম এক জায়গায় উগ্রজ্বালা এবং ঠিক তার পাশেই তেজোহীন আলোকবঞ্চিত ঔদাসীন্য বিস্তার করে।

আমাদেরও এই মানস-পুরীর সতীর প্রেমে ধী থাকবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা থাকবে। এ প্রেম সংস্কারজালে জড়িত মূঢ় প্রেম নয়। পশুদের মতো একটা সংস্কারগত অন্ধ প্রেম নয়। এর দৃষ্টি জাগ্রত, এর চিত্ত উন্মুক্ত। কোনো কল্পনার দ্রব্য দিয়ে এ নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় না—এ যাকে চায় তার অবাধ পরিচয় চায়, তার সম্বন্ধে সে যে নিজের জ্ঞানকে অপমানিত করে রাখবে এ সে সহ্য করতে পার না। এর মনে মনে কেবলই এই ভয় হয় যে পাছে পাবার একান্ত আগ্রহে একটা কোনো ভুলকে পেয়েই সে নিজেকে শান্ত করে রাখে। পাখি যেমন ডিমে তা দেবার জন্যেই ব্যাকুল, তাই সে একটা নুড়ি পেলেও তাতে তা দিতে বসে, তেমনি পাছে আমাদের প্রেম কোনোমতে কেবল আত্মসমর্পণ করতেই ব্যগ্র হয়, কাকে যে আত্মসমর্পণ করছে সেটার দিকে পাছে তার কোনো খেয়াল না থাকে এই আশঙ্কাটুকু যায় না—পতিকে দেখে নেবার জন্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের প্রদীপটিকে যেন সে সাবধানে জ্বালিয়ে রাখতে চায়।

তার পরে আমাদের এই সতীর প্রেমে শ্রী থাকবে, সৌন্দর্যের আনন্দময়তা থাকবে। কিন্তু যদি হ্রীর অভাব ঘটে, যদি ধীর বিকার ঘটে, তবে এই শ্রীও নষ্ট হয়ে যায়।

সতী আত্মা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব ছিল না। তিনি যে অমৃত চেয়েছিলেন, তা পরিপূর্ণ প্রেম—তা কর্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম নয়। তিনি বলেছিলেন, অসতো মা সদ্‌গময়—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। তিনি বলেছিলেন, আমি যাঁকে চাই তিনি যে সত্য, নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে সত্যের বন্ধনে না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার পরিণয়বন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে চিন্তায় কর্মে সত্য হতে হবে, তাহলেই যিনি

বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে, নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা।

তার পরে তিনি বলেছিলেন, তমসো মা জ্যোতির্গময়। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ— বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি যেমন ধ্রুব সত্যরূপে আছেন, তেমনি সেই সত্যকে যে আমরা জানছি সেই জ্ঞান যে জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ। সেইজন্যই তো গায়ত্রী মন্ত্রে একদিকে ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দেশ আছে তেমনি অন্যদিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে— যিনি ধীকে প্রেরণ করছেন তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে ধীস্বরূপ বলেই জানতে হবে। বিশ্বভুবনের মধ্যে সেই সত্যের সঙ্গে মিলতে হবে, জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিলতে হবে। ধ্যানের দ্বারা যোগের দ্বারা এই মিলন।

তার পরের প্রার্থনা মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে পীড়িত খণ্ডিত করছি ; তোমার অনন্ত প্রেম অখণ্ড আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক করো। আমাদের অন্তঃকরণের বহুবিভক্ত রসের উৎস, হে রসস্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমুদ্রে মিলিত হয়ে চরিতার্থ হ'ক। এমনি করে অন্তরাত্মা সত্যের সংযমে, জ্ঞানের আলোকে ও আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রকাশই যাঁর স্বরূপ তাঁকে নিজের মধ্যে লাভ করুক তাহলেই রুদ্রের যে প্রেমমুখ তাই আমাদের চিরন্তন কাল রক্ষা করবে।

৩ পৌষ

দেখা

এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতকাল থেকেই আসছে, প্রত্যহই আসছে। এই আলোকের দূতটি পুষ্পকুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন করে আনছে ; যে কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্‌গম হয়েছে মাত্র তাদের বলছে, তোমরা আজ জান না কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠবে। এই আলোকের দূতটি শস্যক্ষেত্রের উপরে তার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, "তোমরা মনে করছ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্যে চারিদিকের চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হয়ে গেল, কিন্তু তা নয় একদিন তোমাদের জীবনের

মাঝখানটি হতে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ফসলে ভরে যাবে।" যে ফুল ফোটে নি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতীক্ষা নিয়ে আসছে—যে ফসল ধরে নি আলোকের বাণী সেই ফসলের নিশ্চিত আশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্ময় আশা প্রতিদিনই পুষ্পকুঞ্জকে এবং শস্যক্ষেত্রকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শস্যের খেতে আসছে না। এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরই কাছে এর কি কোনো কথা নেই। আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোনো আশা আনছে না, যে আশার সফল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষটি এখনও আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে উর্ধ্ব আকাশের দিকে মাথা তোলে নি?

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে—"দেখো।" বাস্। "একবার চেয়ে দেখো।" আর কিছুই না।

আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনও তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিষটি এখনও ধরে নি। বিকশিত দেখা এখনও হয় নি, ভরপুর দেখা এখনও দেখি নি।

কিন্তু তবু রোজ সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে—দেখো। সেই যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি অশ্রান্ত আশ্বাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—আমাদের এই দেখার ভিতরে এমন একটি দেখার অঙ্কুর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এ-কথা মনে ক'রো না আমার এই কথাগুলি অলংকারমাত্র। মনে ক'রো না, আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা ধ্যানের কথা কিছু বলছি নে. আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

আলোক যে-দেখাটা দেখায় সে তো ছোটোখাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না—দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে, সে কী অদ্ভুত জিনিস। তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি।

এই যে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখছি এই দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার। এ কি নিতান্ত অকারণে মুক্তহস্ত ধনীর অপব্যয়ের মতো আমাদের

চারদিকে কেবল নষ্ট হবার জন্যেই হয়েছে। এতবড়ো দৃশ্যের মাঝখানে থেকে আমরা কিছু টাকা জমিয়ে, কিছু খ্যাতি নিয়ে, কিছু ক্ষমতা ফলিয়েই যেমনি একদিন চোখ বুজব অমনি এমন বিরাটজগতে চোখ মেলে চাবার আশ্চর্য সুযোগ একেবারে চূড়ান্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে! এই পৃথিবীতে যে আমরা প্রতিদিন চোখ মেলে চেয়েছিলুম এবং আলোক এই চোখকে প্রতিদিনই অভিষিক্ত করেছিল, তার কি পুরা হিসাব ওই টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওয়া যায়?

না, তা পাওয়া যায় না। তাই আমি বলছি এই আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিয়ে যাচ্ছে যে, একটি চরম দেখা একটি পরম দেখা আছে সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেইটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।

তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এতবড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি এই চোখ দিয়েই এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এতবড়ো এই গ্রহতারা-চন্দ্রসূর্যখচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে—নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্যমণ্ডল, এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এতবড়ো জগতের সামনে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে।

জেনে হয়তো অনেক লাভ হতে পারে কিন্তু জানার লাভ সে তো জানারই লাভ; তাতে জ্ঞানের তহবিল পূর্ণ হচ্ছে—তা হ'ক। কিন্তু আমি যে বলছি চোখে দেখার কথা। আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনও পাই নি। আমাদের সামনে আমাদের চারদিকে যা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখতে পাই নি—ওই তৃণটিকেও না। আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে—সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অশনবসনের ভাবনা নিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে—সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা করেছে—তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে তার সীমা নেই, সে কাকে যে বলে শরীর কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয় কাকে

যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা কাকে যে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই—এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্তভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যে-রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো। কাকে দেখবে। তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্ত কাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাই নে, ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই যে চারিদিকে আমার যে-কেউ আছে যা-কিছু আছে এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারি নে—কিন্তু এটুকু জানি আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রূপটি যে তার আনন্দরূপ সে-দেখা এখনও আমাদের দেখা হয় নি—মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ সে-দেখার এখনও অনেক বাকি—"আনন্দরূপমমৃতং" এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেইদিনেই তারা সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরমসুন্দর প্রসন্নমুখ তাঁর দক্ষিণং মুখং একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাবে। তখনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে,—তখন ওষধিবনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করে বলতে পারব, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

৪ পৌষ

শোনা

কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে—"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" আমি কোনোমতেই ভুলতে পারছি নে—

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী-মাঝে,
কাজল ঘন-মাঝে, নিশি আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীণ-রণন শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে "বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়—আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে।

বাতাসে যখন ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ সুন্দর করে খেলিয়ে ওঠে তখন তাদের সেই আশ্চর্য মিলন এবং সৌন্দর্যকে আমাদের চোখ দেখতে পায় না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হয়ে প্রকাশ পায়। আবার আকাশের মধ্যে যখন আলোর ঢেউ ধারায় ধারায় বিচিত্র তালে নৃত্য করতে থাকে তখন সেই অপরূপ লীলার কোনো খবর আমাদের কান পায় না, চোখের মধ্যে সেইটে রূপ হয়ে দেখা দেয়। যদি এই মহাকাশের লীলাকেও আমরা কানের সিংহদ্বার দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তাহলে বিশ্ববীণার এই ঝংকারকে আমরা গান বলেও চিনতে পারতুম।

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।

এই বিশ্বের অনেকখানিকেই যদিও আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি নে, তবুও বহুকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলেছেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতায়াতকে নক্ষত্রলোকের গান বলেই বর্ণনা করেছেন। কবিরা বিশ্বভুবনের রূপবিন্যাসের সঙ্গে চিত্রকলার উপমা অতি অল্পই দিয়েছেন তার একটা কারণ, বিশ্বের মধ্যে নিয়ত একটা গতির চাঞ্চল্য আছে কিন্তু শুধু তাই নয়—এর মধ্যে গভীরতর একটা কারণ আছে।

ছবি যে আঁকে তার পট চাই, তুলি চাই, রং চাই, তার বাইরের আয়োজন অনেক। তার পরে সে যখন আঁকতে থাকে তখন তার আরম্ভের রেখাতে সমস্ত ছবির আনন্দ দেখা যায় না—অনেক রেখা এবং অনেক বর্ণ মিললে পর তবেই পরিণামের আভাস পাওয়া যায়। তার পরে, আঁকা হয়ে গেলে চিত্রকর চলে গেলেও সে ছবি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—চিত্রকরের সঙ্গে তার আর কোনো একান্ত সম্বন্ধ থাকে না।

কিন্তু যে গান করে গানের সমস্ত আয়োজন তার নিজেরই মধ্যে—আনন্দ যার, সুর তারই, কথাও তার—কোনোটাই বাইরের নয়। হৃদয় যেন একেবারে অব্যবহিত-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, কোনো উপকরণের ব্যবধানও তার নেই। এইজন্যে গান যদিচ একটা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা রাখে তবু তার প্রত্যেক অসম্পূর্ণ সুরটিও হৃদয়কে যেন প্রকাশ করতে থাকে। হৃদয়ের এই প্রকাশে শুধু যে উপকরণের ব্যবধান নেই তা নয়—কথা জিনিসটাও একটা ব্যবধান—কেননা ভেবে তার অর্থ বুঝতে হয়—গানে সেই অর্থ বোঝবারও প্রয়োজন নেই—কোনো অর্থ না থাকলেও কেবলমাত্র সুরই যা বলবার তা অনির্বচনীয় রকম করে বলে। তার পরে আবার গানের সঙ্গে গায়কের এক মুহূর্তও বিচ্ছেদ নেই—গান ফেলে রেখে গায়ক চলে গেলে গানও তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়। গায়কের প্রাণের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে গানের সুর একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়। যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যত্যয় নেই।

এই বিশ্বসংগীতটিও তার গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিশ্বাসে তাঁরই আনন্দরূপ ধরে উঠছে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে, অথচ ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব। এক সুরকে আর-এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যখন কোনো বচনগম্য অর্থও না পাই তখনও আমাদের চিত্তের কাছে এর প্রকাশ কোনো বাধা পায় না। এ যে চিত্তের কাছে চিত্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ তাঁর তেজ তাঁর শক্তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।

কাল কৃষ্ণএকাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীনকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন ; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম ; সেই

ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে গাঁথা পড়ছিল। তার পরে যখন শুতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে, আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনও সেই জাগ্রত বীনকারের নিশীথ রাত্রের বীণা বন্ধ হবে না—তখনও তাঁর যে ঝংকারের তালে নক্ষত্রমণ্ডলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রানিভৃত দেহ-নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থামবে না, সর্বাঙ্গে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ লক্ষ জীবকোষ আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্কসভার সংগীতচ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাকবে।

"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" আবার আমাদের ওস্তাদজি আমাদের হাতেও একটি করে ছোটো বীণা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে আমরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে শিখি। তাঁর সভায় তাঁরই সঙ্গে বসে আমরা একটু একটু সংগত করব এই তাঁর স্নেহের অভিপ্রায়। জীবনের বীণাটি ছোটো কিন্তু এতে কত তারই চড়িয়েছেন। সব তারগুলি সুর মিলিয়ে বাঁধা কি কম কথা! এটা হয় তো ওটা হয় না, মন যদি হল তো আবার শরীর বাদী হয়—একদিন যদি হল তো আবার আর-একদিন তার নেবে যায়। কিন্তু ছাড়লে চলবে না। একদিন তাঁর মুখ থেকে এ-কথাটি শুনতে হবে—বাহবা, পুত্র, বেশ। এই জীবনের বীণাটি একদিন তাঁর পায়ের কাছে গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া তার সব রাগিণীটি বাজিয়ে তুলবে। এখন কেবল এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই—ঢিল দিলেই ঝনঝন খনখন করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মুক্তও রাখতে হবে—তার উপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধুলো না পড়ে—মরচে না পড়ে—আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা ক'রো—হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।

৫ পৌষ

হিসাব

রোজ কেবল লাভের কথাটাই শোনাতে ইচ্ছে হয়। হিসাবের কথাটা পাড়তে মন যায় না। ইচ্ছে করে কেবল রসের কথাটা নিয়েই নাড়াচাড়া করি, যে-পাত্রের মধ্যে সেই রস থাকে সেটাকে বড়ো কঠিন বলে মনে হয়।

কিন্তু অমৃতের নিচের তলায় সত্য বসে রয়েছেন তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে সেই আনন্দলোকে যাবার জো নেই।

সত্য হচ্ছেন নিয়মস্বরূপ। তাঁকে মানতে হলেই তাঁর সমস্ত বাঁধন মানতেই হয়। যা কিছু সত্য অর্থাৎ যা কিছু আছে এবং থাকে তা কোনোমতেই বন্ধনহীন হতে পারে না—তা কোনো নিয়মে আছে বলেই আছে। যে-সত্যের কোনো নিয়ম নেই, বন্ধন নেই, সে তো স্বপ্ন, সে তো খেয়াল—সে তো স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা, খেয়ালের চেয়েও শূন্য।

যিনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ তিনি অন্যের নিয়মে বদ্ধ হন না তাঁর নিজের নিয়ম নিজেরই মধ্যে। তা যদি না থাকে, তিনি আপনাকে যদি আপনি বেঁধে না থাকেন, তবে তাঁর থেকে কিছুই হতে পারে না, কিছুই রক্ষা পেতে পারে না। তবে উন্মত্ততার তাণ্ডবনৃত্যে কোনো কিছুর কিছুই ঠিকানা থাকত না।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যের রূপই হচ্ছে নিয়ম—একেবারে অব্যর্থ নিয়ম—তার কোনো প্রান্তেও লেশমাত্র ব্যত্যয় নেই। এইজন্যেই এই সত্যের বন্ধনে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হয়ে আছে, এইজন্যই সত্যের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির যোগ আছে এবং তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে।

গাছের যেমন গোড়াতেই দরকার শিকড় দিয়ে ভূমিকে আঁকড়ে ধরা আমাদেরও তেমনি গোড়ার প্রয়োজন হচ্ছে স্থূল সূক্ষ্ম অসংখ্য শিকড় দিয়ে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠা-লাভ করা।

আমরা ইচ্ছা করি না করি, এ সাধনা আমাদের করতেই হয়। শিশু বলে আমি পা ফেলে চলব; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বহু সাধনায় সে চলার নিয়মটিকে পালন করে ভারাকর্ষণের সঙ্গে আপন করতে না পারে ততক্ষণ তার আর উপায় নেই—শুধু বললেই হবে না, আমি চলব।

এই চলবার নিয়মকে শিশু যখনই গ্রহণ করে এ-নিয়ম আর তখন তাকে পীড়া দেয় না। শুধু যে পীড়া দেয় না তা নয় তাকে আনন্দ দেয়; সত্য-নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করবামাত্রই শিশু নিজের গতিশক্তিকে লাভ করে আহ্লাদিত হয়।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে যখন সে জলের সত্য মাটির সত্য আগুনের সত্যকে সম্পূর্ণ মানতে শেখে তখন যে কেবল তার কতকগুলি অসুবিধা দূর হয় তা নয়, জল মাটি আগুন সম্বন্ধে তার শক্তি সফল হয়ে উঠে তাকে আনন্দ দেয়।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে ওঠবার জন্যে বিস্তর সাধনা করতে হয়, তাকে বিস্তর নিয়ম স্বীকার করতে হয়—তাকে অনেক রকম আবদার থামাতে হয়, অনেক রাগ কমাতে হয়—নিজেকে অনেক রকম করে বাঁধতে হয় এবং অনেকের সঙ্গে বাঁধতে হয়। যখন এই বন্ধন-

গুলি মানা তার পক্ষে সহজ হয় তখন সমাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের হয়ে ওঠে—তখনই তার সামাজিক শক্তি সেই সকল বিচিত্র নিয়মবন্ধনের সাহায্যেই বাধামুক্ত হয়ে স্ফূর্তিলাভ করে।

এমনি করে অধিকাংশ মানুষই যখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে মোটামুটি রকমে চলনসই হয়ে ওঠে তখনই তারা নিশ্চিন্ত হয়, এবং নিজেকে অনিন্দনীয় মনে করে খুশি হয়।

কিন্তু এমন টাকা আছে যা গাঁয়ে চলে কিন্তু শহরে চলে না শহরের বাজে দোকানে চলে যায় কিন্তু ব্যাঙ্কে চলে না। ব্যাঙ্কে তাকে ভাঙাতে গেলেই সেখানে যে পোদ্দারটি আছে সে একেবারে স্পর্শমাত্রেই তাকে তৎক্ষণাৎ মেকি বলে বাতিল করে দেয়।

আমাদেরও সেই দশা—আমরা ঘরের মধ্যে গাঁয়ের মধ্যে সমাজের মধ্যে নিজেকে চলনসই করে রেখেছি কিন্তু বড়ো ব্যাঙ্কে যখন দাঁড়াই তখনই পোদ্দারের কাছে একমুহূর্তে আমাদের সমস্ত খাদ ধরা পড়ে যায়।

সেখানে যদি চলতি হতে চাই তবে সত্য হতে হবে, আরও সত্য হতে হবে। আরও অনেক বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে হবে, আরও অনেক দায় মানতে হবে। সেই অমৃতের বাজারে এতটুকু মেকিও চলে না—একেবারে খাঁটি সত্য না হলে অমৃত কেনবার আশা করাও যায় না।

তাই বলছিলুম কেবল অমৃতরসের কথা তো বললেই হবে না, তার হিসাবটাও দেখতে হবে।

আমরা নিজের হিসাব যখন মেলাতে বসি তখন দু-চার টাকার গরমিল হলেও বলি ওতে কিছু আসে যায় না। এমনি করে রোজই গরমিলের অংশ কেবলই জমে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রত্যহই ছোটোবড়ো কত অসত্য কত অন্যায়ই চালিয়ে দিচ্ছি সে-সম্বন্ধে যদি কথা ওঠে তো বলে বসি অমন তো আকসার হয়েই থাকে, অমন তো কত লোকেই করে—ওতে ক'রে এমন ঘটে না যে আমি ভদ্রসমাজের বার হয়ে যাই।

ঘ'রো হিসাবের খাতায় এইরকম শৈথিল্য বটে কিন্তু যারা জাতিতে সাধু, যারা মহাজন, তারা লাখটাকার কারবারে এক পয়সার হিসাবটি না মিললে সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারে না। যারা মস্ত লাভের দিকে তাকিয়ে আছে তারা ছোট্টো গরমিলকেও ডরায়—তারা হিসাবকে একেবারে নিখুঁত সত্য না করে বাঁচে না।

তাই বলছিলুম সেই যে পরম রস প্রেমরস—তার মহাজন যদি হতে চাই তবে

হিসাবের খাতাকে নীরস বলে একটু ফাঁকি দিলেও চলবে না। যিনি অমৃতের ভাণ্ডারী তাঁর কাছে বেহিসাবি আবদার একেবারেই খাটবে না। তিনি যে মস্ত হিসাবি—এই প্রকাণ্ড জগদ্‌ব্যাপারে কোথাও হিসাবের গোল হয় না—তাঁর কাছে কোন্ লজ্জায় গিয়ে বলব, আমি আর কিছু জানি নে, আর কিছু মানি নে, আমাকে কেবল প্রেম দাও, আমাকে প্রেমে মাতাল করে তোলো।

আত্মা যেদিন অমৃতের জন্যে কেঁদে ওঠে তখন সর্বপ্রথমেই বলে—অসতো মা সদ্‌গময়—আমার জীবনকে আমার চিত্তকে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল অসত্য হতে সত্যে বেঁধে ফেলো—অমৃতের কথা তার পরে।

আমাদেরও প্রতিদিন সেই প্রার্থনাই করতে হবে বলতে হবে, অসতো মা সদ্‌গময়—বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজার টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলতে দিয়ো না—তাকে অটুট সত্যের সূত্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে ফেলো—তার পরে সে হার তোমার গলায় যদি পরাতে চাই তবে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না।

৬ পৌষ

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব

উৎসব তো আমরা রচনা করতে পারি নে, যদি সুযোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব। সে-প্রকাশ কবেই বা বন্ধ আছে। পাখি তো রোজই ভোর-রাত্রি থেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার সকালবেলাকার গীতোৎসবের নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে। আর প্রভাতের আনন্দসভাটিকে সাজিয়ে তোলবার জন্য একটি অন্ধকার পুরুষ সমস্ত রাত্রি কত যে গোপন আয়োজন করে তার কি সীমা আছে। শুতে যাবার আগে একবার যদি কেবল তাকিয়ে দেখি তবে দেখতে পাই নে কি জগতের নিত্য উৎসবের মহাবিজ্ঞাপন সমস্ত আকাশ জুড়ে কে টাঙিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে আমাদের উৎসবটা কবে? যেদিন আমরা সময় করতে পারি সেই দিন। যেদিন হঠাৎ হুঁশ হয় যে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে এবং সে নিমন্ত্রণ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। যেদিন স্নান করে সাজ করে ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

সেই দিন উৎসবের সকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি,—বাঃ আজ আলোটি কী মধুর, কী পবিত্র। আরে মূঢ়, এ আলো কবে মধুর ছিল না, কবে পবিত্র ছিল না। তুমি একটা বিশেষ দিনের গায়ে একটা বিশেষ চিহ্ন কেটে দিয়েছ বলেই কি আকাশের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে।

আর কিছু নয়—আজকে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসেছি অন্যদিন করি নি, এইমাত্র তফাত। আয়োজনটা এমনিই প্রতিদিনই ছিল, প্রতিদিনই আছে। জগৎ যে আনন্দরূপ এইটে আজ দেখব বলে কাজকর্ম ফেলে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমিও নিজের আনন্দময় স্বরূপটিকেই ছুটি দিয়েছি; আজ বলেছি, থাক্ আজ দেনাপাওনার টানাটানি, ঘুচুক আজ আত্মপরের ভেদ, মরুক আজ সমস্ত কার্পণ্য, বাহির হ'ক আজ যত ঐশ্বর্য আছে। যে আনন্দ জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র বিরাজমান সেই আনন্দকে আজ আমার আনন্দনিকেতনের মধ্যে দেখব। যে উৎসব নিখিলের উৎসব সেই উৎসবকে আজ আমার উৎসব করে তুলব।

বিশ্বের একটা মহল তো নয়। তার নানা মহলে নানারকম উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্জনে নানাক্ষেত্রে উৎসবের নানা ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মূর্তি। নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত আশ্রমের যে প্রাত্যহিক উৎসব, আমরা আশ্রমের আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে সূর্যতারা ও তরুশ্রেণীর সঙ্গে কোনোদিন যোগ দিয়েছি? আমরা এই আশ্রমটিকে কি তার সমস্ত সত্যে ও সৌন্দর্যে দেখেছি। দেখি নি। এই আশ্রমের মাঝখানে থেকেও আমরা প্রতিদিন প্রাতে সংসারের মধ্যেই জেগেছি এবং প্রতিদিন রাত্রে সংসারের কোলেই শুয়েছি।

৩৬৪ দিন পরে আজ আমরা আশ্রমবাসিগণ এই আশ্রমকে দেখতে এসেছি। যখন সূর্য পূর্বগগনকে আলো করে ছিল তখন দেখতে পাই নি—যখন আকাশ ভরে তারার দীপমালা জলেছিল তখনও দেখতে পাই নি,—আজ আমাদের এই কটা তেলের আলো বাতির আলো জ্বালিয়ে একে দেখব! তা হ'ক, তাতে অপরাধ নেই। মহেশ্বরের মহোৎসবের সঙ্গে যোগ দিতে গেলে আমাদেরও যেটুকু আলোর সম্বল আছে তাও বের করতে হয়। শুধু তাঁর আলোতেই তাঁকে দেখব এ যদি হত তাহলে সহজেই চুকে যেত—কিন্তু এইটুকু কড়ার তিনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন যে, আমাদের আলোটুকুও জ্বালতে হবে—নইলে দর্শন হবে না, মিলন ঘটবে না—আমাদের যে অহংকারটি দিয়ে রেখেছেন সে এরই জন্যে। অহংকারের আগুন জেলে আমরা মহোৎসবের মশাল তৈরি করব। তাই চিরজাগ্রত আনন্দকে দেখবার জন্যে আমার

নিজের এইটুকু আনন্দকেও জাগিয়ে তুলতে হয়, সেই চিরপ্রকাশিত জ্ঞানকেও জানবার জন্যে আমার জ্ঞানটুকুর ক্ষুদ্র পলতেটিকে উসকে দিতে হয়—আর যাঁর প্রেম আপনি প্রবাহিত হয়ে ছাপিয়ে পড়ছে তাঁর সেই অফুরান প্রেমকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি নে যদি ছোটো জুঁইফুলটির মতো আমাদের এই এতটুকু প্রেমকে না ফুটিয়ে তুলতে পারি।

এইজন্যেই বিশ্বেশ্বরের জগদ্ব্যাপী মহোৎসবেও আমরা ঠিকমতো যোগ দিতে পারি না যদি আমরা নিজের ক্ষুদ্র আয়োজনটুকু নিয়ে উৎসব না করি। আমাদের অহংকার আজ তাই আকাশপরিপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চোখের সামনে নিজের এই দরিদ্র আলো কয়টা নির্লজ্জভাবে জ্বালিয়েছে। আমাদের অভিমান এই যে, আমরা নিজের আলো দিয়েই তাঁকে দেখব। আমাদের এই অভিমানে মহাদেব খুশি, তিনি হাসছেন। আমাদের এই প্রদীপ কটা জ্বালা দেখে সেই কোটি সূর্যের অধিপতি আনন্দিত হয়েছেন। এই তো তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখবার শুভ অবসর। এই সুযোগটিতে আমাদের সমস্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই চেতনা আমাদের সমস্ত শরীরে জেগে উঠে রোমে রোমে পুলকিত হ'ক, এই চেতনা দিবালোকের তরঙ্গে তরঙ্গে স্পন্দিত হ'ক, নিশীথরাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'ক, আজ সে যেন ঘরের কোণে ঘরের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত না হয়, নিখিলের পক্ষে যেন মিথ্যা হয়ে না থাকে—আজ সে কোনোখানে সংকুচিত হয়ে বঞ্চিত না হয়। অনন্ত সভার সমস্ত আয়োজন, সমস্ত দর্শন স্পর্শন মিলন কেবল এই চৈতন্যের উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে—এইজন্যে আলো জ্বলছে, বাঁশি বাজছে—দূতগুলি চতুর্দিক থেকেই দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে—সমস্তই প্রস্তুত, ওরে চেতনা, তুই কোথায়। ওরে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

৭ পৌষ

দীক্ষা

একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল—এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন। ওই দিনটিকে এই আশ্রমের কৌটোটির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। আজ কৌটো উদ্‌ঘাটন করে রত্নটিকে এই প্রান্তরের আকাশের মধ্যে তুলে ধরে দেখব—এখানকার ধূলিবিহীন নির্মল নিভৃত আকাশতলে যে নক্ষত্রমণ্ডলী দীপ্তি পাচ্ছে সেই

তারাগুলির মাঝখানে তাকে তুলে ধরে দেখব। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদ্‌ঘাটন করার দিন, সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।

এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সেই দীক্ষার যে কতবড়ো অর্থ আজকের দিন কি সে-কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে? সেই কথাটি না শুনে গেলে কী জন্যেই বা এসেছি আর কী নিয়েই বা যাব?

সেই যেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পৌষের সূর্য একদিন উদিত হয়েছিল সেই দিনে আলোও জ্বলে নি, জনসমাগমও হয় নি—সেই শীতের নির্মল দিনটি শান্ত ছিল, স্তব্ধ ছিল। সেই দিনে যে কী ঘটছে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেন নি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ জানছিলেন।

সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'এই যে জিনিসটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য—এর ভার যখন গ্রহণ করেছ তখন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমস্তই যায় তো সমস্তই যাক। কিন্তু সাবধান, তোমার হাতে আমার সত্যের অসম্মান না ঘটে।'

তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই সত্যের দান নিয়ে তার পরে আর তো তিনি ঘুমোতে পারেন নি। তাঁর আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল—এতবড়ো বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়, এত তার সহায়, সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের সমস্ত আনুকূল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এ যে প্রভুর সত্য। এই অগ্নি রক্ষার ভার নিয়ে আর আরাম নেই, আর নিদ্রা নেই। রুদ্রদেবের সেই অগ্নিদীক্ষা আজকের দিনের উৎসবের মাঝখানে আছে। কিন্তু সে কি প্রচ্ছন্নই থাকবে? এই গীত-বাদ্যকোলাহলের মাঝখানে প্রবেশ করে সেই 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' যিনি তাঁর দীপ্ত সত্যের বজ্রমূর্তি আজ প্রত্যক্ষ করে যাবে না? গুরুর হাত হতে সেই যে "বজ্রমুদ্যতং" তিনি গ্রহণ করেছিলেন এই ৭ই পৌষের মর্মস্থানে সেই বজ্রতেজ রয়েছে।

কিন্তু শুধু বজ্র নয়, শুধু পরীক্ষা নয়, সেই দীক্ষার মধ্যে যে কী বরাভয় আছে তাও দেখে যেতে হবে। সেই ধনিসন্তানের জীবনে যে সংকটের দিন এসেছিল তা তো সকলের জানা আছে। যে বিপুল ঐশ্বর্য রাজহর্ম্যের মতো একদিন তাঁর

আশ্রয় ছিল সেইটে যখন অকস্মাৎ তাঁর মাথার উপরে ভেঙে পড়ে তাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার উদ্‌যোগ করেছিল তখন সেই ভয়ংকর বিপৎপতনের মাঝখানে একমাত্র এই সত্যদীক্ষা তাঁকে আবৃত করে রক্ষা করেছিল—সেইদিন তাঁর আর-কোনো পার্থিব সহায় ছিল না। এই দীক্ষা শুধু যে দুর্দিনের দারুণ আঘাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিল তা নয়—প্রলোভনের দারুণতর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল।

আজকের এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে—সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব। সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে আজ যদি ভক্তির সঙ্গে তাই স্মরণ করে যেতে পারি তাহলে ধন্য হব। এর মধ্যে ফাঁকি নেই, লুকোচুরি নেই, দ্বিধা নেই, দুই দিক বজায় রেখে চলবার চাতুরী নেই, নিজেকে ভোলাবার জন্যে সুনিপুণ মিথ্যাযুক্তি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্যে বুদ্ধির দুই চক্ষু অন্ধ করা নেই, মানুষের হাটে বিকিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের ধন চুরি করা নেই। সেই সত্যকে সমস্ত দুঃখপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে নিলে তার পরে একেবারে নির্ভয়, ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার লাভ—চিরজীবনের যে গম্যস্থান, যে অমৃতনিকেতন, সেই পথের যিনি একমাত্র বন্ধু তাঁরই আশ্রয়প্রাপ্তি সত্যদীক্ষার এই অর্থ।

সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষার দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারিদিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে; আমাদের জীবন, আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা একে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে; এই দিনটিরই আহ্বানে কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে; এবং তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে। এই দিনটিকে যেন আমাদের অন্যমনস্ক জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে না রাখি—একে ভক্তিপূর্বক সমাদর করে ভিতরে ডেকে নাও, আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে সম্পদে পূর্ণ করো।

হে দীক্ষাদাতা, হে গুরু, এখনও যদি প্রস্তুত হয়ে না থাকি তো প্রস্তুত করো, আঘাত করো, চেতনাকে সর্বত্র উদ্যত করো—ফিরিয়ে দিয়ো না, ফিরিয়ে দিয়ো না—

দুর্বল ব'লে তোমার সভাসদ্‌দের সকলের পশ্চাতে ঠেলে রেখো না। এই জীবনে সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে—নির্ভয়ে এবং অসংকোচে। অসত্যের স্তূপাকার আবর্জনার মধ্যে ব্যর্থ জীবনকে নিক্ষেপ করব না। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে—তুমি শক্তি দাও।

৭ পৌষ

মানুষ

কালকের উৎসবমেলার দোকানি পসারিরা এখনও চলে যায় নি। সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আগুন জেলে গল্প করে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণচতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপাসনার স্থানে এসে বসলুম তখনও রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার ;—এখানকার ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্ষুর অক্লিষ্ট জাগরণের মতো অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে, ভাঙামেলার লোকেরা শুকনো পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে।

অন্যদিন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা। বাগানের সমস্ত পাখি জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না—শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।

কিন্তু কয়জন মানুষে মিলে যখন কলরব করে তখন প্রভাত প্রকৃতির এই স্তব্ধতা কেন এমন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উপাসনার জন্যে সাধক পশুপক্ষিহীন স্থান তো খোঁজে না, মানুষহীন স্থান খুঁজে বেড়ায় কেন?

তার কারণ এই যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানুষ একটানে একতালে চলে না। এইজন্যেই যেখানেই মানুষ থাকে সেইখানেই চারিদিকে সে নিজের একটা তরঙ্গ তোলে ; সে একটিমাত্র কথা না বললেও, তারার মতো নিঃশব্দ ও একটুমাত্র নড়াচড়া না করলেও বনস্পতির মতো নিস্তব্ধ থাকে না। তার অস্তিত্বই অগ্রসর হয়ে আঘাত করে।

ভগবান ইচ্ছা করেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য একটুখানি নষ্ট করে দিয়েছেন—এই তাঁর আনন্দের কৌতুক। ওই যে আমাদের পঞ্চভূতের মধ্যে একটু বুদ্ধির সঞ্চার করেছেন, একটা অহংকার যোজনা করে বসে আছেন, তাতে করেই

আমরা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছি—ওই জিনিসটার দ্বারাতেই আমাদের পংক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এইজন্যেই গ্রহসূর্যতারার সঙ্গে আমরা আর মিল রক্ষা করে চলতে পারি নে—আমরা যেখানে আছি সেখানে যে আমরা আছি এ কথাটা আর কারও ভোলবার জো থাকে না।

ভগবান আমাদের সেই সামঞ্জস্যটি নষ্ট করে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের একঘরে করে দেওয়াতে সকালবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের নিজের কাজের ধন্দায় নিজে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ওই সামঞ্জস্যটি ভেঙে গেছে বলেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট বিশ্বের শান্তি নেই—আমাদের ভিতরকার নানা মহল থেকে রব উঠেছে চাই চাই চাই। শরীর বলছে চাই, মন বলছে চাই, হৃদয় বলছে চাই—এক মুহূর্তও এই রবের বিশ্রাম নেই। যদি সমস্তর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিল থাকত তাহলে আমাদের মধ্যে এই হাজার সুরে চাওয়ার বালাই থাকত না।

আজ অন্ধকার প্রত্যুষে বসে আমার চারিদিকে সেই বিচিত্র চাওয়ার কোলাহল শুনছিলুম—কত দরকারের হাঁক। ওরে গোরুটা কোথায় গেল! অমুক কই! আগুন চাই রে! তামাক কোথায়! গাড়িটা ডাক্‌ রে! হাঁড়িটা পড়ে রইল যে!

এক জাতের পাখি সকালে যখন গান গায় তখন তারা একসুরে একরকমেরই গান গায়—কিন্তু মানুষের এই যে কলধ্বনি তাতে এক জনের সঙ্গে আর-এক জনের না আছে বাণীর মিল, না আছে সুরের।

কেননা ভগবান ওই যে অহংকারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। আমাদের রুচি আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা সমস্তই এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আশ্রয় করে এক-একটি অপরূপ মূর্তি ধরে বসে আছে। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি চলেইছে। কাড়াকাড়ি-টানাটানির অন্ত নেই। তাতে কত বেসুর কত উত্তাপ যে জন্মাচ্ছে তার আর সীমা নেই। সেই বেসুরে পীড়িত সেই তাপে তপ্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যগত অসামঞ্জস্য কেবলই সামঞ্জস্যকে প্রার্থনা করছে, সেইজন্যেই আমরা কেবলমাত্র খেয়ে পরে জীবন ধারণ করে বাঁচি নে। আমরা একটা সুরকে একটা মিলকে চাচ্ছি। সে চাওয়াটা আমাদের খাওয়াপরার চাওয়ার চেয়ে বেশি বই কম নয়—সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই। সেইজন্যেই কথা নেই বার্তা নেই আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি—কত লিখছি কত আঁকছি কত গড়ছি। কত গৃহ কত সমাজ বাঁধছি, কত ধর্মমত ফাঁদছি। আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা। এই সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষার তাগিদে

নানা দেশের মানুষ কত নানা আকৃতির রাজ্যতন্ত্র গড়ে তুলছে। কত আইন, কত শাসন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষাদীক্ষা। কী করলে নানা মানুষের নানা অহংকারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে এই চেষ্টায় এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

এই চেষ্টার তাড়নাতেই মানুষ আপনার একটা সৃষ্টি তৈরি করে তুলছে—নিখিল সৃষ্টি থেকে এই অহংকারের মধ্যে নির্বাসিত হওয়াতেই তার এই নিজের সৃষ্টির এত অধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাস কেবলই এই সৃষ্টির ইতিহাস, এই সমন্বয়ের ইতিহাস ;—তার সমস্ত ধর্ম ও কর্ম, সমস্ত ভাব ও কল্পনার মধ্যে কেবলই এই অমিলের মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। পেতে চাই, পেতে চাই, মিলতে চাই, মিলতে চাই। এ ছাড়া আর কথা নেই।

সেইজন্যে এই মাঠ জুড়ে নানা লোকের নানা স্বতন্ত্র প্রয়োজনের নানা কলরবের মধ্যে যখন শুনলুম একজন গান গাচ্ছে, "হরি আমায় বিনামূল্যে পার করে দাও" তখন সেই গানটির ভিতর এই সমস্ত কলরবের মাঝখানটির কথা আমি শুনতে পেলুম। সমস্ত চাওয়ার ভিতরকার চাওয়া হচ্ছে এই পার হতে চাওয়া। যে বিচ্ছিন্ন সে কেবলই বলছে, ওগো আমাকে এই বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ করে দাও। এই বিচ্ছেদ পার হলেই তবে যে প্রেম পূর্ণ হয়। এই প্রেম পূর্ণ না হলে কোনো কিছু পেয়েই আমার তৃপ্তি নেই—নইলে কেবলই মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যাচ্ছি—একের থেকে আরে ঘুরে মরছি—মিলে গেলেই এই বিষম আপদ চুকে যায়।

কিন্তু যে মিলটি হচ্ছে অমৃত, তাকে পেতে গেলেই তো বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পেতে হয়। মিলে থাকলে তো মিলকে পাওয়া হয় না।

সেইজন্যে ঈশ্বর যে অহংকার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদপারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে—এ সমস্তই তার পার হবার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্মতন্ত্রই বল।

কিন্তু তাই যদি হয় তবে পার হয়ে যাব কোথায় ? তবে কি অহংকারকে একেবারেই লুপ্ত করে দিয়ে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদের দেশে যাওয়াই অমৃতলোক প্রাপ্তি ? সেই দেশেই তো ধুলা মাটি পাথর রয়েছে। তারা তো সমষ্টির সঙ্গে একতানে মিলে চলেছে কোনো বিচ্ছেদ জানে না। এই রকমের আত্মবিলয়ের জন্যেই কি মানুষ কাঁদছে ?

কখনোই নয়। তা যদি হত সকল প্রকার বিলয়ের মধ্যেই সে সান্ত্বনা পেত আনন্দ

পেত। বিলুপ্তিকে যে মানুষ সর্বান্তঃকরণে ভয় করে তার প্রমাণ-প্রয়োগের কোনো দরকার নেই। কিছু একটা গেল এ-কথার স্মরণ তার সুখের স্মরণ নয়। এই আশঙ্কা এবং এই স্মরণের সঙ্গেই তার জীবনের গভীর বিষাদ জড়িত—সে ধরে রাখতে চায় অথচ ধরে রাখতে পারে না। মানুষ সর্বান্তঃকরণে যদি কিছুকে না চায় তো সে বিলয়কে।

তাই যদি হল তবে যে অসামঞ্জস্য যে বিচ্ছেদের উপর তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত, সেইটেকে কি সে চায়? তাও তো চায় না। এই বিচ্ছেদ এই অসামঞ্জস্যের জন্যেই তো সে চিরদিন কেঁদে মরছে। তার যত পাপ যত তাপ সে তো একেই আশ্রয় করে। এইজন্যেই তো সে গান গেয়ে উঠছে—হরি আমায় বিনামূল্যে পার করো। কিন্তু পারে যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়াই হল তবে তো আমরা মুশকিলেই পড়েছি। তবে তো এপারে দুঃখ আর ওপারে ফাঁকি।

আমরা কিন্তু দুঃখকেও চাই নে ফাঁকিকেও চাই নে। তবে আমরা কী চাই, আর সেটা পাবই বা কী করে।

আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না—দুই যখন একসঙ্গে থাকে, অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না—তারা পরস্পরের সহায় হয়।

এই ভেদ ও ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনোটাকেই ছাড়তে চাই নে। আমাদের যা কিছু প্রয়াস যা কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যেই—দুইয়ের মধ্যেই এককে লাভ করবার জন্যে। আমাদের প্রেমের ভগবান যখন আমাদের পার করবেন তখন তিনি আমাদের চিরদুঃখের বিচ্ছেদকেই চিরন্তন আনন্দের বিচ্ছেদ করে তুলবেন। তখন তিনি আমাদের এই বিচ্ছেদের পাত্র ভরেই মিলনের সুধা পান করাবেন। তখনই বুঝিয়ে দেবেন বিচ্ছেদটি কী অমূল্য রত্ন।

৮ পৌষ

ভাঙা হাট

মানুষের মনটা কেবলই যেমন বলছে চাই, চাই, চাই—তেমনি তার পিছনে পিছনেই আর-একটি কথা বলছে চাই নে, চাই নে, চাই নে। এইমাত্র বলে, না হলে নয়, পরক্ষণেই বলে কোনো দরকার নেই।

ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল, গোটাকতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই, তখন এমনি হয়েছিল যে, না হলে চলে না। শীতে খোলা মাঠের মধ্যে ওই একটুখানি আশ্রয় রচনা করাই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনসাধন বলে মনে হয়েছিল। কোনোমতে একটা চুলো বানিয়ে শুকনো পাতা জ্বালিয়ে যা হ'ক কিছু একটা রেঁধে নিয়ে আহার করবার চেষ্টাও অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। এ চাওয়া ও চেষ্টার কাছে পৃথিবীর আর-সমস্ত ব্যাপারই ছোটো হয়ে গিয়েছিল।

কোনো গতিকে এই কাঠকুটো পাতালতা সংগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু আজ রাত্রি না যেতেই শুনতে পাচ্ছি—"ওরে গাড়ি কোথায় রে, গোরু জোত রে।" যেতে হবে, এবার গ্রামে যেতে হবে। এই চলে যাওয়ার প্রয়োজনটাই এখন সকলের বড়ো। কাল রাত্রিবেলাকার একান্ত প্রয়োজনগুলো আজ আবর্জনা হয়ে পড়ে রইল,—কাল যাকে বলেছিল বড়ো দরকার, আজ তাকে পরিত্যাগ করে যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত।

বিশ্বমানবও এমনি করেই এক যুগ থেকে আর-এক যুগে যাবার আয়োজন করছে। যখন নূতন প্রভাত উঠছে, যখন রাত ভোর হবে হবে করছে—তখন এ ওকে ঠেলাঠেলি করে ডাকছে—ওরে চল্ রে—ওরে গোরু কোথায় রে, ওরে গাড়ী কোথায়। তখন ওই রাত্রির অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীগুলো এই দিনের আলোতে অত্যন্ত আবর্জনা হয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে রইল। শুকনো পাতা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে, তার ছাইগুলো জমে উঠছে। ভাঙা হাঁড়িসরা-শালপাতায় মাঠ বিকীর্ণ। আশ্রয়গৃহগুলি আশ্রিতদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অত্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট ও লজ্জিত হয়ে আছে। সমস্তই রইল—পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে—এবারে যাত্রা করে বেরোতে হবে। আবার, আবার আর-এক যুগের প্রয়োজন সংগ্রহ করতে হবে। তখন মনে হবে এইবারকার এই প্রয়োজনগুলিই চরম—আর কোনো দিন ভোরের বেলায় গাড়িতে গোরু জুততে হবে না। এই বলে আবার কাঠকুটো ডালপালা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু তখনও এই অত্যন্ত একান্ত প্রয়োজনের দূর সম্মুখ দিগন্ত থেকে করুণ ভৈরবীসুরে বাণী আসছে, প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই।

যদি এই সুরটুকু না থাকত—যদি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভিতরেই অত্যন্ত অপ্রয়োজন বাস না করত তাহলে কি আমরা বাঁচতে পারতুম। প্রয়োজন যদি সত্যই একান্ত হত তাহলে তার ভয়ংকর চাপ কে সহ্য করতে পারত। অত্যন্ত অপ্রয়োজনের দিন ও রাত্রি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভার হরণ করে রয়েছে বলেই আমরা দরকারের অতি প্রবল মাধ্যাকর্ষণের মধ্যেও চলাফেরা করে বেড়াতে পারছি। সেইজন্যেই ভোরের আলো, দেখা দেবামাত্রই রাশীকৃত বোঝা যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে ফেলে রেখে আমরা গাড়িতে চড়ে বসতে পারছি। "কিছুই থাকে না" বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছি—তেমনি "কিছুই নড়ে না" বলে হতাশ হয়ে পড়ছি নে। থাকছেও বটে যাচ্ছেও বটে, এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা ফাঁকও পেয়েছি আশ্রয়ও পেয়েছি—আমাদের ঘরও জুটেছে আলোবাতাসও মারা যায় নি।

৮ পৌষ

উৎসবশেষ

আমরা অনেক সময় উৎসব করে ফতুর হয়ে যাই। ঋণশোধ করতেই দিন বয়ে যায়। অল্পসম্বল ব্যক্তি যদি একদিনের জন্যে রাজা হওয়ার শখ মেটাতে যায় তবে তার দশদিনকে সে দেউলে করে দেয়, আর তো কোনো উপায় নেই।

সেইজন্যে উৎসবের পরদিন আমাদের কাছে বড়ো ম্লান। সেদিন আকাশের আলোর উজ্জ্বলতা চলে যায়—সেদিন অবসাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু উপায় নেই। মানুষ বৎসরে অন্তত একটা দিন নিজের কার্পণ্য দূর করে তবে সেই অকৃপণের সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। ঐশ্বর্যের দ্বারা সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।

দুই রকমের উপলব্ধি আছে। এক রকম—দরিদ্র যেমন ধনীকে উপলব্ধি করে, দানপ্রাপ্তির দ্বারা। এই উপলব্ধিতে পার্থক্যটাকেই বেশি করে বোঝা যায়। আর-একরকম উপলব্ধি হচ্ছে সমকক্ষতার উপলব্ধি। সেইস্থলে আমাকে দ্বারের বাইরে বসে থাকতে হয় না—কতকটা এক জাজিমে বসা চলে।

প্রতিদিন যখন আমরা দীনভাবে থাকি তখন নিরানন্দ চিত্তটা আনন্দময়ের কাছে ভিক্ষুকতা করে। উৎসবের দিনে সেও বলতে চায়, আজ কেবল নেওয়া নয় আজ আমিও তোমার মতো আনন্দ করব—আজ আমার দীনতা নেই কৃপণতা নেই, আজ আমার আনন্দ এবং আমার ত্যাগ তোমারই মতো অজস্র।

এইরূপে ঐশ্বর্য জিনিসটি কী, অকৃপণ প্রাচুর্য কাকে বলে সেটা নিজের মধ্যে অনুভব করলে ঈশ্বর যে কেবলমাত্র আমার অনুগ্রহকর্তা নন তিনি যে আমার আত্মীয় সেটা আমি বুঝি এবং প্রমাণ করি।

কিন্তু এইটে বুঝতে এবং প্রচার করতে গিয়ে অনেক সময় শেষে দুঃখ পেতে হয়। পরদিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট, গলা বাতি এবং শুকনো মালার দিকে তাকিয়ে মন উদাস হয়ে যায়—তখন আর চিত্তের রাজকীয় ঔদার্য থাকে না—হিসাবের কথাটা মনে পড়ে মন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু দুঃখ পেতে হয় না তাকে যে প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে তোলে—প্রতিদিনই যে লোক উৎসবের আয়োজন করে চলেছে—যার উৎসবদিনের সঙ্গে প্রতিদিনের সম্পূর্ণ পার্থক্য নেই, পরস্পর নাড়ির যোগ আছে।

এটি না হলেই আমাদের ঋণ করে উৎসব করতে হয়। আনন্দ করি বটে কিন্তু সে আনন্দের অধিকাংশই ঠিক নিজের কড়ি দিয়ে করি নে—তার পনেরো আনাই ধারে চালাই। লোক-সমাগম থেকে ধার করি, ফুলের মালা থেকে, আলো থেকে, সভাসজ্জা থেকে ধার করি—গান থেকে বাজনা থেকে বক্তৃতা থেকে ধার নিই। সেদিনকার উত্তেজনায় চেতনাই থাকে না যে ধারে চালাচ্ছি—পরদিনে যখন ফুল শুকোয়, আলো নেবে, লোক চলে যায় তখন দেনার প্রকাণ্ড শূন্যতাটা চোখে পড়ে হৃদয়কে ব্যাকুল করে।

আমাদের এই দৈন্যবশতই উৎসবদেবতাকে আমরা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জন দিয়ে বসি—উৎসবের অধিপতিকে প্রতিদিনের সিংহাসনে বসাবার কোনো আয়োজন করি নে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে আমরা কয়জন প্রতিদিন প্রত্যুষে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্রে মিলে কিছু কিছু জমাচ্ছিলুম—আমরা এই উৎসবের মেলায় একেবারেই রবাহূত বিদেশীর মতো জুটি নি,—আমাদের প্রতিদিনের সকালবেলায় সব-কটিই হাতে হাতেই বাজে খরচ হয়ে যায় নি। আমার উৎসবকর্তাকে বোধ করি বলতে পেরেছি যে তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে, তোমার নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি।

তার পরে আমাদের উৎসবকে হঠাৎ এক দিনেই সাঙ্গ করে দেব না—এই উৎসবকে আমাদের দৈনিক উৎসবের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। প্রতিদিন প্রাতঃকালেই আমাদের দশজনের এই উৎসব চলতে থাকবে। আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতা এবং আত্মবিস্মৃতির মধ্যে অন্তত একবার করে দিনারম্ভে জগতের নিত্য উৎসবের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করে যাব। যখন প্রত্যহই উষা তাঁর আলোকটি হাতে করে

পূর্বদিকের প্রান্তে এসে দাঁড়াবেন তখন আমরা কয় জনেই স্তব্ধ হয়ে বসে অনুভব করব আমাদের প্রত্যেক দিনই মহিমান্বিত ঐশ্বর্যময়,—আমাদের জীবনের তুচ্ছতা তাকে লেশমাত্র মলিন করে নি—প্রতিদিনই সে নবীন, সে উজ্জ্বল, সে পরমাশ্চর্য—তার হাতের অমৃতপাত্র একেবারে উপুড় করে ঢেলেও তার এক বিন্দু ক্ষয় হয় না।

৯ পৌষ

সঞ্চয়তৃষ্ণা

একদিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি সঞ্চয় করেন না আমাদের প্রাচীন সংহিতায় সেই দ্বিজ গৃহীকেই প্রশংসা করছেন। কেননা একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহুদূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমনি কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে।

আধ্যাত্মিক সঞ্চয় সম্বন্ধেও যে এ-কথা খাটে না তা নয়। আমরা যদি কোনো পুণ্যকে মনে করি যে ভবিষ্যৎ কোনো একটা ফললাভের জন্যে তাকে জমাচ্ছি, তা হলে জমানোটাই আমাদের পেয়ে বসে—তার সম্বন্ধে আমরা কৃপণের মতো হয়ে উঠি—তার সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিকতা একেবারে চলে যায় ; সব কথাতেই কেবল আমরা সুদের দিকে তাকাই, লাভের হিসাব করতে থাকি।

এমন অবস্থায় পুণ্য আমাদের আনন্দকে উপবাসী করে রাখে এবং মনে করে উপবাস করেই সেই পুণ্যের বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে। এইরূপ আধ্যাত্মিক সাধনাক্ষেত্রেও অনেক কৃপণ আহারকে জমিয়ে তুলে প্রাণকে নষ্ট করে।

আধ্যাত্মিক গৃহস্থালিতে আমরা কালকের জন্যে আজকে ভাবব না। তা যদি করি তবে আজকেরটাকেই বঞ্চিত করব। আমরা জমানোর কথা চিন্তাই করব না, আমরা খরচই জানি। আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা যেন আমাদের প্রতিদিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়। মনে করব না তার থেকে আমরা শান্তিলাভ করব, পুণ্যলাভ করব, ভবিষ্যতে কোনো একসময়ে পরিত্রাণলাভ করব, বা আর কিছু। যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে তা হাতে হাতে সমস্তই তাঁকে ঢেলে শেষ করে দিতে হবে ; তাঁকেই সব দেওয়াতেই সেই দেওয়ার শেষ।

যদি আমরা মনে করি তাঁর উপাসনা করে আমার পুণ্য হচ্ছে তাহলে সমস্ত পূজা ঈশ্বরকে দেওয়া হয় না পুণ্যের জন্যেই তার অনেকখানি জমানো হয়। যদি মনে করতে আরম্ভ করি ঈশ্বরের যে কাজ করছি তার থেকে লোকহিত হবে তাহলে লোকহিতের উত্তেজনাটা ক্রমেই ঈশ্বরের প্রসাদলাভকে খর্ব করে দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

ধর্মব্যাপারে এই পাপের ছিদ্র দিয়েই বিষয়কর্মের সাংসারিকতার চেয়ে তীব্রতর সাংসারিকতা প্রবেশলাভ করে। তার থেকেই ক্রোধ বিদ্বেষ পরনিন্দা পরপীড়ন নিশাচরগণ ধর্মের নামে তাদের গুহাগহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ে—মতের সঙ্গে মতের যুদ্ধে পৃথিবী একেবারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তখন ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি। আমরা হিত করব, আমরা পুণ্য করব, আমরা ঈশ্বরকে প্রচার করব এই কথাটাই ক্রমে ভীষণ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে—ঈশ্বর করবেন সে আর মনে থাকে না। তখন ঈশ্বরের ভৃত্যেরাই ঈশ্বরের পথ রোধ করে দাঁড়ায়,—কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে পুণ্য।

তাই আমার এক-একবার ভয় হয় আমিও বা সকালবেলায় ক্রমে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের কথা জমাবার ব্যবসা খুলেছি। তোমরা কী করলে বুঝবে, তোমাদের কী করলে ভালো লাগবে, কী করলে আমার কথা হিতকর হয়ে উঠবে এই ভাবনা ক্রমে বুঝি আমাকে পেয়ে বসে। তার ফল হবে এই যে, উপাসনার উপলক্ষ্যে এমন একটা কিছু জমানো চলতে থাকবে যার দিকে আমার বারো আনা মন পড়ে থাকবে—যদি কেউ বলে তোমার কথা ভালো বোঝা যাচ্ছে না বা তুমি ভালো সাজিয়ে বলতে পার নি তাহলে আমার রাগ হবে।

শুধু তাই নয়, আমার কথার দ্বারা অন্য লোকে ফল পাবে এই চিন্তা গুরুতর হয়ে উঠলে অন্য লোকের উপর জুলুম করবার প্রবৃত্তি ঘাড়ে চেপে বসে। যদি দেখি যে মনের মতো ফল হচ্ছে না তাহলে জবরদস্তি করতে ইচ্ছা করে, তখন, নিজের শক্তি ও অধিকারকে নয়, অন্যেরই বুদ্ধি ও স্বভাবকে ধিক্‌কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন আর মনের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে পারি নে যে ঈশ্বর তাঁর বহুধাশক্তিযোগে বিচিত্র উপায়ে বিচিত্র মানবের মঙ্গল করুন তখন আমাদের অসহিষ্ণু উদ্যম এই কথাই বলতে থাকে যে আমারই শক্তি আমারই বাক্য আমারই উপায়ে পৃথিবীর লোককে আমারই মতে বাধ্য করে তাদের ভালো করুক।

সেইজন্যে ওই আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা থেকে এই যে কিছু কিছু করে কথা বাঁচাচ্ছি একেই আমি ভয় করি। এই কথা আমার বোঝা না হ'ক, আমার বন্ধন না হ'ক, আমার পথের বাধা না হ'ক। এই কথা সম্পূর্ণই তোমার সেবায় উৎসর্গীকৃত মনে করে যেন নিজ খাতে এর কোনো হিসাব না রাখি। এর যদি কোনো ফল থাকে তবে তুমি ফলাও—আমার মমতার নাড়ি বিচ্ছিন্ন করে এ যেন ভূমিষ্ঠ হয়। হে নীরব, এই প্রভাতের উপাসনার সমস্ত বাক্যকে তুমি গ্রহণের দ্বারাই সফল করো, আমার কণ্টকিত অহংকারের বৃন্ত থেকে একে একেবারে উৎপাটিত করে নাও।

১০ পৌষ

পার করো

সেই যে সেদিন ভাঙামেলার ভোর রাত্রে নানা হাসিতামাশা-গোলমাল-তুচ্ছকথার মাঝখানে গান উঠেছিল—হরি আমায় পার করো—সে আমি ভুলতে পারছি নে, সে আমাকে আজও বিস্মিত করছে।

এই যে কথাটা মানুষ এতদিন থেকে বলে আসছে, আমায় পার করো, এটা একটা আশ্চর্য কথা। তার এই আকাঙ্ক্ষাটা আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ জানে কি না তাও বুঝতে পারি নে।

যদি কোনো সাধক সংসারের সমস্ত চেষ্টা ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাঁর সাধন-সমুদ্রের কূলে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, হে সিদ্ধিদাতা, তুমি আমাকে সিদ্ধির কূলে পার করে দাও তবে তার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু যার সম্মুখে কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো সাধনা নেই—তার নাবিক কোথায়, তার সমুদ্র কোথায়, সে কী পার হতে চাচ্ছে? তার এপারটাই বা কোথায় আর ওপারটাই বা কোথায়?

আমরা আমাদের কাজকর্মের ভিড়ের মাঝখানে থেকেই বলছি, হরি পার করো; গাড়োয়ান যখন গাড়ি চালাচ্ছে, বলছে পার করো; মুদি যখন চালডাল ওজন করছে, বলছে পার করো।

মনে ক'রো না তারা বলছে আমাদের এই কর্ম হতেই পার করো। তারা কর্মের মধ্যে থেকেই পার হতে চাচ্ছে সেইজন্যে গান গাবার সময় তাদের কাজ কামাই যাচ্ছে না।

হে আনন্দসমুদ্র, এপারও তোমার ওপারও তোমার। কিন্তু একটা পারকে যখন আমার পার বলি তখন ওপারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়, ওপারের জন্যে ভিতরে ভিতরে কেবলই তার প্রাণ কাঁদতে থাকে। আমার পারের আমিটি তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিণী। পার হবার জন্যে তাই এত ডাকাডাকি।

এইটে আমার ঘর বলে আমি-লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরছে, যতক্ষণ না বলতে পারছে এইটে তোমারও ঘর, ততক্ষণ তার যে কত দাহ কত বন্ধন কত ক্ষতি তার সীমা নেই—ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে করতে তার অন্তরাত্মা কেঁদে গাইতে থাকে, হরি আমায় পার করো। যখনই সে আমার ঘরকে তোমার ঘর করে তুলতে পারে তখনই সে ঘরের মধ্যে থেকে পার হয়ে যায়। আমার কর্ম মনে ক'রে আমি লোকটা রাত্রিদিন যখন হাঁসফাঁস করে বেড়ায়, তখন সে কত আঘাত পায় আর কত আঘাত করে, তখনই

তাঁর গান, আমায় পার করো—যখন সে বলতে পারে, তোমার কর্ম, তখন সে পার হয়ে গেছে।

আমার ঘরকে তোমার ঘর করব, আমার কর্মকে তোমার কর্ম করব তবেই তো আমাতে তোমাতে মিল হবে। আমার ঘর ছেড়ে তোমার ঘরে যাব, আমার কর্ম ছেড়ে তোমার কর্মে যাব এ-কথা আমাদের প্রাণের কথা নয়। কেননা, এও যে বিচ্ছেদের কথা। যে-আমির মধ্যে তুমি নেই, আর যে-তুমির মধ্যে আমি নেই দুইই আমার পক্ষে সমান।

এইজন্যেই আমাদের ঘরের মাঝখানেই, আমাদের কাজকর্মের হাটের মধ্যেই দিনরাত রব উঠছে, হরি আমায় পার করো। এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার।

১১ পৌষ

এপার ওপার

যার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে মাত্র সে আমার পাশে বসে থাকলেও তার আর আমার মাঝখানে একটি সমুদ্র পড়ে থাকে—সেটি হচ্ছে অচৈতন্যের সমুদ্র, ঔদাসীন্যের সমুদ্র। যদি কোনোদিন সেই লোক আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে ওঠে তখনই সমুদ্র পার হয়ে যাই। তখন আকাশের ব্যবধান মিথ্যা হয়ে যায়, দেহের ব্যবধানও ব্যবধান থাকে না, এমন কি, মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তরাল রচনা করে না। যে অহংকার আমাদের পরস্পরের চারদিকে পাঁচিল তুলে পরস্পরকে অতিনিকটেও দূর করে রাখে, সে যার জন্যে পথ ছেড়ে দেয় সেই আমাদের আপন হয়ে ওঠে।

সেইজন্যে কাল বলেছিলুম সমুদ্র পার হওয়া কোনো একটা সুদূরে পাড়ি দেবার ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে কাছের জিনিসকেই কাছের করে নেওয়া।

বস্তুত আমাদের যত কাছের জিনিস যত দূরে রয়েছে তার দূরত্বটাও ততই ভয়ানক। এই কারণেই, আমরা আত্মীয়কে যখন পর করি তখন পরের চেয়ে তাকে বেশি পর করি। যার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আছি তাকে যখন অনুভবমাত্র করি নে তখন সেই অসাড়তা মৃত্যুর অসাড়তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই কারণেই, জগতের সকলের চেয়ে যিনি অন্তরতম তাঁকেই যখন দূর বলে জানি তখন তিনি জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়েন—যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ তিনি ওই স্থূল দেয়ালের চেয়ে দূরে দাঁড়ান—সংসারে তখন এমন কোনো দূরত্ব নেই

যার চেয়ে দূরে তিনি সরে না যান। এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি নে বটে কিন্তু এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব, আমাদের ঘরদুয়ার, কাজকর্ম, আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

অথচ যে সমুদ্রপারের জন্যে আমরা কেঁদে বেড়াচ্ছি সে পারটা যে কত কাছে—এমন কি, এপারের চেয়েও যে সে কাছে, সে-কথা, যাঁরা জানেন, তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন। শুনলে হঠাৎ আমাদের চমক লাগে—মনে হয় এত কাছের কথাকেও আমরা এতই দূর করে জেনেছিলুম। একেই বলেছিলুম অগম্য, অপার, অসাধ্য।

যাঁরা সমুদ্র পার হয়েছেন তাঁরা কী বলেন। তাঁরা বলেন, এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমাসম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এষঃ মানে ইনি—এই সামনেই যিনি, এই কাছেই যিনি আছেন। অস্য মানে ইহার—সেও খুব নিকটের ইহার। ইনিই হচ্ছেন ইহার পরম গতি। যিনি যার পরম গতি তিনি তার থেকে লেশমাত্র দূরে নেই। এতই কাছে যে তাঁকে ইনি বললেই হয়, তাঁর নাম করবারও দরকার নেই—"এই যে ইনি" বলা ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না। ইনিই হচ্ছেন ইহার সমস্তই। ইনি যে কে এবং ইহার যে কাহার সে আর বলাই হল না। সমুদ্রের এপারে যে আছে সে তো ওপারের লোককে এষঃ বলে না, ইনি বলে না।

ইনি হচ্ছেন ইহার পরমাগতি। আমরা যে চলি, আমাদের চালায় কে? আমরা মনে করি টাকা আমাদের চালায়, খ্যাতি আমাদের চালায়, মানুষ আমাদের চালায়; যিনি পার হয়েছেন তিনি বলেন ইনিই ইহার গতি—এঁর টানেই এ চলেছে—টাকার টান, খ্যাতির টান, মানুষের টান, সব টানের মধ্যে পরম টান হচ্ছে এঁর—সব টান যেতে পারে কিন্তু সে টান থেকেই যায়—কেননা সব যাওয়ার মধ্যেই তাঁর কাছে যাওয়ার তাগিদ রয়েছে। টাকাও বলে না তুমি এইখানেই থেকে যাও, খ্যাতিও বলে না, মানুষও বলে না—সবাই বলে তুমি চলো—যিনি পরমাগতি তিনিই গতি দিচ্ছেন, আর কেউ যে পথের মধ্যে বরাবরের মতো আটক করে রাখবে এমন সাধ্য আছে কার?

আমরা হয়তো মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্যকে কে আকর্ষণ করছে? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহতারানক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না। সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্যেরও গতি।

এই পরমাগতির কথা স্মরণ করেই উপনিষৎ বলেছেন "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—কেই বা কোনোপ্রকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্তগতি দান করে রয়েছেন—আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চোখের পাতাটি আমি খুলতে পারছি।

তাই আমি বলছি, আমার পরমাগতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমাগতি আছেন। যেমন আপেল ফলটি মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণশক্তি আছে। আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার যিনি পরমাগতি, তিনি হচ্ছেন এষঃ, এই ইনি। সেই গতির কেন্দ্র দূরে নয়—এই যে এইখানেই।

তার পরে যিনি আমাদের পরম সম্পৎ, আমাদের পরম আশ্রয়, আমাদের পরম আনন্দ—তিনি আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত সম্পদ, প্রতিদিনের সমস্ত আশ্রয় এবং প্রতিদিনের সমস্ত আনন্দের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের ধনজন, আমাদের ঘরদুয়ার, আমাদের সমস্ত রসভোগের মধ্যেই যিনি পরমরূপে রয়েছেন তিনি যে এষঃ—তিনি যে ইনি—এই যে এইখানেই।

আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্রয়কে আমার সমস্ত আনন্দেই সেই পরম আনন্দকে এষঃ বলে জানব—একেই বলে পার হওয়া।

১২ পৌষ

৩

দিন

প্রতিদিনই আলোক এবং অন্ধকার, নিদ্রা এবং জাগরণ, সংকোচন এবং প্রসারণের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন চলেছে—একবার তার জোয়ার একবার তার ভাঁটা। রাত্রে নিদ্রার সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের শক্তি আমাদের নিজের মধ্যেই সংহৃত হয়ে আসে। সকাল বেলায় সমস্ত জগতের দিকে ধাবিত হয়।

শক্তি যখন কেবল আমাদের নিজের মধ্যে সমাহৃত হয় সেই সময়েই কি আমরা নিজেকে বেশি করে জানি, বেশি করে পাই? আর সকালে যখন আমাদের শক্তি অন্যের দিকে নানা পথে বিকীর্ণ হতে থাকে তখনই কি আমরা নিজেকে হারাই?

ঠিক তার উলটো। কেবল নিজের মধ্যে যখন আমরা আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন আমরা জাগ্রত, তখনই আমরা নিজেকে জানি। যখন আমরা একা তখন আমরা কেউ নই।

আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে—সেইজন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি, কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন তখন তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল। কারণ, সত্যকে সর্বত্র দেখলেই তার সত্যমূর্তি প্রকাশ পায় এবং সেই মূর্তিই আমাদের আনন্দ দান করে।

তেমনি আমরা আমাদের নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হবে। যে কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতররূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীয় বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

এই কারণেই মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা কিছু সৃষ্টি করছে তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্য এই যে, মানুষ একাকিত্ব

পরিহার করে বহুর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—এই তার যথার্থ সুখ। এইজন্যেই বলা হয়েছে "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাই সুখ অল্পে সুখ নেই। তার কারণ, অল্পে আত্মাও অল্প হয়।

যে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বহুকে বিচিত্রভাবে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গৌরব। নইলে কেবল উপকরণবাহুল্য এবং সুবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।

সভ্যসমাজে যেখানে জ্ঞান প্রেম ও কর্মচেষ্টা নিয়ত দূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে আছে সেইখানে যে-মানুষ বাস করে সে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে না। সে ব্যক্তির শক্তি অল্প হলেও সে শক্তি সহজেই নিজেকে সার্থক করবার অবকাশ পায়। এইজন্যেই সকলের যোগে ভূমার যোগে সভ্যসমাজবাসী প্রত্যেকেই যথাসম্ভব বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাববলিষ্ঠ লোকও দুর্বল হয়ে থাকে, কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল ঘরের উপযোগী গ্রামের উপযোগী, ভূমার সঙ্গে যে-সকল সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানের যোগ নেই—সেখানে চিত্তসমুদ্রের জোয়ার এসে পৌঁছোয় না; এইজন্যে সেখানে মানুষ নিজের সত্য নিজের গৌরব অনুভব করে শক্তিলাভ করতে পারে না, সে সর্বত্র পরাভূত হয়ে থাকে। তার দারিদ্র্যের অন্ত থাকে না।

এইজন্যেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলওয়ে টেলিগ্রাফের জন্যে নয়। কারণ রেলওয়ে টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ—কোনো স্থানীয় ইস্টেশন বিশেষ নয়।

এই সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সংকীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি তখন ধর্মবুদ্ধি সংকীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে বহুলোককে বহুবন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল হওয়া চাই। সেখানে ধৈর্যবীর্য অধ্যবসায় ত্যাগ সেবাপরতা লোকহিতৈষা সমস্তই খুব বড়ো রকমের না হলে নয়। বস্তু কোনো মতেই বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে না যদি তাকে ধরে রাখবার উপযোগী ধর্মও বৃহৎ না হয়—ধর্ম যখনই দুর্বল হয় তখনই বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কখনোই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না।

অতএব যখনই বহুব্যাপারবিশিষ্ট বহুদূরব্যাপ্ত বহুশক্তিশালী কোনো সভ্যসমাজকে

দেখব তখনই গোড়াতেই ধরে নিতে হবে তার ভিতরে একটি প্রবল ধর্মবুদ্ধি আছে—নইলে এতলোকে পরস্পরে বিশ্বাস পরস্পরে যোগ, এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।

আমাদের দেশের সমাজেও সমস্ত ক্ষুদ্রতা বিচ্ছিন্নতা দূর করে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবাত্মা কখনোই বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত হতে পারবে না। সাধারণের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতই নানা প্রকার আচারে বিচারে বাধা প্রাপ্ত হতে থাকবে ততই আমাদের নিরানন্দ, অক্ষমতা ও দারিদ্র্য কেবলই বেড়ে চলবে। আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্ত্বের তপস্যা চলবে না।

সেই সুযোগ রচনা করবার জন্যে আমরা নানাদিক থেকে চেষ্টা করছি। কিন্তু ছোটো-বড়ো আমরা যা কিছু বেঁধে তুলতে চাচ্ছি তার মধ্যে যদি কেবলই বিশ্লিষ্টতা এসে পড়ছে এইটেই দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে গোড়ায় ধর্মবুদ্ধির দুর্বলতা আছে—নিশ্চয়ই সত্যের অভাব আছে, ত্যাগের কার্পণ্য আছে, ইচ্ছার জড়তা আছে; নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার বল নেই এবং পূজার উপকরণ থেকে আমাদের আত্মাভিমান নিজের জন্য বৃহৎ অংশ চুরি করবার চেষ্টা করছে; নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা রয়েছে, ক্ষমা নেই; এবং মঙ্গলকেই মঙ্গলের চরম ফলরূপে গণ্য করতে না পারাতে আমাদের অধ্যবসায় ক্ষুদ্র বাধাতেই নিরস্ত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব আমাদের সতর্ক হতে হবে। যেখানে কৃতকার্যতার বাধা ঘটবে সেখানে নির্বাক উপকরণের প্রতি দোষারোপ করে যেন নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা না করি। পাপ আছে তাই বাঁধছে না, ধর্মের অভাব আছে তাই কিছুই ধরা যাচ্ছে না। *এইজন্যেই* আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে সর্ববিষয়েই নিষ্ফল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—*এইজন্যেই* আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টা সম্মিলিত হয়ে মানবাত্মার উপযুক্ত বিহারক্ষেত্র নির্মাণ করছে না—আমাদের আত্মা কোনোমতেই সেই বিশ্বকর্মা বিরাট পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্য নিজের বিরাট রূপ ধারণ করতে পারছে না।

১৩ পৌষ

রাত্রি

গতকল্য রাত্রি এবং দিন, নিদ্রা এবং জাগরণের একটি কথা বলা হয় নি। সেটাই হচ্ছে প্রধান কথা।

যখন আমরা জাগ্রত থাকি তখন আমাদের শক্তির সঙ্গে শক্তির লীলা ঘটে। বিশ্ব-কর্মার বিশ্বকর্মের সঙ্গে আমাদের কর্মের যোগসাধন হয়। যিনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি"—তাঁরই সেই বহুবিভক্ত শক্তির বিচিত্র প্রবাহ-পথে আমাদের চেষ্টাকে চালন করে আমরা শক্তির আশ্চর্য গতিসকল আবিষ্কার করে আনন্দিত হই। এক সময়ে যেখানে মনে করেছিলুম শক্তির শেষ, চলতে গিয়ে দেখতে পাই সেখান থেকে পথ আবার একটা নূতন বাঁক নিয়েছে;—এমনি করে জগদ্ব্যাপারের সেই বহুধাশক্তির মধ্যে নিজের শক্তিকেও বহুধা করে দিয়ে তার সঙ্গে সকল দিকে সমান গতিলাভ করবার জন্যে আমাদের চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এমনি করে আমাদের জাগ্রত চৈতন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ও মানসশক্তির জালকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করে নানা বেগ, নানা স্পর্শ, নানা লাভের দ্বারা নিজেকে সার্থক করে।

কিন্তু কেবলই জাল বাইচ করে তো জেলের চলে না। জালে গ্রন্থি পড়ে, জাল ছিঁড়ে আসে, জাল মলিন হয়। তখন আবার সেগুলো সংশোধন করে নেবার জন্যে জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়।

রাত্রে নিদ্রার সময় আমরা প্রাণের জাল-বাওয়া, চেতনার জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিই। তখন সংশোধন ও ক্ষতি-পূরণের সময়। তখন আমাদের ছিন্নভিন্ন গ্রন্থিল মলিন জালটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিতে হয় "য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ" যে পুরুষ, সকলে যখন সুপ্ত তখন জাগ্রত থেকে, প্রয়োজনসকলকে নির্মাণ করছেন।

অতএব একবার করে নিজের সমস্ত চেষ্টাকে সংবরণ করে সম্পূর্ণভাবে সেই বিশ্ব-প্রাণের হাতে আমাদের প্রাণকে সমর্পণ করে দিতে হয়—সেই সময়ে আমরা গাছপালার সমান হয়ে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো বিচ্ছেদ থাকে না, আমাদের অহংকারের একেবারে নিবৃত্তি হয়, তখনই আমরা নিখিলের অন্তর্বর্তী যে গভীর আরাম তাকেই লাভ করি। জেগে উঠে বুঝতে পারি যে, বিশ্রামকে আমরা এতক্ষণ কেবলমাত্র শূন্যতারূপে পাই নি, তা একটা পূর্ণ বস্তু, আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও সে একটা

আরাম—সেটা হচ্ছে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মূলগত আরাম—যে আরামের শ্যামল মূর্তি ও নির্বাক প্রকাশ আমরা শাখাপল্লবিত নিস্তব্ধ বনস্পতির মধ্যে দেখতে পাই।

এই যেমন আমাদের প্রাণকে প্রতি রাত্রে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করে দিয়ে আমরা প্রভাতে নূতন প্রাণচেষ্টার জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হয়ে উঠি—তেমনি দিনের মধ্যে অন্তত একবার করে আমাদের আত্মাকে পরমাত্মার হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেবার প্রয়োজন আছে—নইলে আবর্জনা জমে ওঠে, ভাঙাচোরাগুলো সারে না, তাপ বাড়তেই থাকে—কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলো তাদের প্রয়োজনকে অতিক্রম করে অন্তরে বাহিরে বিদ্রোহ রচনা করে।

সেইজন্যে প্রভাতে উপাসনার সময়ে আমাদের সকল চেষ্টাকে ক্ষান্ত করে সব রিপুকে শান্ত করে কিছুকালের জন্যে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করে নেওয়া দরকার—সেই সময়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে পরমাত্মাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিতে হবে;—তাহলে সেই একান্ত আত্মবিসর্জনের সুগভীর শান্তির সুযোগে আমাদের মনের ব্যাধির মধ্যে স্বাস্থ্যের সঞ্চার হবে, সমস্ত সংকোচন প্রসারিত হয়ে যাবে এবং হৃদয়গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে আসবে।

তার পরে উপাসনাশান্ত সেই আমাদের অন্তরপ্রকৃতি যখন সংসারে বিচিত্রের মধ্যে, বহুর মধ্যে বিভক্ত হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে নানা আকারে প্রকারে আত্মোপলব্ধিতে প্রবৃত্ত হবে তখন সকল কাজে সে গম্ভীরভাবে পবিত্রভাবে নিযুক্ত হতে পারবে, তখন কথায় কথায় চতুর্দিককে সে আঘাত দিতে থাকবে না, তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে শান্তি থাকবে। বিশাল বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে যেমন একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে, যেটি থাকাতে সমস্ত চেষ্টার মূর্তি শান্ত ও শক্তির মূর্তি সুন্দর হয়ে উঠেছে—যেটি থাকাতে বিশ্বজগৎ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা অথবা প্রকাণ্ড কারখানাঘরের মতো কঠোর আকার ধারণ করে নি—আমাদের চেষ্টার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য থাকবে, আমাদের কর্মের মধ্যে সেই সৌন্দর্য ফুটে উঠবে। ঈশ্বর যেমন করে কাজ করেন, কিছুক্ষণ তাঁর কাছে আমাদের সমস্ত অহংকারটি নিবৃত্ত করে দিয়ে তাঁর সেই পরম সুন্দর কৌশলটি শিখে নেব। আপনাকে তাঁর চরণ-প্রান্তে উপস্থিত করে দিয়ে বলব, জননী, প্রাতঃকালে এর উপরে তোমার নিপুণ হস্তটি একবার স্পর্শ করে দাও—তাহলে গতকল্যকার সংসারের আঘাতে এর উপরে যে সকল ছিন্নতা এসেছে তা সমস্তই সেরে যাবে।

আমরা যদি প্রতিদিন দিবসারম্ভে তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ ললাটে গ্রহণ করে নিয়ে যাই এবং সে কথা যদি স্মরণ রাখি তবে ললাটকে আর ধূলিতে লুণ্ঠিত করতে পারব না। এই উপাসনার সুরটি যেন তানপুরার সুরের মতো আমাদের মধ্যে সমস্তদিন নিয়তই

বাজতে থাকে—যাতে আমাদের প্রত্যেক কথাটি এবং ব্যবহারটিকে সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বিচার করতে পারি এবং সমস্ত দিনকে বিশুদ্ধ সংগীতে পরিণত করে সংসারের কর্মক্ষেত্রকে আনন্দক্ষেত্র করে তুলতে পারি।

১৪ পৌষ

প্রভাতে

প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখো সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, তিনি নিবিড়ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়। আমি যে কিছুমাত্র ক্ষুদ্র নই, অশক্ত নই, মানবসমাজে মহাপুরুষেরা তার প্রমাণ দিয়েছেন—তাঁদের যে সিদ্ধি সে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধি—আমাদের প্রত্যেক আত্মার শক্তি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়েছে। বাতির উর্ধ্বভাগ যখন আলোকশিখা লাভ করেছে তখন সে লাভ সমস্ত বাতির। বাতির নিতান্ত নিম্ন ভাগেও সেই জ্বলবার ক্ষমতা রয়েছে—যখন সময় হবে সেও জ্বলবে—যখন সময় না হবে তখন সে উপরের জ্বলন্ত অংশকে ধারণ করে থাকবে। প্রতিদিন প্রভাতের উপাসনায় নিজের ভিতরকার মানবাত্মার সেই মাহাত্ম্যকে আমরা যেন একেবারে বাধামুক্ত করে দেখে নিতে পারি। নিজেকে দীন দরিদ্র বলে আমাদের যে ভ্রম আছে সেই ভ্রম যেন দূর করে যেতে পারি। আমরা যে কেবল ঘরের কোণে জন্মলাভ করেছি বলে একটা সংস্কার নিয়ে বসে আছি সেটা যেন ত্যাগ করে স্পষ্ট অনুভব করি ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকে আমার এই শরীরের জন্ম সেইজন্যে বহুলক্ষ যোজন দূর পথ হতে আমাদের জ্যোতিষ্ক কুটুম্বগণ আমাদের তত্ত্ব নেবার জন্যে আলোকের দূত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর আমার অহংকারটুকুর মধ্যেই যে আমার আত্মার চরম আবাস তা নয়—যে অধ্যাত্মলোকে তার স্থিতি সে হচ্ছে ব্রহ্মলোক। যে জগৎসভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্ব করবার আমাদের অধিকার, এখানে আমরা দাসত্ব করতে আসি নি। যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা যেন নিজেকে অকুলীন বলে মাথা হেঁট করে সংকুচিত হয়ে সংসারে সঞ্চরণ না করি—নিজের অনন্ত আভিজাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।

আকাশের অন্ধকার যেমন নিতান্ত কাল্পনিক পদার্থের মতো দেখতে দেখতে কেটে গেল—আমাদের অন্তরপ্রকৃতির চারদিক থেকে সমস্ত মিথ্যা সংস্কার তেমনি করে মুহূর্তে কেটে যাক। আমাদের আত্মা উদয়োন্মুখ সূর্যের মতো আমাদের চিত্তগগনে তার বাধামুক্ত জ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রকাশ পাক—তার উজ্জ্বল চৈতন্যে তার নির্মল আলোকে আমাদের সংসারক্ষেত্র সর্বত্র পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হ'ক।

১৫ পৌষ

বিশেষ

জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে—ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, ঘাসের সঙ্গে গাছের সঙ্গে আমার মিল আছে ; পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে ; কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্ছি বিশেষ। আমি যাকে আজ আমি বলছি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এ-সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্ব—এ কেবলমাত্র আমি, একলা আমি, অনুপম অতুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহা বিজনলোকে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কারও প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

হে আমার প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে—সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু। আমি নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমার এই মানবজন্ম তোমার সেই বিশেষ লীলাটিকে যেন সৌন্দর্যের সঙ্গে সংগীতের সঙ্গে পবিত্রতার সঙ্গে মহত্ত্বের সঙ্গে সচেতনভাবে বহন করে নিয়ে যায়। আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ অধিষ্ঠান আছে সে কথা যেন কোনোদিন কোনোমতেই না ভোলে। অনন্ত বিশ্বসংসারে এই যে একটি আমি হয়েছি মানবজীবনে এই আমি সার্থক হ'ক।

এই আমিটিকে আর সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনছ। সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে একে হাতে ধরে নিয়ে এসেছ কিন্তু কারও

সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেল নি। কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণুপরমাণুকে চালন করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্তন, কত পরিণতির মধ্যে দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ! তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এই আমির রেখা—সেই রেখাপথে তোমার সঙ্গে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হ'ক তোমার চেয়ে বড়ো না হ'ক। আর আমার এই যে সাধারণ জীবন যা নানা ক্ষুধাতৃষ্ণা চিন্তাচেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে, আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ আনন্দ অনন্তকালের সুহৃদ ও সারথীরূপে রয়েছে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না দাঁড়ায়। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করি, না পালন করলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি—কিন্তু আমিরূপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র বলে জানতে চাই। সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ—কেননা স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না। এইজন্যে এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ, আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খ্রীস্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, এই আমি-নিকেতনেই যে তোমার চরমলীলা। সেইজন্যেই তো এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান—সেইজন্যেই তো এইখানেই মৃত্যু—এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্ছে। এই দুঃখ ও সুখ, বিচ্ছেদ ও মিলন, অমৃত ও মৃত্যু, এই তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বলতে পারি, আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছুই চাই নে।

১৬ পৌষ ১৩১৫

প্রেমের অধিকার

কাল রাত্রে এই গানটা আমার মনের মধ্যে বাজছিল—

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না, থেকো না দূরে।
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব,
সব বাধা ভাঙিয়া দাও।

কিন্তু এ কেমন প্রার্থনা। এ প্রেম কার সঙ্গে। মানুষ কেমন করে একথা কল্পনাতে এনেছে এবং মুখে উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে।

বিশ্বভুবন বলতে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় একজন মানুষ যে কত ক্ষুদ্র সে কথা মনে করলে যে মুখ দিয়ে কথা সরে না। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র, আমার সুখ-দুঃখ কতই অকিঞ্চিৎকর। সৌরজগতের মধ্যে সেই মানুষ এক মুষ্টি বালুকার মতো যৎসামান্য—এবং সমস্ত নক্ষত্রলোকের মধ্যে এই সৌরজগতের স্থান এত ছোটো যে অঙ্কের দ্বারা তার গণনা করা দুঃসাধ্য।

সেই সমস্ত অগণ্য অপরিচিত লোকলোকান্তরের অধিবাসী এই মুহূর্তেই সেই বিশ্বেশ্বরের মহারাজ্যে তাদের অভাবনীয় জীবনযাত্রা বহন করছে। এমন সকল জ্যোতিষ্কলোক অনন্ত আকাশের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে যার আলোক যুগযুগান্তর হতে অবিশ্রাম যাত্রা করে আজও আমাদের দূরবিক্ষণ ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করে নি। সেই সমস্ত অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকও সেই পরমপুরুষের পরমশক্তির উপরে প্রতিমুহূর্তেই একান্ত নির্ভর করে রয়েছে, আমরা তার কিছুই জানি নে।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে গিয়ে বসবে! অনন্ত আকাশের নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোমহুতাশন যুগযুগান্তর জ্বলছে আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবির জোরে দ্বারীকে বলছি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে!

বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই একথা জানা কথা। শুনেছি না কি আলেকজাণ্ডার এমনি ভাবে কথা বলেছিলেন যে একটা পৃথিবী জয় করে তাঁর সুখ হচ্ছে না, আর একটা পৃথিবী যদি থাকত তবে তিনি জয়যাত্রায় বেরোতেন।

দুবেলা যার অন্ন জোটে না সেও কুবেরের ভাণ্ডারের স্বপ্ন দেখে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যে কোনো কল্পনাকেই অসম্ভব বলে মানে না এমন প্রমাণ অনেক আছে।

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এও কি তার সেই অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহংকারেরই একটা অশান্ত পরিচয়?

কিন্তু এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক খেপেছে—সে যে নিজেকে দীন করে—সকলের পিছনে সে যে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারি তাঁদের পায়ের ধুলো পেলেও সে যে বাঁচে। কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশ্বর্যের কাঙাল সে নয়—সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

সেইজন্যেই জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য বলে আমার মনে হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়—এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড়ো সত্য, বড়ো লাভ বলে চায়। কেন চায়? কেননা মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম এতে আর ভয় লজ্জা কিসের।

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এইখানেই যে আমার সকলের চেয়ে বড়ো দাবি—সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারার চেয়ে বড়ো দাবি। সর্বত্র বিশ্বের ভারাকর্ষণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকত তাহলে সে যে একে ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দিত।

প্রকাণ্ড জগতের চাপ এই আমিটুকুর উপর নেই বলেই এই আমিটি নিজের গৌরব রক্ষা করে কেমন মাথা তুলে চলেছে। পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী। আমি জগতের মাঝখানে থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

সেইজন্যেই জগতের সঙ্গে নিজেকে ওজন করে ক্ষুদ্র বললে তো চলবে না। তার সঙ্গে আমি তো তুলনীয় নই।

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এইজন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যেই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষৎ বলে গিয়েছেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখির মতো, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।

তাঁর জগতের রাজ্যে আমাকে খাজনা দিতে হয়; এই জলস্থল আকাশ বাতাসের

অনেক রকমের ট্যাক্স আছে সমস্তই আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়—যেখানে কিছু দেনা পড়ে সেইখানেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমার এই আমিটুকু একেবারে লাখেরাজ, ওইখানেই বন্ধুর মন্দির কিনা, আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব—যদি না দাও তবু আমার যা দেবার তার থেকে বঞ্চিত করব না।

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কী হত। কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনন্ত একলা। তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই একাধিপত্য এক জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন—বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজন দরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।"

এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি আমি তোমাকে চাই নে। সে কথা তাঁর ধূলি জলকে বলতে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা তখনই আমাকে মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি, তোমাকে আমি চাই নে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই—তিনি বলেন আচ্ছা বেশ। বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন।

এ দিকে কখন এক সময়ে হুঁশ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি তো আমার খাতাঞ্জির হাতে নেই—টাকা কড়ি ধন দৌলত তো সেখানে কোনোমতে পৌঁছোয় না। ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলাঘরটি জগতের আর একটি মহান একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যে দিন বলতে পারব আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এস; যে দিন বলতে পারব চন্দ্রসূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন—সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে।

সে দিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই ঘটবে যে, নিজেকে যতই দীন বলে জানব তাঁর প্রেমকে ততই বড়ো করে বুঝব। তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত বলে জানব নিজেকে বড়ো করে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয় কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয় সুধারসে ভরে উঠলে ততই সে বেশি করে পূর্ণ হয়। এইজন্যে প্রেম যখন লাভ

করি তখন নিজেকে বড়ো করে জানাবার কোনো ইচ্ছাই হয় না—বরঞ্চ নিজের অত্যন্ত দীনতা নিজেকে অত্যন্ত সুখ দেয়—তখন তাঁর লীলার ভিতরকার একটি মস্ত বিরোধের সার্থকতা বুঝতে পারি এবং সেই বিরোধকে স্বীকার করে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে, জগতে আমি যতই ক্ষুদ্র যতই দীন দুর্বল নিজের আমি-নিকেতনে তাঁর প্রেমের দ্বারা আমি ততই পরিপূর্ণ, ততই কৃতার্থ। আমি অনন্ত ভাবে দীন বলেই দুর্বল বলেই তাঁর অনন্ত প্রেমের দ্বারা ধন্য হয়েছি।

১৭ পৌষ

ইচ্ছা

সকাল বেলা থেকেই আমার সংসারের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। কেননা, এ যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই হচ্ছে এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কী চাই কী না চাই, আমি কাকে রাখব কাকে ছাড়ব সেই কথাকে মাঝখানে নিয়েই আমার সংসার।

আমাকে বিশ্বভুবনের ভাবনা ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য উঠছে না, বায়ু বইছে না, অণুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড়ো ভাবনা করেই ভাবতে হয় কেননা সেটা যে আমারই ভাবনা।

তাই এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোটো সংসারের অতি ছোটো কথা আমার কাছে ছোটো বলে মনে হয় না। আমার প্রভাতের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্যোদয়ের সম্মুখে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না ; এমন কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চলতে পারে।

এই তো দেখতে পাচ্ছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করছে। একটি হচ্ছে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা তো রাজত্ব করেন আবার তাঁর অধীনস্থ তালুকদার, সেও সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই আপনার রাজত্বটুকু বসিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেননা ওই ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্তৃত্ব বিরাজমান।

এই যে আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন—যে লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্ছে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ—একথার আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। যিনি ইচ্ছাময় তিনি আমাদের

প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন—দানপত্রে আছে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" আমরা একে ভোগ করতে পারব।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক-একবার অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠি। বলি, যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কাউকেই মানি নে—এই বলে সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে আমরা স্পর্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে—স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত না হতে পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। যেখানে কেবলমাত্র প্রয়োজনের কথা সেখানে জোর খাটানো চলে—জোর করে খাবার কেড়ে খেয়ে ক্ষুধা মেটে। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রয়োজনহীন, যেখানে অহেতুকভাবে সে নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে থাকে, সেখানে সে যা চায় তাতে একেবারেই জোর খাটে না, কারণ, সেখানে সে ইচ্ছাকেই চায়। সেখানে কোনো বস্তু, কোনো উপকরণ, কোনো স্বাধীনতার গর্ব, কোনো ক্ষমতা তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না—সেখানে সে আর একটি ইচ্ছাকে চায়। সেখানে সে যদি কোনো উপহার সামগ্রীকে গ্রহণ করে তবে সেটাকে সামগ্রী বলে গ্রহণ করে না—যে ব্যক্তি দান করেছে তারই ইচ্ছার নিদর্শন বলে গ্রহণ করে—তার ইচ্ছারই দামে এর দাম। মাতার সেবা যে ছেলের কাছে এত মূল্যবান সে তো কেবল সেবা বলেই মূল্যবান নয়, মাতার ইচ্ছা বলেই তার এত গৌরব ;—দাসের দাসত্ব নিয়ে আমার ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা মেটে না—বন্ধুর ইচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের জন্যেই সে পথ চেয়ে থাকি।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না। সেখানে নিজেকে তার খর্ব করতেই হয়। এমন কি, তাকে আমরা বলি ইচ্ছা বিসর্জন দেওয়া। ইচ্ছার এই যে অধীনতা এমন অধীনতা আর নেই। দাসতম দাসকেও আমরা কাজে প্রবৃত্ত করতে পারি কিন্তু তার ইচ্ছাকে সমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারি নে।

আমার যে সংসারে আমার ইচ্ছাই হচ্ছে মূল কর্তা সেখানে আমার একটা সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সম্মিলিত করা। যত তা করতে পারব ততই আমার ইচ্ছার রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকবে—আমার সংসার ততই বৃহৎ হয়ে উঠবে। সেই গৃহিণীই হচ্ছে যথার্থ গৃহিণী যে পিতামাতা ভাইবোন স্বামী পুত্র দাসদাসী

পাড়া প্রতিবেশী সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সুসংগত করে আপনার সংসারকে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে গঠিত করে তুলতে পারে। এমন গৃহিণীকে সর্বদাই নিজের ইচ্ছাকে খাটো করতে হয় ত্যাগ করতে হয় তবেই তার এই ইচ্ছাধিষ্ঠিত রাজ্যটি সম্পূর্ণ হয়। সে যদি সকলের সেবক না হয় তবে সে কর্ত্রী হতেই পারে না।

তাই বলছিলুম আমাদের যে ইচ্ছার মধ্যে স্বাধীনতার সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, সেই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্তি। ইচ্ছা যে অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিজেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরম সার্থকতা লাভ করে। ইচ্ছা আপনাকে উদ্যত করে নিজের যে ঘোষণা করে তাতেই তার শেষ কথা থাকে না, নিজেকে বিসর্জন করার মধ্যেই তার পরম শক্তি চরম লক্ষ্য নিহিত।

ইচ্ছার এই যে স্বাভাবিক ধর্ম যে অন্য ইচ্ছাকে সে চায়, কেবল জোরের উপরে তার আনন্দ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও সে ধর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি ইচ্ছাকে চান। এই চাওয়াটুকু সত্য হবে বলেই তিনি আমার ইচ্ছাকে আমারই করে দিয়েছেন—বিশ্বনিয়মের জালে একে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেন নি—বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ওই একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি—সেটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা,—ওইটি তিনি কেড়ে নেন না—চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন। ওই একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর আমার সেই ইচ্ছাটুকুর জন্যে প্রতিদিন যে আমার দ্বারে আসছেন আর যাচ্ছেন তার নানা নিদর্শন আছে। এইখানে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য খর্ব করেছেন, কেননা এখানেই তাঁর প্রেমের লীলা। এইখানে নেমে এসেই তাঁর প্রেমের সম্পদ প্রকাশ করেছেন—আমারও ইচ্ছার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সংগত করে তাঁর অনন্ত ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন—কেননা ইচ্ছার কাছে ছাড়া ইচ্ছার চরম প্রকাশ হবে কোথায়? তিনি বলছেন, রাজখাজনা নয়, আমাকে প্রেম দাও।

তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তো তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক অদ্ভুত আমির লীলা ফেঁদে বসেছ—এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

১৮ পৌষ

সৌন্দর্য

ঈশ্বর সত্যং। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যকে এতটুকুমাত্র স্বীকার না করলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং অমোঘ সত্যকে আমরা জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু তিনি তো শুধু সত্য নন—তিনি "আনন্দরূপমমৃতং।" তিনি আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সেই তাঁর আনন্দরূপকে দেখছি কোথায়?

আমি পূর্বেই আভাস দিয়েছি আনন্দ স্বভাবতই মুক্ত। তার উপরে জোর খাটে না, হিসাব চলে না। এই কারণে আমরা যেদিন আনন্দের উৎসব করি সেদিন প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মকে শিথিল করে দিই—সেদিন স্বার্থকে শিথিল করি, প্রয়োজনকে শিথিল করি, আত্মপরের ভেদকে শিথিল করি, সংসারের কঠিন সংকোচকে শিথিল করি—তবেই ঘরের মাঝখানে এমন একটুখানি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় যেখানে আনন্দের প্রকাশ সম্ভবপর হয়। সত্য বাঁধনকেই মানে, আনন্দ বাঁধন মানে না।

এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্যোদয়ে আলো হয় এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত এটুকু না জানলে আমাদের কোনো কাজের কোনো ক্ষতিই হয় না।

জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে বদ্ধ করছে কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিয়ে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দেয় না।

অতএব দেখতে পাচ্ছি, জগতের সত্যলোকে আমরা বদ্ধ, সৌন্দর্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করবার জো নেই। যে ব্যক্তি তুড়ি দিয়ে বলে "ছাই তোমার সৌন্দর্য" মহাবিশ্বের লক্ষ্মীকেও তার কাছে একেবারে চুপ করে যেতে হয়। কোনো আইন নেই, কোনো পেয়াদা নেই যার দ্বারা এই সৌন্দর্যকে সে দায়ে পড়ে মেনে নিতে পারে।

অতএব জগতে ঈশ্বরের এই যে অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্যের আয়োজন এ আমাদের কাছে কোনো মাসুল কোনো খাজনা আদায় করে না, এ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে চায়—বলে আমাতে তোমার আনন্দ হ'ক ; তুমি স্বত আমাকে গ্রহণ করো।

তাই আমি বলছিলুম, আমাদের অন্তরাত্মার আমি-ক্ষেত্রের একটা সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎ জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে। সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তাহলে জোড়হাত করে তাঁকে মানতুম—কিন্তু তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কেউ আসে না—সেইজন্যে পাপ ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে তো চলবে না—শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বেচ্ছার সঙ্গে স্বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস, দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে। মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে যে একেবারে পাবেই না। ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্যের দৃষ্টি পৌঁছোয় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসনপাতা সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জেলে তোল্। যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে আমি "আমি" হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরেছি সেদিন সেই বিরহদুঃখের রহস্য একমুহূর্তেই ফাঁস হয়ে যাবে।

১৯ পৌষ

প্রার্থনার সত্য

কেউ কেউ বলেন উপাসনায় প্রার্থনার কোনো স্থান নেই—উপাসনা কেবলমাত্র ধ্যান। ঈশ্বরের স্বরূপকে মনে উপলব্ধি করা।

সে কথা স্বীকার করতে পারতুম যদি জগতে আমরা ইচ্ছার কোনো প্রকাশ না দেখতে পেতুম। আমরা লোহার কাছে প্রার্থনা করি নে, পাথরের কাছে প্রার্থনা করি নে—যার ইচ্ছাবৃত্তি আছে তার কাছেই প্রার্থনা জানাই।

ঈশ্বর যদি কেবল সত্যস্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নিয়মরূপে তাঁর প্রকাশ হত তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হতে পারত না। কিন্তু তিনি না কি "আনন্দরূপমমৃতং," তিনি নাকি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সেইজন্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানি নে, ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে জানতে হয়।

পূর্বেই বলেছি জগতে ইচ্ছার একটি নিদর্শন পেয়েছি সৌন্দর্যে। এই সৌন্দর্য আমাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করে এবং ইচ্ছার উপরেই তার নির্ভর। এইজন্য আমরা সৌন্দর্যকে উপকরণরূপে ব্যবহার করি প্রেমের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়। এই জন্য আমাদের সজ্জা, সংগীত, সৌন্দর্য সেইখানেই, যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের মিলন। জগদীশ্বর তাঁর জগতে এই অনাবশ্যক সৌন্দর্যের এমন বিপুল আয়োজন করেছেন বলেই আমাদের হৃদয় বুঝেছে জগৎ একটি মিলনের ক্ষেত্র—নইলে এখানকার এত সাজসজ্জা একেবারেই বাহুল্য।

জগতে হৃদয়েরও একটা বোঝবার বিষয় আছে, সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? একদিকে আলোক আছে বলেই আমাদের চক্ষু আছে; একদিকে সত্য আছে বলেই আমাদের চৈতন্য আছে,—একদিকে জ্ঞান আছে বলেই আমাদের বুদ্ধি আছে; তেমনি আর একদিকে কী আছে আমাদের মধ্যে হৃদয় হচ্ছে যার প্রতিরূপ? উপনিষৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—"রসোবৈ সঃ।" তিনিই হচ্ছেন রস—তিনিই আনন্দ।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি আমরা শক্তির দ্বারা প্রয়োজন সাধন করতে পারি, যুক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে পারি কিন্তু আনন্দের সম্বন্ধে শক্তি এবং যুক্তি কেবল দ্বার পর্যন্ত এসে ঠেকে যায়—তাদের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই আনন্দের সঙ্গে একেবারে অন্তঃপুরের সম্বন্ধ হচ্ছে ইচ্ছার। আনন্দে কোনোরকম জোর খাটে না—সেখানে কেবল ইচ্ছা কেবল খুশি।

আমার মধ্যে এই ইচ্ছার নিকেতন হচ্ছে হৃদয়। আমার সেই ইচ্ছাময় হৃদয় কি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত! তার পুষ্টি হচ্ছে মিথ্যায়, তার গম্য স্থান হচ্ছে ব্যর্থতার মধ্যে? তবে এই অদ্ভুত উপসর্গটা এল কোথা থেকে, একমুহূর্ত আছে কোন্ উপায়ে। জগতের মধ্যে কি কেবল একটিমাত্রই ফাঁকি আছে। এবং সেই ফাঁকিটিই আমার এই হৃদয়?

কখনোই নয়। আমাদের এই ইচ্ছা-রসময় হৃদয়টি জগদ্ব্যাপী ইচ্ছারসের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা—সেইখান থেকেই সে আনন্দরস পেয়ে বেঁচে আছে—না পেলে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়—সে অন্নবস্ত্র চায় না, বিদ্যাসাধ্য চায় না, অমৃত চায়, প্রেম চায়। যা চায় তা ক্ষুদ্ররূপে সংসারে এবং চরমরূপে তাঁতে আছে বলেই চায়—নইলে কেবল রুদ্ধদ্বারে মাথাখুঁড়ে মরবার জন্যে তার সৃষ্টি হয় নি।

অতএব হৃদয় আপনাকে জানে বলেই নিশ্চয় জানে তার একটি পরিপূর্ণ কৃতার্থতা অনন্তের মধ্যে আছে। ইচ্ছা কেবল তার দিকেই আছে তা নয়, অন্যদিকেও আছে—অন্যদিকে না থাকলে সে নিমেষকালও থাকত না—এতটুকু কণামাত্রও থাকত না যাতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণের ক্রিয়াটুকুও চলতে পারে। সেইজন্যেই উপনিষৎ এত জোর করে বলেছেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়তি" কেই বা শরীরের চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকতেন—ইনিই আনন্দ দেন।

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্যসাধন করে প্রার্থনা। দুই ইচ্ছার মাঝখানে যে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুলবেশে দাঁড়িয়ে আছে ওই প্রার্থনা দূতী। এই জন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈষ্ণব বলেছেন যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে ভগবানের বাঁশির যে নানা সুর বেজে উঠছে সে কেবল আমাদের জন্যে তাঁর প্রার্থনা—আমাদের হৃদয়কে তিনি এই অনির্বচনীয় সংগীতে ডাক দিয়ে চাচ্ছেন সেইজন্যেই তো এই সৌন্দর্য-সংগীত আমাদের হৃদয়ের বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলে।

সেই ইচ্ছাময় এমনি মধুরস্বরে যেখানে আমাদের ইচ্ছাকে চাচ্ছেন সেখানে তাঁর সমস্ত জোরকে একেবারে সংবরণ করেছেন—যে প্রচণ্ড জোরে তিনি সৌরজগৎকে সূর্যের সঙ্গে অমোঘরূপে বেঁধে দিয়েছেন, সেই জোরের লেশমাত্র এখানে নেই—সেইজন্যে এমন করুণ এমন মধুর স্বরে এমন নানা বিচিত্র রসে বাঁশি বাজছে—আহ্বানের আর অন্ত নেই।

তাঁর এমন আহ্বানে আমাদেরও মনের প্রার্থনা কি জাগবে না? সে কি তার বিরহের ধূলি-আসনে লুটিয়ে কেঁদে উঠবে না? অসত্য অন্ধকার এবং মৃত্যুর নিরানন্দ

নির্বাসন থেকে অভিসারযাত্রার সময়ে এই প্রার্থনাদূতীই কি তার কম্পিত দীপশিখাটি নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চলবে না ?

যতদিন আমাদের হৃদয় আছে, যতদিন প্রেমস্বরূপ ভগবান তাঁর নানাসৌন্দর্য দ্বারা এই জগৎকে আনন্দনিকেতন করে সাজাচ্ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে মানুষের বেদনা ঘুচবে কী করে ? ততদিন কোন্ সন্দেহকঠোর জ্ঞানাভিমান মানুষের প্রার্থনাকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে।

এই আমাদের প্রার্থনাটি যে বিশ্বমানবের অন্তরের পঙ্কশয্যা থেকে ব্যাকুল শতদলের মতো তার সমস্ত জলরাশির আবরণ ঠেলে আলোকের অভিমুখে মুখ তুলছে—তার সমস্ত সৌগন্ধ্য এবং শিশিরাশ্রুসিক্ত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে বলছে—"অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" মানবহৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার পূজোপহারটিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড়ো নিদারুণ শুষ্কতা কার আছে ?

২০ পৌষ

বিধান

এই ইচ্ছা প্রেম আনন্দের কথাটা উঠলেই তার উলটো কথাটা এসে মনের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। সে বলে তবে এত শাসন বন্ধন কেন ? যা চাই তা পাই নে কেন, যা চাই নে তা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন ?

এইখানে মানুষ তর্কের দ্বারা নয় কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। সে বলছে "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।"

অর্থাৎ যিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন "স এব বন্ধুঃ" তিনি তো আমার বন্ধু হবেনই। আমাতে যদি তাঁর আনন্দ না থাকত তবে তো আমি থাকতুমই না। আবার "স বিধাতা।" বিধাতা আর দ্বিতীয় কেউ নয়—যিনি জনিতা, তিনিই বন্ধু, বিধানকর্তাও তিনি—অতএব বিধান যাই হ'ক মূলে কোনো ভয় নেই।

কিন্তু বিধান জিনিসটা তো খামখেয়ালি হলে চলে না; আজ একরকম কাল অন্যরকম—আমার পক্ষে একরকম অন্যের পক্ষে অন্যরকম—কখন কী রকম তার কোনো স্থিরতা নেই, এ তো বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখ সুবিধার জন্য যদি বলি, তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায়

ছিন্ন করে দাও—এক জায়গায় অন্য সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য করে দাও তাহলে বস্তুত বলা হয় যে এই কাদাটুকু পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও।

এই বিধান জিনিসটা কারও একলার নয় এবং কোনো একখণ্ড সময়ের নয়—এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনো কালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষৎ বলেছেন, যিনি বিশ্বের প্রভু, তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ" তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জন্য সমস্তই যথার্থরূপে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বতকাল—এ বিধান অনাদি অনন্তকালের বিধান তারপরে আবার এই বিধান যাথাতথ্যতঃ বিহিত হচ্ছে—এর আদ্যোপান্তই যথাতথা—কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে এবং পরিষ্কার করে কিছু বলে নি।

কিন্তু শুধু তাই যদি হয়, যদি কেবল অমোঘ নিয়মের লৌহ-সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতারূপেই বসে থাকেন তাহলে তো সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ-পাথর ধূলি-বালিরই সমান হই। তাহলে তো আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিন্তু তিনি শুধু তো বিধাতা নন, "স এব বন্ধুঃ"—তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্‌খানে? বন্ধুর প্রকাশ তো নিয়মের ক্ষেত্র নয়—সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে?

বিধাতার কর্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে—আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবাত্মায়।

মানুষ একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে আত্মা—একদিকে রাজার খাজনা জোগায় আর একদিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন—আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিন বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।

যেদিকে আমি ইঁট কাঠ গাছ পাথরের সমান সেই সাধারণ দিকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপী নিয়ম কোনো মতেই আমাকে সাধারণ থেকে লেশমাত্র তফাত হতে দেয় না—আর

যেদিকে আমি বিশেষ ভাবে আছি সেই স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঈশ্বরের বিশেষ আনন্দ কোনো মতেই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলে যেতে দেয় না। বিধাতা আমাকে সকলের করেছেন আর বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন—সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, আর সেই তাঁর আপনার সামগ্রী আমার জীবাত্মা।

২১ পৌষ

তিন

প্রকৃতির দিকে নিয়ম, আর আমাদের আত্মার দিকে আনন্দ। নিয়মের দ্বারাই নিয়মের সঙ্গে এবং আনন্দের দ্বারাই আনন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

এইজন্যে যেদিকে আমি সর্বসাধারণের, যেদিকে আমি বিশ্বপ্রকৃতির, যেদিকে আমি মানবপ্রকৃতির, সেদিকে যদি আমি নিজেকে নিয়মের অনুগত না করি, তাহলে আমি কেবলই ব্যর্থ হই এবং অশান্তির সৃষ্টি করি। একটি ধূলিকণার কাছ থেকেও আমি ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে পারি নে—তার নিয়ম আমি মানলে তবেই সে আমার নিয়ম মানে।

এইজন্যে আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।

এই শিক্ষাটির পরিণাম যিনি, তিনিই হচ্ছেন, "শান্তম্"। যেখানেই নিয়মের ভ্রষ্টতা যেখানেই নিয়মের সঙ্গে নিয়মের যোগ হয় নি সেইখানেই অশান্তি। যেখানেই পরিপূর্ণ যোগ হয়েছে সেখানেই শান্তম্ যিনি, তাঁর পরিপূর্ণ উপলব্ধি।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ দেখতে পাই? তাঁর শান্তস্বরূপ। সেখানে, যারা ক্ষুদ্র করে দেখে তারা প্রয়াসকে দেখে, যারা বৃহৎ করে দেখে তারা শান্তিকেই দেখতে পায়। যদি নিয়ম ছিন্ন হত, যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাতথ না হত, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তাহলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জয়ী হয়ে তার নখদন্ত দিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। কিন্তু চেয়ে দেখো, সূর্যনক্ষত্রলোকের প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অটল নিয়মাসনে মহাশান্তি বিরাজ করছেন। সত্যের স্বরূপই হচ্ছে শান্তম্।

সত্য শান্তম্ বলেই শিবম্। শান্তম্ বলেই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁতে ধ্রুব আশ্রয় পেয়েছে। আমরাও যেখানে সংযত না হয়েছি অর্থাৎ যেখানে

সত্যকে জানি নি এবং সত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা করে চলি নি সেখানে আমাদের অন্তরে বাহিরে অশান্তি এবং সেই অশান্তিই অমঙ্গল—নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব !

যিনি শিবম্ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্ প্রকাশমান। সত্য যেখানে শিবস্বরূপ, সেইখানেই তিনি আনন্দময় প্রেমময়, সেইখানেই তাঁর সকলের সঙ্গে মিলন। মঙ্গলের মধ্যে ছাড়া মিলন নেই—অমঙ্গলই হচ্ছে বিরোধ বিচ্ছেদের অপদেবতা।

একদিকে সত্য অন্যদিকে আনন্দ, মাঝখানে মঙ্গল। তাই এই মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আমাদের আনন্দলোকে যেতে হয়।

আমাদের দেশে যে তিন আশ্রম ছিল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ, তা ঈশ্বরের এই তিন স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তস্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বৈতস্বরূপ।

ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনে শান্তস্বরূপকে লাভ করলে তবে গৃহধর্মের মধ্যে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়—নতুবা গার্হস্থ্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। সংসারে সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে হলেই স্বার্থবৃত্তিসকল সম্পূর্ণ পরাহত হয় এবং যথার্থ মিলনের ধর্ম যে কিরূপ নির্মল আত্মবিসর্জনের উপরে স্থাপিত তা আমরা বুঝতে পারি। যখন তা সম্পূর্ণ বুঝি তখনই যিনি অদ্বৈতম্ সেই ঐক্যরূপী পরমাত্মার সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয়। প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম, পরে প্রেম।

এইজন্যে যেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তেমনি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পুণ্যে এবং আসক্তি হতে প্রেমে নিয়ে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার প্রকাশ হবে, তবেই হে রুদ্র, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী—এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা হ'ক।

২১ পৌষ

পার্থক্য

ঈশ্বর যে কেবল মানুষকেই পার্থক্য দান করেছেন আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে এক হয়ে রয়েছেন একথা বললে চলবে কেন ? প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর তো কোনো ক্রিয়া চলত না।

তফাত এই যে, মানুষ জানে সে স্বতন্ত্র—শুধু তাই নয়, সে এও জানে যে ওই স্বাতন্ত্র্যে তার অপমান নয় তার গৌরব। বাপ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে নিজের তহবিল থেকে একটি স্বতন্ত্র তহবিল করে দেন তখন এই পার্থক্যের দ্বারা তাকে তিরস্কৃত করেন না—বস্তুত এই পার্থক্যেই তাঁর একটি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ পায় এবং এই পার্থক্যের মহা-গৌরবটুকু মানুষ কোনোমতেই ভুলতে পারে না।

মানুষ নিজের সেই স্বাতন্ত্র্য-গৌরবের অধিকারটি নিয়ে নিজে ব্যবহার করছে। প্রকৃতির মধ্যে সেই অহংকার নেই, সে জানে না সে কী পেয়েছে।

ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে কী দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন ? নিয়ম দিয়ে।

নিয়ম দিয়ে না যদি পৃথক করে দিতেন তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার যোগ থাকত না। একাকার হয়ে থাকলে ইচ্ছার গতিবিধির পথ থাকে না।

যে লোক দাবাবড়ে খেলায় নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে চায় সে প্রথমে নিজের ইচ্ছাকে বাধা দেয়। কেমন করে ? নিয়ম রচনা করে। প্রত্যেক ঘুঁটিকে সে নিয়মে বদ্ধ করে দেয়। এই যে নিয়ম এ বস্তুত ঘুঁটির মধ্যে নেই—যে খেলবে তারই ইচ্ছার মধ্যে। ইচ্ছা নিজেই নিয়ম স্থাপন করে সেই নিয়মের উপরে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে তবেই খেলা সম্ভব হয়।

বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানা প্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে তা তো নয়। তার ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে—নতুবা, ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এইজন্যেই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" সেইজন্যেই বলেন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ—অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা—ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।

প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা সীমার দ্বারা যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন সে যদি

কেবলমাত্রই পার্থক্য হত তাহলে জগৎ তো সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তাহলে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত যে কেবলমাত্র সংখ্যাসূত্রেও তাদের একাকারে জানবার কিছুই থাকত না।

অতএব এর মধ্যে আর একটি জিনিস আছে যা এই চিরন্তন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করছে। সেটি কী ? সেটি হচ্ছে শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করে একে এক অভিপ্রায়ে বাঁধছে। সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়মবদ্ধ দাবাবড়ের ঘুঁটির মধ্যে একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্যবিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে।

এইজন্যই তাঁকে ঋষিরা বলেছেন "কবিঃ"। কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অনুগত করে সুন্দর ছন্দোবিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য অর্থ উদ্ভাবিত করে তুলছে—তিনিও তেমনি "বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নি-হিতার্থোদধাতি" অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন—নইলে সমস্তই অর্থহীন হত।

"শক্তিযোগাৎ" শক্তি যোগের দ্বারা। শক্তি একটি যোগ। এই যোগের দ্বারাই ঈশ্বর সীমাদ্বারা পৃথক্কৃত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন—নিয়মের সীমারূপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শক্তি দেশের সঙ্গে দেশান্তরের, রূপের সঙ্গে রূপান্তরের, কালের সঙ্গে কালান্তরের বহুবিচিত্রসংযোগ সাধন করে এক অপূর্ব বিশ্বকাব্য সৃজন করে চলেছে।

এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকাল স্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করছেন — জগৎ-রচনায় করছেন, মানবসমাজের ইতিহাসে করছেন।

প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তাহলে তাঁর প্রেমের লীলা কোনোমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহংকারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহংকারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন — নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম থাকে না।

এই অহংকারে যদি কেবল পার্থক্যই সর্বপ্রধান হত তাহলে আত্মায় আত্মায় বিরোধ হবার মতোও সংঘাত ঘটতে পারত না—আত্মার সঙ্গে আত্মার কোনো দিক থেকে কোনো সংস্পর্শই থাকতে পারত না। কিন্তু তাঁর প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করবার পথে চলেছে, পরস্পরকে যোজনা করে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যের নিহিতার্থটিকে জাগ্রত করে তুলছে। নতুবা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য ভয়ংকর নিরর্থক হত।

এখানেও সেই আশ্চর্য রহস্য। পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুলছেন। বহুতর দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোক-বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত প্রতিঘাতে কত আঁকা বাঁকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোটোবড়ো কত আসক্তি অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেমসমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।

২৩ পৌষ

প্রকৃতি

প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র একথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে ‘প্রচার’ করছেন, আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে ‘দান’ করছেন।

অধিকাংশ মানুষ এই দুই দিকে ওজন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ বা প্রাকৃতিক দিকেই সাধনা প্রয়োগ করে, কেউ বা আধ্যাত্মিক দিকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও এসম্বন্ধে ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্যশালী হয়, তারা রাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারা অন্নপূর্ণার বরলাভ করে পরিপুষ্ট হয়।

তারা সর্ববিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা খুব বড়ো জিনিস লাভ করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের শ্রেষ্ঠলাভ হচ্ছে ধর্মনীতি।

কারণ, বড়ো হয়ে উঠতে গেলে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলেই অনেকের সঙ্গে মিলতে হয়। এই মিলন সাধনের উপরেই শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু বড়ো রকমে, স্থায়ী রকমে, সকলের চেয়ে সার্থক রকমে, মিলতে গেলেই এমন একটি নিয়মকে স্বীকার করতে হয় যা মঙ্গলের নিয়ম—অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ম—অর্থাৎ ধর্মনীতি। এই নিয়মকে স্বীকার করলেই সমস্ত বিশ্ব আনুকূল্য করে—যেখানে অস্বীকার করা যায় সেইখানেই সমস্ত বিশ্বের আঘাত লাগতে থাকে—সেই আঘাত লাগতে লাগতে কোন্ সময়ে যে ছিদ্র দেখা দেয় তা চোখেই পড়ে না—অবশেষে বহুদিনের কীর্তি দেখতে দেখতে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

যাঁরা শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেন তাঁদের বড়ো বড়ো সাধকেরা এই নিয়মকে বিশেষ করে আবিষ্কার করেন। তাঁরা জানেন নিয়মই শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল, তা ঈশ্বরের সম্বন্ধেও যেমন মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। নিয়মকে যেখানে লঙ্ঘন করব শক্তিকে সেইখানেই নিরাশ্রয় করা হবে। যার আপিসে নিয়ম নেই সে অশক্ত কর্মী। যার গৃহে নিয়ম নেই সে অশক্ত গৃহী। যে রাষ্ট্রব্যাপারে নিয়ম লঙ্ঘন হয় সেখানে অশক্ত শাসনতন্ত্র। যার বুদ্ধি বিশ্বব্যাপারে নিয়মকে দেখতে পায় না সে জীবনের সর্ব বিষয়েই অশক্ত, অকৃতার্থ, পরাভূত।

এইজন্য যথার্থ শক্তির সাধকেরা নিয়মকে বুদ্ধিতে স্বীকার করেন, বিশ্বে স্বীকার করেন, নিজের কর্মে স্বীকার করেন। এইজন্যেই তাঁরা যোজনা করতে পারেন, রচনা করতে পারেন, লাভ করতে পারেন। এইরূপে তাঁরা যে পরিমাণে সত্যশালী হন সেই পরিমাণেই ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠতে থাকেন।

কিন্তু এর একটি মুশকিল হচ্ছে এই যে, অনেক সময়ে তাঁরা এই ধর্মনীতিকেই মানুষের শেষ সম্বল বলে জ্ঞান করেন। যার সাহায্যে কেবলই কর্ম করা যায়, কেবলই শক্তি, কেবলই উন্নতি লাভ করা যায় সেইটেকেই তাঁরা চরম শ্রেয় বলে জানেন। এইজন্যে বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁরা চরম সত্য বলে জ্ঞান করেন এবং সকল কর্মের আশ্রয়ভূত ধর্মনীতিকেই তাঁরা পরম পদার্থ বলে অনুভব করেন।

কিন্তু যারা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা ঐশ্বর্যকে পায়, ঈশ্বরকে পায় না। কারণ ঈশ্বর সেখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এই অনন্ত ঐশ্বর্যসমুদ্র পার হয়ে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছোবে এমন সাধ্য কার আছে। ঐশ্বর্যের তো অন্ত নেই, শক্তিরও শেষ নেই। সেইজন্যে ওপথে ক্রমাগতই অন্তহীন একের থেকে আরের দিকে চলতে হয়। সেইজন্যেই মানুষ এই রাস্তায় চলতে চলতে

বলতে থাকে—ঈশ্বর নেই, কেবলই এই আছে, এবং এই আছে ; আর আছে, এবং আরও আছে।

ঈশ্বরের সমান না হতে পারলে তাঁকে উপলব্ধি করব কী করে ? আমরা যতই রেলগাড়ি চালাই আর টেলিগ্রাফের তার বসাই শক্তিক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বর হতে অনন্ত দূরে থেকে যাই। যদি স্পর্ধা করে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লঙ্ঘন করে ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্টজগতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এইজন্যই জগতের সমস্ত ধর্মসাধকেরা বারংবার বলেছেন, ঐশ্বর্যপথের পথিকদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তহীন চেষ্টা চরমতাহীন পথে তাদের কেবলই ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

অতএব ঈশ্বরকে বাহিরে অর্থাৎ তাঁর শক্তির ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় আমরা লাভ করতে পারি নে। সেখানে যে বালুকণাটির অন্তরালে তিনি রয়েছেন সেই বালুকণাটিকে নিঃশেষে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো যান্ত্রিকের নেই। অতএব শক্তির ক্ষেত্রে যে লোক ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যায় সে অর্জুনের মতো ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাণ মারে—সে বাণ তাঁকে স্পর্শ করে না—সেখানে না হেরে উপায় নেই।

এই শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্তি দেখতে পাই—এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা মূর্তি—এই মূর্তি ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপুষ্ট করে তোলে। আর-এক হচ্ছে করালী কালী মূর্তি—এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয় ; আমাদের কোনো দিক দিয়ে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না—না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনার বিষয়ে। বড়ো বড়ো রাজ্যসাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়—বড়ো বড়ো ঐশ্বর্যভাণ্ডার ভুক্তশেষ নারিকেলের খোলার মতো পড়ে থাকে। এখানে পাওয়ার মূর্তি খুব সুন্দর, উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত, কিন্তু যাওয়ার মূর্তি, হয় বিষাদে পরিপূর্ণ নয় ভয়ংকর। তা শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, কারণ, তা পূর্ণতার অন্তর্ধান।

কিন্তু যেমনই হ'ক এখানে পাওয়াও চরম নয়, যাওয়াও চরম নয়—এখানে পাওয়া এবং যাওয়ার আবর্তন কেবলই চলেছে। সুতরাং এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়। এর কোনোখানে এসে মানুষ চিরদিনের মতো বলে না যে এইখানে পৌঁছোনো গেল।

২৪ পৌষ

গ্রন্থ-পরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থ-পরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও এই বিভাগে মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

পলাতকা

পলাতকা ১৩২৫ (১৯১৮) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ ১৩২৯ (১৯২২) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শিশু ভোলানাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে ('যাত্রী') লিখিয়াছেন :

> একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণ-সভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যে-সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের কথা—সেই আত্মীয়েরা কবি ;—আর যে-সব পদ্য-রচনা লোকে পছন্দ করে না, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আমার গানগুলো, আর আমার শিশু ভোলানাথ নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বললেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা করছেন আমার কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।
>
> কালের ধর্মই এই। মর্ত্যলোকে বসন্ত-ঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তারই হিসাবটা স্মরন করা ভালো। রাত্রিশেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেহিসাবী, দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাকবেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ

ফস করে মারা গেল বলে চিকিৎসাশাস্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়ছে আমার আয়ু ততই কমে যাচ্ছে, তাহলে তাকে আমি নিন্দুক বলি নে, বড়োজোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক বৃদ্ধ হোক, কবি হোক অকবি হোক, কারো সঙ্গে তকরার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন কি সেই অবসরে শিশু ভোলানাথের জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তাহলেও মনটা খুশি থাকে।…

ওই শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলো থামকা কেন লিখতে বসেছিলুম? সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়,—নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্য-পটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে, সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়-গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে,—এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এ-সব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের

অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা প'ড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।...

৭ অক্টোবর ১৯২৪

"সময়হারা" কবিতাটি ১৩৩০ বৈশাখের সন্দেশ পত্রিকা হইতে শিশু ভোলানাথ গ্রন্থে রচনাবলী-সংস্করণে নূতন সংকলিত হইল।

গুরু

গুরু ১৩২৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি অচলায়তনের "কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর" আকার। এই রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের অনেক অংশ বর্জন করেন এবং কয়েকটি নূতন অংশ যোগ করেন।

বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করিতে গুরুর পাণ্ডুলিপি শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

গুরু প্রসঙ্গে অচলায়তনের গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

অরূপ রতন

অরূপ রতন ১৩২৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "এই নাট্য-রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" অভিনয় উপলক্ষ্যে

১৩৪২ সালে অরূপ রতনের পুনঃপরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়— রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এই সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।

অরূপ রতন প্রসঙ্গে রাজার গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

ঋণশোধ

ঋণশোধ ১৩২৮ (১৯২১) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা শারদোৎসবের রূপান্তর।

১৩২৮ সালের আশ্বিনে শান্তিনিকেতনে অভিনয়োপলক্ষে ইহাতে কয়েকটি নূতন অংশ যোজিত হয়, অভিনয়সৌকর্যের জন্য কোনো কোনো অংশ বর্জিত হয়; এই পরিবর্তনগুলি কোথাও মুদ্রিত আকারে নাই। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই অভিনয়ে শ্রুতিকার ছিলেন, তাঁহার সৌজন্যে অভিনয়ের সময়ে তাঁহার ব্যবহৃত পুস্তকখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি; অভিনয়-উপলক্ষ্যে নূতন-লিখিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশগুলি উহা হইতে নিচে মুদ্রিত হইল:

১ পৃ ২২৫, 'সকল ছেলে জুটি'র পরে বসিবে। তুলনীয় পৃ. ২৩০-৩১।

[প্রথম বালক।] ও ভাই, ও কে আসছে?

[দ্বিতীয় বালক।] ও পরদেশী।

বিজয়াদিত্যের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। না ভাই, আমি সবদেশী।

ছেলেরা। তুমি কী কর?

বিজয়াদিত্য। আমি সব জায়গাতেই আপন দেশ দেখে বেড়াই।

[ছেলেরা।] তার মানে কী?

বিজয়াদিত্য। দেখো না, রাজাগুলো দেশ পাবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার মানে, পৃথিবীর রাজা তবু নিজের দেশ পায় নি।

ছেলেরা। তুমি পেয়েছ?

বিজয়াদিত্য। পেয়েছি কিনা পরীক্ষা করতে বেরিয়েছি।

ছেলেরা। বেশ মজা, আমরাও সবদেশী হব। তোমাকে আমরা ছাড়ব না।

১ এই উদ্ধৃতাংশের সর্বত্র পত্রাঙ্কদ্বারা রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে।

বিজয়াদিত্য। তোমরা ছাড়লে আমিই কি তোমাদের ছাড়ব? কী করবে আমাকে নিয়ে?

ছেলেরা। আজ আমাদের ছুটি, তোমাকে নিয়ে আজ তোমার সেই সবদেশে বেরিয়ে যাব।

বিজয়াদিত্য। আচ্ছা বেশ, তাহলে আমি আমার সবদেশীর সাজ পরে আসি গে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

পৃ. ২৩০, সপ্তম ছত্র, 'ঝগড়া না, গান ধর্‌।' বর্জিত। তাহার পরে বসিবে

ছেলেরা। ওই যে সবদেশী এসেছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

পৃ. ২৩৫ ত্রয়োদশ ছত্র. 'নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা।' ইহার পরে বসিবে

প্রথম বালক। কিন্তু লেখা শেষ করতে করতে আমাদের ছুটি ফুরিয়ে যাবে।

ছেলেরা। এই লেখার খেলা কিন্তু আর ভালো লাগছে না।

পৃ. ২৩৬, 'উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।' ইহার পরে বসিবে

তোমরা অন্য খেলা খেলো গে।

সন্ন্যাসী। গান

'কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই' ইত্যাদি

পৃ. ২৩৬, সকলে। না, সে চাঁচায় ইহার পরে বসিবে

তুমি কিন্তু যেয়ো না সন্ন্যাসী—আমরা কোপাই নদীর ধারে ছুটোছুটি করে আবার এখনি চলে আসছি। [প্রস্থান

পৃ. ২৪১, দ্বাদশ ছত্র. 'রাত্রে ঘুমোতে পারিনে [প্রস্থান।' ইহার পরে বসিবে

সন্ন্যাসী। ওই লক্ষেশ্বরের কথাগুলো…[১] শরতের আলোর উপর ওর হিসাবের খাতার কালো ছাপ একেবারে লেপে দিয়ে যায়।

ঠাকুরদা। আর ওর আওয়াজটা এমন যে আশ্বিনে হাওয়ার শ্বাসরোধ হতে থাকে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তোমার গান দিয়ে হাওয়াটাকে শোধন করে রসিয়ে দিয়ে যাও।

১ পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়াছে।

ঠাকুরদা। গান

'শরৎ আলোর কমলবনে' ইত্যাদি

[লক্ষেশ্বরকে আসিতে দেখিয়া দ্রুত প্রস্থান

পৃ. ২৪৭, শেষ দুই ছত্রে 'ওহে উদাসী, তুমি বল কী?' বর্জিত; তাহার পরে নিম্নমুদ্রিত ছত্র বসিবে। পৃ. ২৪৮, শেখরের গানও বর্জিত।

এমনি করে চক্র চলেছে, পাচ্ছি আর দিচ্ছি।

পৃ. ২৫১, নবম ও দশম ছত্র বর্জিত; তৎপরিবর্তে বসিবে

সন্ন্যাসী। আচ্ছা এক কাজ করো কাশবন থেকে কাশ তুলে আনো আর আঁচল ভরে আনো ধানের মঞ্জরী। শিউলিফুলের মালা তোমাদের তো গাঁথাই আছে। সেগুলো সব নিয়ে এস।

পৃ. ২৫২, দ্বিতীয় ছত্রের অনুবৃত্তি

ওরে ভাই তার একটা গান শুনবি?

ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী কুলক্ষণ
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ
(ভাই) জানকীরে দিয়ে এস বন।

পৃ. ২৫৫, 'এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও। ইহার পরিবর্তে

ঠাকুরদা, এবার সুরে সুর মেলাবার রঙে রং মেলাবার গানটা ধরো।

গান

'সবার রঙে রং মেশাতে হবে' ইত্যাদি

এই নূতন অংশগুলি সন্নিবেশের প্রয়োজনে, এবং সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার জন্য কোনো কোনো অংশ বর্জিতও হইয়াছিল; পাদটীকায় সেই বর্জিত অংশগুলি নির্দিষ্ট হইল।[১] এইরূপ বর্জনের পর সংগতিরক্ষার্থ, কোনো কোনো স্থলে সংলাপ বর্জন না

[১] পৃ. ২২৮-২৯ 'শেখর কবির প্রবেশ' হইতে 'অভ্যেস করেছে। [প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৩০-৩১ 'ঠাকুরদা, ওই দেখো' হইতে 'এ চমৎকার খেলা' পর্যন্ত বর্জিত।

২৩২ পৃষ্ঠায় কবিশেখরের 'কেন যে মন ভোলে' গানটিতে 'সে তো কানে আনে না'র পর, 'ছেলেরা। পরদেশী তোমার সঙ্গী কি কেউ নেই।' এই বাক্যটি বসাইবার, ও গানের পরবর্তী দুই ছত্র 'আমার খেয়া গেল পারে, আমি রইনু নদীর ধারে।' এইরূপ পরিবর্তনের নির্দেশ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রহিয়াছে। সম্ভবত অন্য কোনো বারের অভিনয়ে, যেবারে এই বর্জিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশ অভিনীত হইয়াছিল, তাহাতে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

করিয়াও বক্তা-পরিবর্তনের নির্দেশ বইখানিতে আছে ; যেমন শেখরের উক্তি অন্যের মুখে বসানো হইয়াছে।

ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য, ঋণশোধে ভূমিকা ও শেখর-চরিত্রের সন্নিবেশ।

ঋণশোধ প্রসঙ্গে শারদোৎসবের গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

চার অধ্যায়

চার অধ্যায় ১৩৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

চার অধ্যায়ের প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত ভূমিকাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

আভাস

একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন-প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

পৃ. ২৩৭-৩৮ 'ছেলেরা। এই যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী' হইতে 'সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৩৮-৩৭ 'শেখর। তার মানে হইতে' [বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান। পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৩৮-৩৯ 'শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ' হইতে 'ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৪১-৪২ 'রাজদূতের প্রবেশ' হইতে 'চরণ ছাড়ছি নে [প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৪৩ তৃতীয়-চতুর্থ ছত্র, 'এ নইলে···জো নেই।' বর্জিত।

পৃ. ২৪৩ বন্দিগণের গান বর্জিত।

পৃ. ২৪৭ 'ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ' এর পরিবর্তে 'ঠাকুরদাদার প্রবেশ।'

পৃ. ২৪৮ 'উপনন্দকে তুমি দেখেছ' হইতে 'ওর সব খবর পেলুম।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৪৯ 'লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি' হইতে 'আদায় না করে ছাড়ছি নে।' পর্যন্ত বর্জিত।
'কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে'র পরিবর্তে 'এতক্ষণ তোমরা দুজনে' হইবে।

পৃ. ২৫৪ 'লেগেছে অমল ধবল পালে'র পরিবর্তে 'হৃদয়ে ছিলে জেগে।'

পৃ. ২৫৫ 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' গানটি বর্জিত।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী অপর পক্ষে, বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্যপ্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রধান সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

এমন সময়ে লর্ড কর্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দুমুসলমান-বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালিজাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন "সন্ধ্যা" কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নি-জ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলনপ্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতালার ঘরে একলা বসে ছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।

উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

চার অধ্যায়, বিশেষত উহার "আভাস" বা ভূমিকা সাময়িক পত্রে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪২ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন, নিচে তাহা মুদ্রিত হইল :

চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ত

আমার চার অধ্যায় গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্যবিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশি কাছে আছি তা নয় তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এইজন্যেই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে মুখ্যভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্ত-আন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয়মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন এর সাহিত্যরূপ স্পষ্ট হতে পারবে।

এই রচনা সম্বন্ধে লেখকের তরফ থেকে আমার যা বক্তব্য সেটা বলে রাখি। বইটা লেখবার সময় আমি কী লিখতে বসেছিলুম সেটা আমার জানা। সুতরাং এই ব্যক্তিগত খবরটা আমিই দিতে পারি; সেটা কী হয়ে উঠেছে সে-কথা পাঠক ও সমালোচক আপন বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে বিচার করবেন। সেই বুদ্ধির মাত্রাভেদ ও রুচির বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, সুতরাং আলোচনা হতে থাকবে নানা ছাঁচের ও নানা মূল্যের, কালের উপর নির্ভর করে সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই লেখকের কর্তব্য।

যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়কনায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারিদিকের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষরূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ,

আর-একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেইসঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে-অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।

বাইরের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার নানা সংঘট্টনে তৈরি, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা, ও তার কিছু কিছু আভাস আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে। তার সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন রকমের হওয়ারই কথা, তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও পার্থক্য আছে। কিন্তু গল্পটাকে যদি সাহিত্যের বিষয় বলে মানতে হয় তাহলে এ নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক, গল্পের ভূমিকারূপে আমার ভূমিকাকেই স্বীকার করে নিতে হবে। খ্রীস্টানও যদি কুমারসম্ভব পড়তে চায় তাহলে কালিদাসের বর্ণিত হরপার্বতীর আখ্যানকেই তার সত্য বলে মানা চাই. তা নিয়ে ধর্মতত্ত্বঘটিত তর্ক চলবে না। এই পৌরাণিক আখ্যানে সাংখ্যতত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন উত্তর দেবার যোগ্যই নয়, আসল কথাটা এই যে, এই আখ্যানের ভূমিকায় হরপার্বতীর প্রেম ও মিলনটাই মুখ্যভাবে গোচর। এমন কি কুমারের জন্মবিবরণকেও কালিদাস উপেক্ষা করেছেন।

যদি কোনো পাঠক বলেন আমার গল্পের ভূমিকা কোনো কোনো অংশে বা অনেক অংশে আমার স্বকপোলকল্পিত তাহলে গল্প-লিখিয়ে হিসাবে সে অভিযোগ মেনে নিলেও ক্ষতি হবে না। ইন্দ্রনাথ দ্বারা চালিত প্রচেষ্টার কী পরিণাম হল, কী হল বটুর বা কানাইয়ের সে সংবাদটাকে কোনো স্থান দেওয়া হয় নি, উপসংহারে একমাত্র ব্যঞ্জনা অন্তু-এলার প্রেমের, এই উপসংহারের দ্বারা ওই প্রেমের রূপটিকেই সম্পূর্ণতা দেওয়া হল।

গল্পের উপক্রমণিকায় উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ-প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এক সে এলাকে পেলে না, আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাববিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হতে পারে তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাটি কবিজাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হলে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হতে পারে এই আশা করেছিলুম। তা

হোক তবু গল্পের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই সে-কথা মানি। গল্পের সাক্ষ্য গল্পের মধ্যে থাকাই ভালো।

একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি। এ-কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই।

আর-একটা তর্ক আছে। গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্লবচেষ্টাসংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো মতই যদি কোথাও না থাকত তাহলে গল্পের ভূমিকাটা হত নিরর্থক। ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রের সমর্থনের জন্যে এই সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করেন এ-সকল মতের কোনো-কোনোটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলব "এহ বাহ্য"। এ-কথাটা মিথ্যে হলেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হলেও তাই। কোনো মতপ্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে তাহলেই সেটা হবে অপরাধ।

যদি কোনো অধ্যাপক কোনোদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে হ্যামলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গী কবির নিজের, সেটা সত্য হোক আর মিথ্যে হোক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। তাঁর নাটকে কোথাও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব কোনো ইঙ্গিতে প্রকাশ পায় নি এমনতরো অবিশ্বাস্য কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার দ্বারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

অবশেষে সংক্ষেপে আমার মন্তব্যটি জানাই

চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে-তর্ক সাহিত্যবিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়কনায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।

৮ চৈত্র, ১৩৪১

ধর্ম

ধর্ম গদ্যগ্রন্থাবলীর ষোড়শ ভাগরূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ, বা পৌষোৎসবে, বা/এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে কথিত বা পঠিত ; 'ধর্মপ্রচার' ১৩১০ সালের '১২ই মাঘ আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটিকলেজ হলে
১ পঠিত হয়' এবং 'ততঃ কিম্‌' 'ওভারটুন হলে আহূত আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে' পঠিত হয়।

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ডে ১৯০৯-১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ পৌষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অন্যত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে ইহার তিন খণ্ড মুদ্রিত হইল।

এই উপদেশাবলীর অনেকগুলি মৌখিক ভাষণ, পরে বক্তাকর্তৃক নূতন করিয়া লিখিত ; কতকগুলি লিখিত ভাষণ।

১৩৪১-৪২ সালে শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ড, অন্যান্য কয়েকটি উপদেশ সহ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, নানাস্থানে পাঠ-পরিবর্তনও হয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে শান্তিনিকেতন প্রথম সংস্করণ অনুসারে মুদ্রিত হইল।

বর্ণানুক্রমিক সূচী